শব্দের সম্ভাবনা

মঈন চৌধুরী

উ ৎ স র্গ

অন্তর জায়ান, অর্পণ জায়ীফ, রাই রীতিকা
আলোর পিপাসা যাবে না কখনো
আলোর প্লাবন চাই,
আস না তোমরা আলোর কণিকা
আলোর তীর্থে যাই ।

তোমাদের
মঈন চৌধুরী

সম্পাদনা
শওকত হোসেন

‘শব্দের সম্ভাবনা’ গ্রন্থের
সূচি

মানুষের মন: পরী ও রাজপুত্র প্রকল্প
৫ – ২৫
আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা
২৫ – ৩৭
সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ: সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রয়োগ
৩৭ – ৬৬
সৃষ্টি ও দেশ-কাল
৬৭ – ৮৩
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?
৮৩ – ৯৮
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ
৯৮ – ১১১
সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি...
১১১ – ১৪৭

প্রথম প্রকাশের প্রাক্‌কথন

এ গ্রন্থে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছিল নিসর্গ, সূনৃত, আবহমান, উলুখাগড়া, লোক, বিপ্রতীক ইত্যাদি নামের ক্ষুদে পত্রিকাগুলোতে। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ও দর্শনই হল প্রবন্ধগুলোর মূল উপাদান। পাশ্চাত্যের কোনো দর্শন-তত্ত্ব আলোচনাকালে আমি বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতাকেও বিশ্লেষণ করেছি, আধুনিক দর্শন ও তত্ত্বসমূহ কীভাবে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

গত তিন দশক ধরে সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দর্শন-তত্ত্বের বিশ্লেষণে কিছু নতুন চিন্তা-চেতনা যোগ করা সম্ভব। গ্রন্থভুক্ত কিছু প্রবন্ধে তাই আমি আমার চিন্তা-চেতনাকেও উপস্থাপন করেছি যুক্তিকে গ্রাহ্য করেই।

এই বইয়ে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছোট-কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ কারণে একই রকম দর্শন ও তত্ত্বের প্রেক্ষাপট বিভিন্ন মাত্রায় অনেক প্রবন্ধেই অবস্থান করছে। ব্যাপারটিকে পাঠক ইচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি না ভেবে প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট হিসেবেই বিবেচনা করবেন আশা করি। আমার লেখা প্রবন্ধগুলো এখন পাঠকের সম্পত্তি এবং পাঠকরাই তাদের চেতনা-চৈতন্যের উপাদানসহ বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আমার বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা।

প্রবন্ধগুলোর প্রথম পাঠক ও সমালোচক ছিল আমার স্ত্রী শিরীন চৌধুরী এবং আত্মজ তাসীন চৌধুরী। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশে মননশীল পাঠকের সংখ্যা খুব কম জেনেও সংবেদ-এর স্বত্বাধিকারী পারভেজ হোসেন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাকেও আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।

মঈন চৌধুরী
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
ঢাকা।

মানুষের মন: পরী ও রাজপুত্র প্রকল্প

পূর্বকথা

আমি কেন যে এখনো লাল পরী আর নীল পরীকে ভুলতে পারি না, আমার অচেতনে কী এমন উপাদান লুকিয়ে আছে যাতে নিজেকে এখনো মদনকুমার মনে হয়, কেন আমার ভাবতে ভালো লাগে মধুমালার কথা,– এসব চিন্তা করেই 'মানুষের মনঃপরী ও রাজপুত্র প্রকল্প' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে জাগে। প্রবন্ধটি লেখা শুরু করেই আমার মনে হয় আমি অন্য সবার মতোই একজন 'কবি', আমার অচেতনের আয়না আমাকে দিয়ে কবিতা লেখায়, আমার কবিতায় চলে আসে 'পরী' কিংবা আমার কল্পনার কোনো এক 'অচেনা অজানা মানবী'। আমার মনে হয় শেষের কবিতার লাবণ্য আমার, জীবনানন্দের বনলতা সেন আমার, সুনীলের নীরাও আমার নীরা। আমার ইচ্ছে যে আমার 'পরী'-কে, আমার কল্পনার মানবীকে, পাঠকের সামনে তুলে ধরি এবং এ কারণেই প্রবন্ধের শুরুতেই আমি উপস্থাপন করি আমার লেখা একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি কবিতা।

পরী

১.০

এখন সে তো জলের পরী
চুল রেখেছে মেঘে
শুভ্র ফেনায় ভাবছেটা কি
বলতে পারে কে!
সবকিছু তো অন্ধকারে,
শব্দে বলা যায়–
জলের রানী মেঘ জড়িয়ে
আছে তপস্যায়।

আমি এখন সময় শুধু,
বলতে পারো– ঘড়ি,
মেঘগুলো সব ভাসছে জলে
স্বপ্নে দেখি পরী।

২.০

চিত্রগুলো পরীই বটে, স্বপ্নে আসার পরে
লালপরী আর নীলপরীরা মদন তুলে নেয়,
মধুমালার সঙ্গে তো হয় রূপকথাতে দেখা

পরীরা সব মুচকি হেসে অর্থ তুলে দেয় ।

তারপরে তো ছলাৎ ছলাৎ জলের কোলাহল
জলকে দেখি জলে থেকেই, জলের ভালোবাসা
চিত্ত পরী নৃত্য করে আয়নাঘরে এসে
শব্দ হলে বুঝতে পারি সময় সর্বনাশা ।

৩.০
ঐ পরীদের নিয়ে এখন কাব্য করা যায়
আরশি ঘরের পড়শী ওরা নিঝুম তপস্যায় ।
(মঈন চৌধুরীর কবিতাভাবনা ও কবিতা, লোক, ২০০৬)

A Journey with Mita

It was raining, she was there, always within me
I was there only alone in a passing meadow,
‘Coming there, near the river?’ Ñ asked my somber soul
‘Yes Dear, I’ll be there’– answered Mita’s shadow.

She was laughing, dancing as a beating solemn heart
And the nature’s loving image jumbled within her,
‘Are you there?’ – murmured myself, looking at her sky
Heard her voice, she ways sayingÑ ‘Find me in a star’.

We were there in a void counting gems of God,
The world of ours became tiny, so that we could have
Timeless love in painted aura in a singing spree,
And we could picture Eden left by Adam-Eve.
She was there, always there, never said me bye,
I was there, near the river, with Mita’s sky.
(মঈন চৌধুরী, শব্দের পদ্মফুল, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৪)

আমার কবিতার ‘পরী’ কিংবা ‘মিতা’-কে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু আমি জানি, বুঝি, এই পরী ও মিতা আমার সত্তার অংশ হয়ে আমার ‘আমি’-তে মিশে গেছে। মাঝে মধ্যে এই পরী বা মিতা-র নাম হয়তো-বা বদলে যায়, তারা হয়ে যায় সুচিত্রা সেন (যিনি হয়তো-বা আমার বাবার পরীও ছিলেন), হয়ে যায় রানী মুখার্জী (যে আমার ছেলের পরীও হতে পারে), তাদের নাম হয় রবীন্দ্রনাথের লাবণ্য, নন্দিনী, জীবনানন্দের বনলতা, সুরঞ্জনা কিংবা সুনীলের নীরা। আমি মাঝেমধ্যে পরীদের এই বিবর্তন দেখে অবাক হই, ভাবি, এ কেমন এক অস্তিত্ব, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ আমার সাথেই আছে!

ব্যাপারটি নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর সাথেও আলাপ করেছি, সে আমাকে প্রশ্ন করেছে– 'আমি কি পরী?' আমি আমার স্ত্রীকে যেহেতু বন্ধু মনে করি, তাই তাকে মিথ্যে বলিনি। আমি তাকে বলেছি– 'তুমি একদিন পরী ছিলে, এখন আর পরী নও, বউ হয়ে গেছ।' আমার স্ত্রী হেসে আবার প্রশ্ন করেছিল– 'তোমার বন্ধুর বউরা কি তবে পরী?' অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর আমার উত্তর ছিল– 'ঠিক ধরেছ, তাদের মাঝে কেউ কেউ অবশ্যই পরী, কারণ তাদের অবস্থান তো কল্পনায়, ধরে ছুঁয়ে তো আর দেখতে পারিনি'। আমার স্ত্রী যথেষ্ট আধুনিক, সে কিছুটা চিন্তা করে বলল– 'আসলে স্বপ্ন বাস্তবে চলে এলে পরীরা তাদের পরীত্ব হারিয়ে ফেলে' এবং এ কথা বলে সে একটা গান গাইল। গানের প্রথম কলিটা ছিল:

'নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে রে ভোমরা, নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে'

একজন পুরুষ হিসেবে নিজেকে 'ভ্রমর' ভাবতে ভালোই লাগে, শত সহস্র ফুলের মাঝে পরীকে খোঁজার আনন্দই আলাদা। নিজেকে ভোমরা ভেবে এবার আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলাম– 'আমার তো পরী-বাস্তবতা আছে, তোমার আছে কী?' আমার কথা শুনে তার উত্তর ছিল– 'আমার কাছে একজন রাজপুত্র। যে রাজপুত্র সব দৈত্য-দানব মেরে আমাকে উদ্ধার করবে'।

পরী ও রাজপুত্র নিয়ে আমি ও আমার স্ত্রী যা ভাবলাম, তা আসলে হতে পারে মানুষের মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক একটি প্রকল্প, যাকে আমরা পরী-রাজপুত্র প্রকল্প কিংবা Fairy-Prince Hypothesis বলতে পারি। ব্যাপারটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে আমাদের ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব (Historical Anthropology), ফ্রয়েড, লাকাঁ এবং ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্ব (Psychology) এবং রূপকথার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব

হোমো সেপিয়েনস্ সেপিয়েনস্ (Homo Sapiens Sapiens) নামের মানুষ প্রজন্ম হেমিনিড গোত্রের হোমো ইরেকটাস (Homo Erectus); হোমো এরগাসটার (Homo Ergaster), হোমো নিয়েনডারথালেনসিস (HomoNeanderthalensis) ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। আমাদের প্রাগৈতিহাসিক আদি-পূর্বপুরুষেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে গুহাতে থাকত এবং শিকার করে জীবন যাপন করত। তাদের চিন্তা-চেতনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পদের ধারণা খুব একটা ছিল না এবং এর ফলে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ আর ভিআই লেনিন-এর দর্শনে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের সমাজকেই আদি-সাম্যবাদী সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু, লোকের মতে, ঐ সাম্যবাদী সমাজেও সম্পদের ধারণা এসে গিয়েছিল যৌনতা ও প্রজন্ম সংরক্ষণের জৈবিক ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে এবং 'নারী' হয়েছিল মানুষ -সমাজের প্রথম সম্পদ। গুহাকেন্দ্রিক সাম্যবাদী সমাজে একজন ভালো শিকারি, যার শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি, সেই পুরুষটি লোভ, লালসা, কামনা, ঈর্ষা ইত্যাদির মতো মানবিক গুণাবলি বা স্বভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে, গুহায় অবস্থানকারী নারীদের মাঝ থেকে কিছু পছন্দের নারীকে তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে ঘোষণা দিত। একজন শক্তিশালী পুরুষের সম্পদ সবসময় যে তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে অবস্থান করত, তা কিন্তু নয়। গুহার সমাজে নতুন প্রজন্মের কোনো পুরুষ, নতুন শক্তি

নিয়ে, নতুন শিকারের পদ্ধতি আবিষ্কার করে, নতুনভাবে অধিকার করে নিত নারীদের। নারীর অধিকার নিয়ে গুহামানব সমাজে তাই মাঝে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও লেগে থাকত।

গুহামানব যুগে একজন নারী পুরুষের সম্পদ হিসেবে অবস্থান করত ঠিকই, কিন্তু এই নারীই আবার পুরুষ ও সমাজের চেতনা-চৈতন্যে এনে দিয়েছিল অতীন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রজালিক অনুভূতি, যা পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মতত্ত্ব বিকাশে (Theological evolution of religion) প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল। একজন নারী যখন গুহার মাঝে প্রচণ্ড প্রসববেদনার পর জন্ম দিত এক নতুন মানব বা মানবীর, তখন এই 'মানুষ থেকে মানুষ জন্ম নেয়ার' ব্যাপারটিই হয়ে যেত অতীন্দ্রিয়/ইন্দ্রজালিক ঘটনা। পুরুষের কাছে মাঝেমধ্যে তাই নারী হয়ে যেত 'দেবী', সৃষ্টির উৎস। পুরুষের এই দেবী-ভাবনা কিন্তু কোনো এক একক নারীতে সীমাবদ্ধ থাকত না। নারীকেন্দ্রিক এই 'দেবী-রূপ' একজন পুরুষ বিভিন্ন নারীর মাঝেই আরোপ করতে চাইতো।

গুহামানব-সমাজে জীবন-যাপন এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামে বন্য পশু-পাখি শিকার করাই ছিল একমাত্র প্রধান কাজ এবং এ কাজে পেশিবহুল শক্তিশালী পুরুষরাই অংশগ্রহণ করত। ষ জনগোষ্ঠী যখন শিকার নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখন নারীরা তাদের সন্তান-সন্ততি লালন-পালন ও রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত থাকত প্রজন্ম রক্ষার তাগিদে। একজন নারীর সাথে যে সন্তান-সন্ততির যোগাযোগ অনেকটা নিবিড় তা অস্বীকার করা যায় না এবং এমন সম্পর্ককে 'জৈবিক প্রজন্ম উত্তরণ সহায়ক সম্পর্ক' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একটি নারী যখন 'প্রজন্ম-উত্তরণ-সহায়ক-সম্পর্কের' অস্তিত্ব নিয়ে, একজন মা হিসেবে গুহামানব সমাজে উপস্থিত হল, তখন এই মাতৃত্ব-গুণও একজন নারীকে বানাল দেবী। অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষ গুহামানবদের ভাষা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের, আর এ কারণে 'নারী/পুরুষ' কিংবা 'নারী/দেবী' ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্য তখনো চেতনা-চৈতন্যের অংশ হয়ে অবস্থান করত না।

আমাদের আদি পিতা-মাতাদের কোনো-এক প্রজন্ম, ইতিহাসের কোনো-এক সময়ে শুধুমাত্র পশুশিকারকে জীবন ধারণের একমাত্র উপায় না ভেবে কৃষিকাজে হাত দেয়। কৃষিকাজ শুরু করার পেছনে নারীদের ভূমিকাই ছিল বেশি এবং 'প্রজন্ম-সহায়ক শক্তির' সাথে 'বৃক্ষ ও ক্ষেত্রের উর্বরা-শক্তির' সমন্বয় ঘটার ফলে নারীদের 'দেবী-রূপ' বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় তখন। নারীদের এই 'দেবী-রূপ'-এর প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও কায়েম হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের গোত্রকেন্দ্রিক কোনো কোনো সমাজে। কিন্তু এই সময় মানুষের ভাষাও বিবর্তিত হয়ে এক ধরনের কাঠামোগত নিয়মের আওতায় চলে আসে (আমি এ মুহূর্তে স্মরণ করছি ক্লদ লেভিস্ট্রাউসের ভাষা দর্শন), এবং এই ভাষা-কাঠামোর উপাদান সৃষ্টি করে বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary opposition)। এই যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে অবস্থান করছিল লিঙ্গকেন্দ্রিক (Phallogocentric) চিন্তা-চেতনা এবং ভাষার প্রতিটি শব্দের উৎসেই 'নারী' ও 'পুরুষ' সম্পর্কীয় প্রচ্ছন্ন ধারণা জুড়ে দেয়া হয়। লিঙ্গকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা যে যুগ্ম-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল তাতে পুরুষের অবস্থান চলে আসে নারীর উপরে, সূর্য হয়ে যায় পুরুষ, চন্দ্র হয়ে যায় স্ত্রী-লিঙ্গের, দেবীর উপরে স্থান হয় দেবতার।

আমাদের বঙ্গদেশের আদি কৌম-সমাজে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর পূজা হত এবং এসব দেব-দেবী ছিল যাদুশক্তি ও প্রজননশক্তির প্রতীক। এ প্রসঙ্গে লৌকিক দেবী মনসা-র প্রসঙ্গ আনা যায়, যা শবরদের ডাকিনী-পিশাচী-মারী সংহারিকা দেবী জাঙ্গুলী কিংবা বজ্রযানী

বৌদ্ধ-দেবী পর্ণশবরীর সাথে তুল্য। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের দেবী বন-দুর্গা পরবর্তীকালে হিন্দু-দেবী হিসেবে পূজিত হয়েছে এবং ঠিক একইভাবে জৈব-দেবী যক্ষিনী, কুষ্মাণ্ডিনী বা অম্বিকা পরবর্তীকালে বৌদ্ধ-দেবী হয়ে গেছে। বঙ্গদেশে যখন বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তখন বুদ্ধ বা সুগত, অবলোকিতেশ্বর এবং লোকনাথই ছিল প্রধান দেবতা। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক মতবাদ প্রবেশ করলে শক্তি-স্বরূপিনী দেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা (যা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের কালী) বর্তালী, বদালী, বরালী, বসুধারা (হিন্দু-ধর্মে লক্ষ্মী), বজ্রসরস্বতী (হিন্দু সরস্বতী), মহাপ্রতিসরা, মহামায়ুবী ইত্যাদি নামে শক্তি-স্বরূপিনী দেবীদের বিবর্তন হতে থাকে। হিন্দুধর্মের শুরু হয়েছিল গ্রাম্য দেব-দেবীর অর্চনা এবং কৌলচিহ্ন বা টোটেম-পূজা দিয়ে। পরবর্তীকালে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম ও কুবের বৈদিকধর্মের মূল দেবতা হিসেবে পূজিত হতে থাকে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণববাদ দেবতা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করেই বিস্তার লাভ করেছিল এবং এক সময় রাধা ও কৃষ্ণ'র প্রেম ও লীলাই হয়ে যায় বৈষ্ণববাদের মূলমন্ত্র। শৈববাদে পুরুষতন্ত্রের উত্থান হয়েছিল। শিব ও শিবলিঙ্গ প্রতীক পূজিত হত, কিন্তু শৈববাদের বিপরীতে শক্তিবাদ (দেবীর প্রাধান্য) ফিরে আসতে খুব দেরি হয়নি। মাতৃকা দেবী হিসেবে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুণ্ডা আমাদের আদি সমাজব্যবস্থায় ফিরে এসেছিল। আমাদের বর্তমান হিন্দু সমাজে শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী মূল দেব-দেবী হিসেবে পূজিত, কিন্তু গৃহ-দেবতা হিসেবে অন্য দেবদেবীর প্রাধান্য রয়েছে। আমরা যদি দেবতা ও দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব দেবতাদের আগমন হয়েছিল কোনো ধর্মতত্ত্ব কিংবা ব্যক্তিকে (যেমন গৌতম বুদ্ধ) কেন্দ্র করে। কিন্তু দেবীদের ইতিহাস এক বিবর্তনের ইতিহাস, যা রচিত হয়েছিল মানুষের মনের মাধুরী মিশিয়ে।

বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমান পুরুষ জনগোষ্ঠীর কোনো দেবী নেই। তবে তাদের আছে আরব্য-রজনীর ইতিহাস, বড়-বিবি, ছোট-বিবি, মেজ-বিবি, সেজ-বিবি-কেন্দ্রিক কামনা-বাসনা এবং সব শেষে বেহেশতের হুর ও পরীদের স্বচ্ছ নরম কোমল শরীরের স্বপ্ন। বাংলাদেশের মুসলমান মহিলাদের জন্য কী আছে? তাদের জন্য কিছু নেই, স্বামীর সেবা করে, ধর্মকর্ম ঠিকভাবে করলে, তারা বেহেশতে গিয়ে তাদের 'রাজপুত্র স্বামী'-কে (যে বাস্তবে হয়তো ছিল কাপুরুষ, পুরুষত্বহীন) ফিরে পাবে। কিন্তু সবশেষে নৃতাত্ত্বিক কারণেই একটা প্রশ্ন থেকে যায়। বেহেশতে ফিরে পাওয়া 'স্বামী' কি হুর-পরী ছেড়ে তার সেই পুরাতন বউ-এর কাছে ফিরে আসবে? এ ব্যাপারে মনস্তত্ত্ব কী বলে দেখা যাক।

ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্ব

'মন' নামক শব্দটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সবসময়ই বিভ্রান্তিকর ছিল। 'মন কোথায় অবস্থান করে?'– এমন প্রশ্ন এলেই আমরা আমাদের হৃদপিণ্ডের 'লাব-ডাপ' শব্দের দিকে ইঙ্গিত করতাম, কারণ হৃৎপিণ্ডই হল আমাদের শরীরের সবচেয়ে সরব অঙ্গ। বিংশ শতাব্দিতে এসে আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞান-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছি, 'মন' নাক 'ধরা-ছোঁয়ার বাইরের' অস্তিত্বটি আসলে অবস্থান করে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরন কোষে এবং কোনো-এক অজানা কোয়ান্টাম-যান্ত্রিক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের অস্তিত্বে/সত্তায় কাজ করে। মন কিভাবে কাজ করে, তার

বিস্তারিত বিশ্লেষণ কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখানো যাবে না আর তাই এ সম্পর্কে কিছু জানতে হলেই আমাদের সিগমুক্ত ফ্রয়েড পড়তে হবে, জানতে হবে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে। ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্প ও পদ্ধতিগুলোর পেছনে যুক্তি আছে, আছে বিভিন্ন মানসিক রোগীর সাথে কথা বলে উদ্ধার করা মনোবিশ্লেষণী উপাদান। কিন্তু তারপরেও ফ্রয়েডের সব তত্ত্বকথা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা যাবে না। ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিয়ে তাই বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে, কেউ বলছেন তিনি অতিমাত্রায় যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কারো কারো মন্তব্য হল– ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্ব দিয়ে আবারও নতুন করে পুরুষতন্ত্রের পতাকা উড়িয়েছেন। সব ধরনের সমালোচনার পরও, ফ্রয়েড ছাড়া মানুষের 'মন'-কে বোঝার উপায় নেই, আর মনের বিশ্লেষণে ফ্রয়েড যে অনেক সত্যই উদ্ধার করেছেন তা বোঝা যাবে মেধা আর যুক্তি দিয়ে তাঁর তত্ত্বগুলোকে বিশ্লেষণ করলে।

ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মন প্রচণ্ডভাবে গতিশীল (Dynamic) এবং এই 'মন' নামক মানবিক উপাদানটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, গূঢ়ৈষা, অবদমন ইত্যাদির মতো কিছু ইচ্ছামূলক (conative) ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা আমাদের সমাজবাস্তবতায় অবস্থান করি বিভিন্ন বিরোধ (conflict) আর বাধা (resistance)-কে গ্রাহ্য করে এবং এর ফলে আমরা কখনোই সম্পূর্ণ স্বাধীন নই। আমাদের চিন্তারও নেই কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষও একটি প্রাণী, তার আছে প্রাকৃতিক কারণেই জৈবিক তাড়না, কামনা ও বাসনা, আছে যৌনক্ষুধা। কিন্তু মানুষের সমাজে বসবাসরত একজন মানুষকে কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হয়; সে ইচ্ছেমতো তার তাড়না, কামনা, বাসনাকে তৃপ্ত করতে পারে না, একজন মানুষ পারে না ইচ্ছেমতো যৌন-সুখ নিতে। যে কামনা, বাসনা আর যৌন-তাড়না একটি মানুষ বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম-কানুনের জন্য তৃপ্ত করতে পারে না, সেই অতৃপ্তি-জাত ইচ্ছেগুলোকেই অবদমিত হয়ে স্থান করে নেয় মানুষের মনের অচেতন স্তরে। এই অচেতন স্তরেই অবদমনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এক ধরনের বিপরীতমুখী বিরোধ ও বাধার, যা লজ্জা, ভয়, দুঃখ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন মানসিক/মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের যে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি, যার জন্য সে অতৃপ্ত, সেই অবদমিত অতৃপ্তি ও ইচ্ছাগুলোই অচেতন স্তর থেকে স্বপ্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। এ যেন একটা স্বপ্নের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার, কিন্তু এই ইচ্ছাপূরণের চরিত্রে উপস্থিত থাকে না স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তি-মানুষটি, স্বপ্নের চরিত্রে উপস্থিত থাকে মানুষের অচেতন স্বয়ং এবং অচেতনদৃষ্ট কিছু প্রতীক। একটি স্বপ্নে যেহেতু প্রতীক অবস্থান করে, সেহেতু অনেকসময় আমরা স্বপ্নের ভাষাকে বাস্তবের ভাষা দিয়ে বর্ণনা করতে পারি না (এবং এ-কারণে বেশিরভাগ স্বপ্ন আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়, যা শুধুমাত্র প্রতীকী তাকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে আমাদের চেতন মন সায় দেয় না)। কিন্তু তারপরও, অনেক স্বপ্নই আমাদের স্মৃতিতে থাকে। আমরা যদি স্বপ্নগুলোকে ব্যাখ্যা করি তবে অবদমিত অচেতনের ভাষা ও বক্তব্যকে খুঁজে পাই। ফ্রয়েড স্বপ্নের উপাদান হিসেবে একটি স্বপ্নের ব্যক্ত-রূপ (manifest content) এবং অব্যক্ত-রূপ (খধঃবহঃ পড়হঃবহঃ)-কে চিহ্নিত করেছেন। একটি স্বপ্ন দেখার পর যা আমাদের স্মৃতিতে থাকে এবং যা আমরা আমাদের ভাষায় মোটামুটিভাবে বলতে পারি তাই হল ব্যক্ত-রূপ বা manifest content। ব্যক্ত-রূপ বা manifest content-এর প্রেক্ষাপটে অচেতনের অবদমিত ইচ্ছার যে প্রতীকী বক্তব্য থাকে, যার সহজ ও সরল অর্থ আমাদের জানা থাকে না। তাই হল একটি

স্বপ্নের অব্যক্ত-রূপ বা Latent content। ব্যাপারটি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক, ধরা যাক একজন স্বপ্নে দেখল যে সে একটি পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। 'পাহাড় থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া'-র ব্যাপারটি আমাদের ভাষার বাস্তবতায় অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু অচেতনের বক্তব্য (Latent content) হিসেবে এর অর্থ হতে পারে 'প্রেমিকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান', 'যৌনকর্মে অক্ষমতা', 'সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পতন' কিংবা 'অন্য যে-কোনো রকম হতাশা'। স্বপ্নটির অব্যক্ত-রূপ বা Latent content-এর প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য মনোবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড স্বপ্ন ও স্বপ্নের অর্থ উদ্ধারে মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত বই Interpretation of Dreams এবং এ-বইয়ে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যৌক্তিক এবং প্রয়োগযোগ্য, যদিও কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েডের তত্ত্বসমূহের সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতির জন্য একটি কথা বলা আবশ্যক। বাজারে যে নূরানী 'খাবনামা'-সমূহ কিনতে পাওয়া যায় তার সাথে ফ্রয়েডের Interpretation of Dreams-এর কোনো সম্পর্ক নেই, তবে এ কথা সত্য যে 'খাবনামা' রচনার প্রেক্ষাপটেও কাজ করে মানবিক মনস্তত্ত্ব এবং স্বপ্নের Latent content আবিষ্কারের বাসনা।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের মন চেতন (conscious), অবচেতন (pre-conscious) আর অচেতন (unconscious) পর্যায়ে বিভক্ত। ভাষা-মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান, ধারণা, ইচ্ছা ইত্যাদির মতো সুস্পষ্ট বিষয় আর উপাদান নিয়ে অবস্থান করে মানুষের মনের চেতন স্তর। অবচেতন মনে থাকে স্মৃতিতে জমে থাকা বিভিন্ন বিষয়-আসয় (এরকম স্মৃতি হারিয়ে গেছে বলেই আমরা ভাবি) এবং এই সুপ্ত স্মৃতিগুলোকে প্রয়োজনমতো চেতন স্তরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অচেতন মন হল অবদমিত কামনা-বাসনার নিবাস। সমাজ-বাস্তবতায় থেকে আমাদের কামনা ও বাসনার (যৌন-ইচ্ছাসহ) যে উপাদানগুলো চাওয়া ও পাওয়ার সমতা রক্ষা করে তৃপ্ত হয়নি, তা অবদমিত হয়ে অচেতনে বাসা বাঁধে। এই অবদমিত কামনা-বাসনাই প্রতীক হয়ে ভেসে ওঠে স্বপ্নে, সৃষ্টি করে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, সমাজে অবস্থান করেও আমরা হয়ে যাই মানসিক রোগী।

ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী মনের চেতন (conscious) ও অবচেতন (pre-conscious) স্তর-এর সমন্বয়ে তৈরি হয় একজন ব্যক্তিমানুষের অহং বা Ego। সামাজিক অহং বা Ego সবসময় বাস্তবতার নিয়ম-কানুন (Reality Principle) মেনে চলে এবং অচেতনে বন্দী কামজ ইচ্ছা/বাসনাকে সমাজ-বাস্তবতায় আসতে দেয় না। ফ্রয়েডের সংশোধিত মতবাদে অহং বা Ego-র আংশিক চেতন ও আংশিক অচেতন রূপকে গ্রাহ্য করা হয়েছে। ফ্রয়েড কথিত আংশিক চেতন অহংকে আমরা শুধু অহং বা Ego হিসেবেই চিহ্নিত করব এবং অচেতন অহংকে বলব অদ বা ওফ। অদ সবসময় সুখসূত্র বা Pleasure Principle মেনে চলে; জৈবিক সুখ, কামনা, বাসনা ইত্যাদির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন চায় অদ। অদ-এর জৈবিক কামনা, বাসনা ও তাড়না যেহেতু সবসময় সমাজের নিয়ম-কানুন মানে না, সেহেতু অহং বা Ego, অদ-এর সব ইচ্ছে পূরণ হতে দেয় না বাস্তবতার সূত্র বা Reality Principle গ্রাহ্য করে। অদ-এর যে কামনা, বাসনা বা ইচ্ছা সমাজের নৈতিক আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা অপূর্ণ থেকেই অবদমিত

হয়ে অচেতন মনে জমা হতে থাকে। যে অহং বাস্তবতার সূত্র মানে, তাকে ফ্রয়েড super Ego বা অতি-অহং হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন।

ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে মানুষের যৌন-আকাঙ্ক্ষা (Libido), অবদমন (Repression) এবং শৈশবকালীন যৌনতার (Infantile Sexuality) বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের আত্মরক্ষামূলক কাজ হল অহং-প্রবৃত্তি (Ego Tendency) এবং বংশরক্ষার সাথে সম্পর্কিত কাজ হল কামপ্রবৃত্তি বা Libido। কামপ্রবৃত্তি বা Libido-এর উপাদান হিসেবে আমরা সব ধরনের প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুপ্রীতি, আদর, সোহাগ ইত্যাদিকে চিহ্নিত করতে পারি। কামপ্রবৃত্তি বা Libido-র উপস্থিতি হল একজন মানুষের জৈবিক সংগঠনের মৌলিক উপাদান এবং এর ফলে একটি শিশুর জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই আত্মকামী সত্তা হিসেবে যৌন-অনুভূতিকেন্দ্রিক কামপ্রবৃত্তি বা Libido-র দিকে এগিয়ে যায়। একটি শিশু জন্মের পর নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে গ্রাহ্য করে না এবং এ অবস্থায় সে হয়ে ওঠে এক আত্মকামী নার্সিসাস (ফ্রয়েড এই আত্মকামকে বলেন Infantile Narcissism)। বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটি কিশোর যখন তার সমবয়স্ক অন্য কোনো কিশোরের ভালোবাসা কামনা করে তখন
মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এক ধরনের কামপ্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি henosexuality (এই henosexuality যদি প্রাপ্তবয়স্কস্তর পর্যন্ত চেতনায় থাকে তবে তা homosexuality-র বিষয় হিসেবে গণ্য হয়)। একটি শিশুর henosexuality সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে চলে যায় এবং এক সময় তা নারী-পুরুষকেন্দ্রিক heterasexual Libido-র বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কামপ্রবৃত্তির উপাদান হিসেবে আরও কিছু বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন ফ্রয়েড, যার মাঝে ইদিপাস এষণা (Oedipus complex), ইলেক্ট্রা এষণা (Electra complex), মর্ষকাম (Masochism), ধর্ষকাম (Sadism), জীবনবৃত্তি (Eros) এবং মরণপ্রবৃত্তি (Death Instinct/Thenatos) উল্লেখযোগ্য।

একটি পুরুষ শিশু তার আত্মকামকে গ্রাহ্য করে বিপরীত লিঙ্গের মা-এর প্রতি যে যৌন-আকর্ষণ অনুভব করে এবং একই সাথে সমলিঙ্গের পিতাকে ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করে যে ঈর্ষা ও ঘৃণা দেখায়, তাকে ফ্রয়েড ইদিপাস এষণা (Oedipus complex) হিসেবে চিহ্নিত করেন। ইদিপাস এষণার বিপরীত মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হল স্ত্রীশিশুর পিতার প্রতি যৌন-আকর্ষণ এবং মাকে ঘৃণা বা ঈর্ষা করা, যাকে ফ্রয়েড বলেন ইলেক্ট্রা এষণা (Electra complex)। মর্ষকাম হচ্ছে ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রী দ্বারা নিগৃহীত হয়ে যৌনসুখ নেয়া, আর ধর্ষকাম হল ভালোবাসার মানুষকে নিপীড়ন করে যৌন তৃপ্তি পাওয়া।

ফ্রয়েডীয় মতবাদে বলা হয়েছে, একটি নারী সবসময় লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতায় (penis envy) ভোগে। আবার একটি পুরুষ-শিশু যখন দেখে যে নারী-শিশুর পুরুষাঙ্গ নেই, তখন তার মনে লিঙ্গ হারানোর ভয় ঢুকে যায়। বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড বলেন, প্রতিটি পুরুষের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অবস্থান করছে লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি বা castration fear, আর প্রতিটি নারীর মনে অবস্থান করছে লিঙ্গহীনতাজনিত বা Penis Envy জনিত হীনমন্যতার। ফ্রয়েড তাঁর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রতিরোধ পদ্ধতি (Defense Mechanism)

সমূহের বর্ণনা করেছেন যা অহং, অদ, অতি-অহং, অবদমন, ইদিপাস ও ইলেক্ট্রা এষণা, লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি এবং লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতার উপাদান নিয়ে আমাদের মনে উপস্থিত। প্রতিরোধ পদ্ধতি বা Defense Mechanism-এর বিষয় হল অহং কর্তৃক কোনো বাস্তবতাকে অস্বীকার করা (Denial), কোনো ভ্রান্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়া (Reaction Formation), কোনো কঠিন কার্য-ক্রিয়াকে সহজ কার্য-ক্রিয়া দিয়ে বিচ্যুত করা (Displacement), যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে অচেতন হয়ে যাওয়া (Repression), মনস্তাত্ত্বিক কারণে নিজের কাম ও কামনা দিয়ে অন্যকে বিচার করা (Psychological projection), নিজস্ব দুঃখ ও দুর্দশার বিপরীতে সান্ত্বনামূলক তত্ত্ব দাঁড় করানো (Intellectualization), কামনা-বাসনার বস্তু বা বিষয় না পেয়ে অন্য কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি দুর্বল হওয়া (compensation), কোনো অযৌক্তিক কাজকে মনগড়া যুক্তি দিয়ে নিজের পক্ষে আনা (Rationalization) এবং কোনো কর্ম (দুষ্কর্ম) সম্পাদনের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা কিংবা আইনের ফাঁক খোঁজা (sublimation)।

ফ্রয়েডের সব তত্ত্ব ও ধারণা সবার কাছে সমানভাবে গ্রাহ্য হয়নি। চেতন, অচেতন, অহং, অদ, অবদমন, ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, কামপ্রবৃত্তি, জীবনপ্রবৃত্তি, প্রতিরোধ পদ্ধতি, স্বপ্নের উপাদান ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির মতো তত্ত্ব মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য, কারণ এই তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতিতে করা সম্ভব সব ধরনের ভাষার যুক্তি ও বিজ্ঞান-চেতনাকে গ্রাহ্য করেই। কিন্তু পুরুষাঙ্গ, যোনি ও ভগাঙ্কুরকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনাকে ফ্রয়েডের নিজস্ব অবদমিত মন-সৃষ্ট Fantasy হিসেবেই চিন্তা করা উচিত। একটি নারী-শিশু কিংবা বালিকা যদি সত্যি সত্যি ভাবে যে তার লিঙ্গ নেই কেন, তবে যৌক্তিকভাবেই একটি পুরুষ-শিশু বা বালকও ভাবতে পারে, বাড়তি ঝামেলা হিসেবে তার লিঙ্গ আছে কেন! একজন পুরুষ কোনো কারণে 'লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি'-তে ভুগবে (পৃথিবীতে কী কর্তনযোগ্য আর কিছু নেই?) আর একজন নারীই-বা কেন লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতায় ভুগবে, তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ফ্রয়েডে পাওয়া যায় না। একজন পুরুষ কিংবা নারী তাদের জৈবিক সত্তা নিয়েই নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে, কিন্তু সমাজের ভাষা ও ভাষা-নির্ভর সমাজ-দর্শন একজন নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়নি।

জাক লাকাঁ-র দর্শন

জাক লাকাঁ তাঁর দর্শনতত্ত্বে মানুষের অস্তিত্বকেন্দ্রিক সমস্যাগুলো উন্মোচন করে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন অস্তিত্বের রূপ ও স্বরূপকে। মানবিক অস্তিত্বের সাথে যেহেতু 'মন' নামক একটি ধারণা কিংবা জৈব উপাদান প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেহেতু অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ও সমস্যা নির্ধারণের জন্য লাকাঁকে বারবার ফ্রয়েডে ফিরে যেতে হয়েছে। লাকাঁ তার তত্ত্ব-দর্শনে ফ্রয়েড ছাড়াও এনে দেন সস্যুর, ক্লদ লেভি স্ট্রাউস এবং জাক দেরিদার তত্ত্ব-ধারণাকে। ফ্রয়েডের 'যৌনতাকেন্দ্রিক' মনস্তত্ত্বের সাথে ভাষা-দর্শন মিশিয়ে জাক লাকাঁ যে তত্ত্ব-ধারণা উপস্থিত করেছেন, তা বর্তমান চেতনা-কাঠামো (Paradigm) গ্রাহ্য এবং যৌক্তিক।

ফ্রয়েড তাঁর মনস্তত্ত্বে মানুষের 'মন'-এর উপাদান হিসেবে অহং (Ego), অদ (Id) এবং Super Ego (অতি-অহং)-কে চিহ্নিত করেছিলেন। লাকাঁর প্রকল্পে কোনো সুস্পষ্ট 'অহং' বা 'আমি' অবস্থান করা অসম্ভব, কারণ অহং-এর কাল্পনিক অস্তিত্ব তৈরি হয় অচেতনে কিংবা অদ-

এর নির্জ্ঞান স্তরে। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে তা বর্ণনা করতে গিয়ে লাকাঁ প্রয়োজন (Need), চাহিদা (Demand) ও বাসনা (Desire)-কে কেন্দ্র করে কীভাবে মানুষের অকৃত্রিম (Real), কল্পিত (Imaginary) এবং প্রতীকী (Symbolic) মনোজগৎ গড়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন তথ্য ও যুক্তিসহ। জন্মের পর, প্রথম দিকে একজন মানব-শিশু 'অকৃত্রিম' বা 'Real' অস্তিত্বের সন্ধান পায় তার প্রয়োজন বা Need-কে কেন্দ্র করে। এই সময় একটি শিশুর সব প্রয়োজন মেটায় মা, ক্ষুধা লাগলেই মা এগিয়ে দেন তার স্তন, ঘুম আসলে আদর-সোহাগে ঘুম পাড়িয়ে দেন শিশুকে। এমন অবস্থায় একটি শিশু তার নিজস্ব অস্তিত্বকে মা-এর অস্তিত্ব থেকে আলাদা করতে পারে না এবং এ কারণে সে তৈরি করে নেয় এক প্রয়োজন (Need)-ভিত্তিক অকৃত্রিম (Real) অস্তিত্ব বা জগৎ (দার্শনিক হাইডেগার এমন Real বা অকৃত্রিম অবস্থানকে বলেছেন Da-Sein বা তত্রসত্তা)।

একটি শিশুর প্রয়োজনভিত্তিক Real বা অকৃত্রিম অস্তিত্ব বা জগৎ কিন্তু খুব বেশিদিন অবস্থান করে না। ছয় থেকে আঠারো মাস বয়সের মাঝে সে 'চাহিদা' বা 'Demand' ভিত্তিক এক মনস্তাত্ত্বিক 'আয়না-পর্ব' (mirror stage)-এ উপস্থিত হয়। জাক লাকাঁ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আয়না-পর্ব' (mirror stage)-এ একজন মানুষের সত্তার বিবর্তন ও 'আমি' হয়ে ওঠার ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করেছেন, যা দেকার্তের দর্শনে উল্লেখিত 'Cogito ergo sum' বা 'আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি', এ ধরনের প্রকাশে সরাসরি গ্রাহ্য নয়। লাকাঁর মানবিক সত্তা বা 'আমি' শুধুমাত্র চিন্তা দ্বারাই পরিপূর্ণ 'আমি' হয়ে ওঠে না, বরং এই 'আমিত্ব' লাভের পেছনে কাজ করে জন্ম-পরবর্তী দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation)। একটি শিশু জন্মের পর অজানা অপরিচিত বিশ্বে আত্মকামী হয়ে শুধু নিজেকেই চিনতে পারে জৈবিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এবং তার চারপাশে অবস্থানকারী সমগ্রের (others) সাথে একসময় একাত্ম হয়ে তৈরি করে নেয় এক প্রতীকী 'আমি'-কে। জন্মের পর 'আয়না-পর্বে'-র একটি 'শিশু-আমি' পার্থিব বাস্তবতায় যে প্রতিবিম্বকে দেখতে পায়, তাকে লাকাঁ ইমাগো (imago) নামে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেন, এই ইমাগোর মাঝেই অবস্থান নেয় এক কাল্পনিক আমি-সত্তা, যার সামাজিক চরিত্র তখনো নির্ধারিত হয়নি। আয়না-পর্বের এই 'আমি' এক অসহায় অবস্থায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, উৎকণ্ঠা আর ক্লান্তিকে নিয়েই দেখতে পায় নিজস্ব প্রতিচ্ছবিকে এবং এ পর্বেই অসহায়তা, মানসিক ভগ্নাংশতা আর অক্ষমতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় মানবিক বিচ্ছিন্নতা বা alienation-এর। আয়না-পর্বে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে একটি মানুষ ইহজীবনে আর কখনোই মুক্তি পায় না এবং এ কারণে লাকাঁ বলেন, কজিতো-নির্ভর মানবিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা বাস্তবে অসম্ভব। 'আয়না-পর্বে' একটি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন হয় 'চাহিদা' বা 'Demand'-কে কেন্দ্র করে এবং এ পর্বেই সে অচেতন-সৃষ্ট এক কল্পিত (Imaginary) 'আমি'-কে তৈরি করে নেয়। এই কল্পিত 'আমি-সত্তা' এক সময় উপস্থিত হয় প্রতীকী ভাষার বিশ্বে এবং ভাষাপ্রতীক নিয়ে সৃষ্টি হয় মানুষের 'কামনা' ও 'বাসনা' (Desire)-কেন্দ্রিক প্রতীকী বা Symbolic মনস্তাত্ত্বিক বিশ্ব। মানুষের অচেতন সবসময় ভাষার উপাদান নিয়ে ক্রিয়াশীল, মনের কাঠামো আর ভাষার কাঠামোকে তাই আলাদাভাবে বিচার করা মুশকিল।

ফ্রয়েড কথিত শিশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদিনির্ভর আত্মকাম বা Narcissims লাকাঁর দর্শনেও মেনে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এই আত্মকামের বিস্তার বাড়িয়েছেন লাকাঁ। তিনি বলেন, একটি শিশুর আত্মকাম শুধুমাত্র শৈশবের বিষয় নয়, আত্মকাম মানুষের সমস্ত জীবনের উপাদান হয়েই জীবন-সত্তায় অবস্থান করছে। জন্মের পর একটি শিশু তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ও পরিবেশের সাথে যে আন্তর্ব্যক্তিক এবং আন্তঃবৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপন করে, সেই ক্রিয়া ও কর্মের মাঝেও আত্মকামের উপাদান থেকে যায় সত্তাবোধের কারণে। লাকাঁ শিশুর প্রাথমিক আত্মকামের সাথে আক্রমণ-প্রবৃত্তি এবং মরণ-প্রবৃত্তির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। বাস্তবতার সূত্র (Reality Principle) আর সুখসূত্রের (Pleasure Principle) উপাদান হিসেবেই আক্রমণ আর মরণ-প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে উপস্থিত এবং এ প্রবৃত্তিগুলোর শুরু হয় আয়না-পর্বে। একটি শিশু যখন তার একান্ত নিজস্ব প্রতিবিম্বের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য দেখে, ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় এক ধরনের সংঘর্ষশীল উত্তেজনার বা বিরোধের, আর অন্যের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি একটি শিশুর কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় আদিম প্রতিযোগিতার। এই আদিম প্রতিযোগিতাই পরবর্তী জীবনে মানুষের সত্তায় অবস্থান করে আক্রমণ-প্রবৃত্তি হিসেবে। মৃত্যুকাম বা মরণ-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় একটি শিশুর জরায়ুতে ফিরে যাওয়ার উগ্র বাসনা থেকে। জন্মের পর হঠাৎ করেই একটি শিশু বিশ্বজগতের প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান নিয়ে ভাবে, মা-এর জরায়ুর পরিবেশই সুখকর ছিল। জরায়ুতে ফিরে যাওয়ার উগ্র বাসনাই পরবর্তীকালে মৃত্যুকাম হিসেবে মানবিক চেতনায় অবস্থান নেয়। মৃত্যুকাম বা মরণ-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লাকাঁ শিশুর স্তন্যদান-বন্ধকালীন মানসিক সংকটকে (weaning complex) উপস্থিত করেছেন। যে শিশু এ-সংকটকে এড়াতে পারে না, তার মনে মৃত্যুকামের অংশ হিসেবে এক ধরনের উৎকণ্ঠা সবসময়ই অবস্থান করে এবং তা অবস্থান নেয় অচেতনে। এখানে উল্লেখ্য যে মৃত্যুকামের জন্যই একজন মানুষ খুব সহজেই উপস্থিত হতে পারে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে, বাসনার অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে, জগতের ক্ষুধাকে অস্বীকার করে তুলে নিতে পারে মৃত্যুর সুখ, এমনকি নিজের জীবনকে অগ্রাহ্য করে হয়ে উঠতে পারে একজন আত্মঘাতী সন্ত্রাসী।

জাক লাকাঁ ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভাষাকেন্দ্রিক রূপক ও প্রতীকের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর এই তত্ত্ব বহুলাংশে ফ্রয়েডীয় অবচেতন, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব আর ক্লদ লেভি স্ত্রোসের নৃতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের অচেতন যেহেতু ভাষার কাঠামো গ্রাহ্য করে, সেহেতু ভাষাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রায় একই সূত্রে গাঁথা। সস্যুর বর্ণিত দ্যোতক (signifier) শূন্যতাসহ অবস্থান করলেও দ্যোতিত (signified) হবার পর অর্থ যোগান দেয়। যেমন, গাছ শব্দটির বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে কোনো গাছের অবস্থান থাকে না, বরং এই ভাষাচিহ্নটি দ্যোতক হিসেবে অবস্থান করে এবং দ্যোতিত হয়ে একটি গাছের অর্থ কিংবা চিত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। মানুষের অবচেতনে/নির্জ্ঞান স্তরে যে অবদমিত ইচ্ছা বা বাসনা অবস্থান করে সেগুলো শূন্য-অর্থসহ দ্যোতকের ভূমিকা নিতে পারে এবং দ্যোতিত হয়ে সৃষ্টি করতে কিছু অর্থ/অনর্থকেন্দ্রিক রূপকের। সস্যুর ভাষাচিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক/দ্যোতিত (signifier/signified)-এর উপস্থিতির কথা বলেছেন, কিন্তু লাকাঁর মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে সস্যুরের 'দ্যোতক/দ্যোতিত' প্রকল্প গ্রাহ্য নয়। সস্যুর ভাষা-চিহ্নের বিপরীতে, দ্যোতক/দ্যোতিত

(signifier/signified) সমীকরণ দেখতে পান, আর লাকাঁ দেখেন দ্যোতক"দ্যোতক"দ্যোতক"দ্যোতক (Signifier"Signifier"Signifier"Signifier)-এর মতো ভাষা-প্রতীকের এক অসীম প্রবাহ (যা জাক দারিদা কথিত Freeplay of Language প্রকল্পকে গ্রাহ্য করে, সমর্থন করে)। লাকাঁ রূপকের সৃষ্টির পেছনে অবদমিত ইচ্ছার (ভাষা মাধ্যমে) বারবার ফিরে আসার ঘটনাকেই উন্মোচন করতে চান। একজন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী কিংবা একজন সাধারণ মানুষও তার অবদমিত কামনা-বাসনার বিপরীতে কিছু রূপকের সৃষ্টি করতে পারে এবং তা উপস্থাপন করতে পারে ভাষামাধ্যমে। লাকাঁর মতবাদ গ্রহণ করলে, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে একজন মানুষ বাস করে প্রতীকী-শৃঙ্খলার জগতে এবং এই প্রতীকী-শৃঙ্খলা মূলত ভাষাসৃষ্ট।

লাকাঁ বলেন,– মানুষের চেতনা সংগঠিত হয়, কল্পনা, প্রতীক আর সত্যের সমন্বয়ে। তাঁর এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানসিক রোগীর চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে, যেখানে ভাষাকেন্দ্রিক মনোচিকিৎসাই হল একমাত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি। আমাদের পরিচিত বিশ্বে একমাত্র মানুষের ভাষা আছে এবং এ কারণে মানুষই হচ্ছে একমাত্র চেতনাযুক্ত প্রাণী (এখানে উল্লেখ্য যে মানুষ নিজেই মানুষের ওপর চৈতন্যের উপাদান আরোপন করেছে)। চেতনাযুক্ত মানুষের অবচেতনে বেড়ে-ওঠা কোনো অবদমিত ইচ্ছাকে উদ্ধার করা কিংবা কোনো মানসিক বিপর্যয়কে (trauma) আবিষ্কার করার একমাত্র পথই হচ্ছে ভাষামাধ্যমে কথোপকথন চালিয়ে অবচেতনের দ্যোতককে অর্থবোধক করে দ্যোতিত করা। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি,– অবচেতনকে তখনই চেতনে আনা সম্ভব যখন অবচেতনের প্রতীকী রূপককে সমাজের গ্রাহ্য ভাষা-ব্যবস্থা কাঠামোতে তুলে আনা সম্ভব। অবচেতন ও ভাষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার পর লাকাঁ বলেন যে অবচেতন ভাষার আকারে গঠিত কিংবা অবচেতনের কোনো ভাষাহীন অস্তিত্ব নেই। অবচেতন ও ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লাকাঁ মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনের দ্বারস্থ হন এবং মৌলিক সত্তা (Da sein) সৃষ্ট ধ্বনি Rede এবং সমগ্র সত্তার (The They) বাচাল উচ্চারণ Gerede-কে উপস্থিত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ভাষার মৌলিক চিহ্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি মৌলিক সত্তার অধীন হলেও, প্রতিদিন আমরা সমগ্র-সত্তার প্রতীকী শৃঙ্খলার সাথেই যুক্ত রাখি আমাদের।

মানুষ ও সমাজের মাঝে যে সম্পর্ক তা ভাষা-মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত এবং এ কারণেই জন্মের পর থেকে ভাষা-মাধ্যমেই সমাজের নিয়ম ও কানুন আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে অবদমন হিসেবে অবচেতনে অবস্থান নেয়। যে এই ভাষাসৃষ্ট অবদমনকে মেনে নিতে পারে না সে-ই হয় মানসিক রোগী। লাকাঁ ভাষাসৃষ্ট প্রতীকের সামাজিক ব্যবহারের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে বিভিন্ন মন্ত্র, ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন বাক্যের উচ্চারণ ইত্যাদি মানুষের অবচেতনে প্রচণ্ডভাবে কাজ করে। এরকম ঘটনার প্রেক্ষাপটে কাজ করে মানুষের অবচেতনে রক্ষিত ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন, যা মন এবং শরীরকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। কোনো-এক পীর সাহেবের দোয়া কিংবা এক ওঝার মন্ত্র, রূপক হিসেবেই, একটি মানুষের অবচেতনে রক্ষিত দ্যোতককে নতুন মাত্রার দ্যোতক হিসেবে উপস্থিত করতে পারে এবং এমন একটা অবস্থা মনঃসমীক্ষণের বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

মানুষের ভাষা ও ভাষা প্রয়োগের নিয়ম-কানুন জন্মের পূর্ব থেকেই নির্ধারিত এবং একটি নিয়ন্ত্রিত ভাষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত উপাদান হিসেবেই বিশ্ব-জগতে মানুষ হঠাৎ করেই উপস্থিত।

এমন একটা পূর্বনির্ধারিত অবস্থাকে গ্রাহ্য করে লাকাঁ বলেন– 'Man speaks therefore, but it is because the symbol has made him man'। ভাষাসৃষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ভাষা-মাধ্যমেই মানুষকে বন্দী করে সামাজিকতায়। ফ্রয়েড বর্ণিত ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি, লিঙ্গহীনতাজনিত হীনমন্যতা ইত্যাদি ভাষা-মাধ্যমেই মানুষের মনে চূড়ান্তভাবে অবস্থান নেয়। আত্মীয়-সম্ভোগকে কেন্দ্র করে যে Incest taboo আমাদের সমাজে বিস্তার লাভ করেছে (ভাষা-মাধ্যমে) তার সাথে চেতন-সত্তার কোনো বিরোধ না-থাকলেও অবচেতনের অবস্থা থাকে বিপরীত মেরুতে। লাকাঁ আত্মীয়তার নামকরণ বা Kinship nomination-কে Incest taboo-র ঐতিহাসিক বিবর্তিত রূপ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। বাবা-মা, খালা-খালু, ভাই-বোন– এ ধরনের নামকরণের অর্থই হল একজন ব্যক্তি-এককে বুঝিয়ে দেয়া, কার সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে এবং কে যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে লাকাঁর মন্তব্য– 'For without kinship nomination, no power is capable of instituting the order of preferences and taboos which find and weave the years of lineage through succeeding generations.'
সমাজ ও সভ্যতা-কেন্দ্রিক আইনের দাবিতে মানুষের যে যৌন-অবদমন হল, তার প্রেক্ষাপটে কাজ করে পিতা ও পরিবার-কেন্দ্রিক ভাষা-সৃষ্ট কিছু প্রতীকী-শৃঙ্খলা এবং এ প্রতীকী-শৃঙ্খলার মাধ্যমেই আমরা স্বীকার করে নেই পিতার প্রভুত্বকে। এ বিষয়ে লাকাঁ বলেন, 'It is in the name of the father that we must recognize the support of the symbolic function which from the dawn of history, has identified his person with the figure of the law.' পিতার প্রভুত্ব আর পারিবারিক নিয়ম-কানুনকে কেন্দ্র করে যে ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা ইত্যাদি মানুষের মনে কাজ করে তাকে লাকাঁ ভাষা-সৃষ্ট প্রতীকী শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবেই গ্রাহ্য করেন এবং বলেন যে পিতার প্রভুত্ব ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম, কাব্য, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি মানুষকে বন্দী করে রেখেছে এবং এই বন্দীত্বদশা থেকে মুক্তি পাওয়াও বাস্তবে অসম্ভব।

জাক লাকাঁ মানুষের জীবনে প্রকৃত সত্য কী, তা-ও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন রকম বিশ্লেষণের পর তিনি মৃত্যুকামকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেন। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার যে কোনো মৌলিক বিশুদ্ধ সত্তাকেই 'Sein-zum-tode' বা 'মৃত্যুর দিকে ধাবমান' সত্তা হিসেবে দেখেন এবং মৃত্যুকে মৌলিক সত্তার শেষ ও পরিপূর্ণ অবস্থা হিসেবে গ্রাহ্য করেন। লাকাঁর দর্শনে truth বা সত্য যে রূপে আবির্ভূত, তা হাইডেগার-দর্শনেও পাওয়া যায়।

লাকাঁ তাঁর দর্শনে বর্জন বা foreclosure-কে অবদমনের পাশাপাশি অবস্থান দিয়েছেন, যদিও অবদমন ও বর্জন দুই মেরুতে অবস্থান করে। একটি মানুষ যে-সব বিষয় বর্জন করতে পারে না অথচ বর্জন করার প্রয়োজন বোধ করে সেগুলোকে অবদমন হিসেবে নির্জ্ঞান স্তরে রেখে দেয়। লাকাঁ মনে করেন, যে-বিষয় একবার বর্জন করা হয়েছে সে-বিষয়ের চিহ্ন অবচেতন কিংবা নির্জ্ঞান স্তরে আবশ্যিকভাবেই থেকে যায় এবং জীবনের কোনো-এক সময়ে বর্জিত বিষয়ের রূপ ও স্বরূপ প্রতীক কিংবা রূপক হিসেবে মানুষের চেতন স্তরে প্রকাশিত হতে পারে। বিষয়টিকে বর্জিত অনুষঙ্গের ক্রিয়া-কর্মরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব।

ফ্রয়েড মানুষের জীবনে লিঙ্গের অবস্থানকে কামনা-বাসনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে উপস্থিত করেছেন। লাকাঁর দর্শনে উপস্থিত লিঙ্গ কিন্তু রক্ত-মাংসের পুরুষাঙ্গ কিংবা ভগাঙ্কুর নয়; লিঙ্গের অবস্থান এখানে একটা প্রতীক কিংবা concept হিসেবেই বিবেচিত। লিঙ্গকেন্দ্রিক এই প্রতীক ভাষা-মাধ্যমে বস্তু কিংবা বিষয়ের ওপর লিঙ্গের তাৎপর্য স্থাপন করে এবং এর ফলেই বস্তু ও বিষয়ের মাঝে আমরা 'একটি পুরুষ' কিংবা 'একটি নারীকে' খুঁজে পাই। ভাষা-মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন উপলব্ধি-সংবেদ তাই কখনো (হয়তো-বা) লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। লিঙ্গ-কেন্দ্রিক লাকাঁর এই মতবাদ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। দার্শনিক জাক দেরিদা
লাকাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করে লৈঙ্গিক-অর্থকেন্দ্রিকতার (Phallogocentricism) অভিযোগ এনেছিলেন।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্ব

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং তাঁর মনস্তত্ত্বে একজন ব্যক্তিমানুষ ছাড়াও সমাজবদ্ধ সামাজিক মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষের 'মন' শুধুমাত্র কোনো একজন একক-মানুষকে কেন্দ্র করেই অবস্থান করে না, সমাজে অবস্থানকালে সামাজিক সব মানুষের 'যৌথ-মনস্তত্ত্ব' ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বে যে চেতন অহং বা Ego-র কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ুং-এর দর্শনে গ্রাহ্য, তবে ফ্রয়েড-কথিত অচেতন অহং, অদ বা Id, ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিগত অচেতন (Personal Unconscious) হিসেবে এসেছে। ব্যক্তিগত অচেতনে সংরক্ষিত যে-কোনো ধরনের স্মৃতি (যা হয়তো-বা আপাতত অচেতনে হারিয়ে গেছে, সুপ্ত অবস্থায় আছে) প্রয়োজন হলে অহং বা Ego-র উপাদান হয়ে চেতন মনে ফিরে আসতে পারে। এই ঐতিহাসিক বা প্রত্ন-স্মৃতির ঘুরে-ফিরে আসাকে কেন্দ্র করেই কাল ইয়ুং প্রস্তাব করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'যৌথ অচেতন' বা 'Collective Unconsciousness'-এর তত্ত্ব-ধারণা। যা আমাদের বর্তমানের ব্যক্তি, সমাজ, আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, সমাজ-চেতনা ইত্যাদিকে যৌথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। 'যৌথ অচেতন' বিষয়টি প্রতিটি মানুষের জন্য পূর্বনির্ধারিত। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহাসিক, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক চেতনা-কাঠামো-সৃষ্ট সুপ্ত-অচেতনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, জৈবিক উপাদান হিসেবেই আমাদের মনে গভীর গহীন অচেতনে অবস্থান করতে পারে। আমাদের মাঝে 'যৌথ-অচেতন' কাজ করার কারণেই আমরা বলি Great man thinks alike, আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সব দেশের রূপকথার কাঠামো প্রায় একই রকম, কুরু-পাণ্ডবের 'মহাভারত' ও রাম-রাবণের 'রামায়ণ'-এর সাথে মিল খুঁজে পাই 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি'র এবং আমাদের বঙ্গদেশের শোষণের ইতিহাস গ্রাহ্য করে বর্তমানের গণতন্ত্রও হয়ে যায় গণশোষণতন্ত্র (আমরা সব সহ্য করতে পারি, কারণ আমাদের 'যৌথ-মনস্তত্ত্বে' আছে সমাজে শোষণ ছিল, থাকবে, সুতরাং বিএনপি-আওয়ামী লীগ চুরি করবেই; ধর্ম আমাদের সবসময় সহায় হয়েছে, সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের দল আওয়ামী লীগ ফতোয়ার পক্ষে যেতেই পারে; আমাদের সমাজপতিরা ৫/৬টা বিয়ে করত, তাদের হারেম ছিল, সুতরাং এরশাদ সাহেবের দোষ নেই, তিনি ভালো লোক ইত্যাদি)।

যৌথ-অচেতনের কিছু উপাদানকেও শনাক্ত করেছেন ইয়ুং, যাকে তিনি বলেন প্রত্ন-শ্রেণী বা Archetypes [এই প্রত্ন-শ্রেণী বা Archetypes-কে তিনি কর্তৃত্বপূর্ণ (Dominant), ইমাগো (Imago), পুরাণকেন্দ্রিক (Mythological) এবং মৌলিক (Primordial) কল্পনা (Image) হিসেবেও মাঝে মধ্যে চিহ্নিত করেছেন]। যৌথ-মনস্তত্ত্বের অধিকারী হয়ে একজন মানুষের যে প্রত্ন-শ্রেণী বা Archetype থাকে তার চরিত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে। যৌথ-অচেতন-কেন্দ্রিক মানুষের বিভিন্ন প্রত্ন-শ্রেণী হতে পারে নিম্নরূপ:

ক. মাতৃ-কেন্দ্রিক প্রত্ন-শ্রেণী (Mother Archetype):
সব মানুষেরই মা আছে এবং মা-কে কেন্দ্র করে একজন মানুষের অচেতনের বিবর্তন হতে পারে (ফ্রয়েডের ইদিপাস কমপ্লেক্স-এর বিষয় এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়)। মা-এর কল্পিত প্রতিরূপ মা-এর অবর্তমানে প্রেমিকা, আদিমাতা ইভ, মাতা মেরী, দুর্গা-মা (দেবী), অন্যান্য নারী এমনকি দেশ-মাতার (motherland) ওপর বর্তাতে পারে।

খ. মানা (Mana):
মানা প্রত্ন-শ্রেণী কোনো বস্তু বা মানুষের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী। প্রজননশক্তির পূজা, পীর-দরবেশ ডাক্তার ইত্যাদি এই প্রত্ন-শ্রেণীভুক্ত মানুষের কাজ-কর্মের অংশ হতে পারে।

গ. ছায়া (The Shadow):
মানুষ এক ধরনের জীব এবং এ-কারণে যৌনতা এবং প্রজন্ম রক্ষার কাজই কোনো কোনো মানুষের জন্য মুখ্য কাজ হতে পারে এবং আমরা তাদের ছায়া প্রত্ন-শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করব।

ঘ. সামাজিক (The Persona):
সামাজিক প্রত্ন-শ্রেণী বা চবৎংড়হধ হল সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলা মানুষ। এ ধরনের মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুনে বিশ্বাসী কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে।
এনিমা ও এনিমাস (Anima and Animus): প্রতিটি মানুষের মাঝেই তার বিপরীত লিঙ্গের কিছু চরিত্র থাকে। একজন পুরুষের মাঝে থাকে Anima বা নারী -চরিত্রের উপাদান, আবার একজন নারীর মাঝে থাকতে পারে Animus বা পুরুষ- চরিত্রের উপাদান। Anima আর Animus থাকার কারণে যৌথ-মনস্তত্ত্বে অবস্থান করে আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি।

উপরে যে প্রত্ন-শ্রেণীগুলোর কথা বলা হল, এগুলো ছাড়াও আরও কিছু প্রত্ন- শ্রেণী রয়েছে। বাবা (Father), পরিবার (Family), বীর (Hero), পশু (Animal), ঈশ্বর (God), Ego বা অহং ইত্যাদি-কেন্দ্রিক প্রত্ন-শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন ইয়ুং।

অহং, ব্যক্তিগত অচেতন ও যৌথ অচেতন কোন নীতি মেনে ক্রিয়াশীল থাকে তা নিয়েও মন্তব্য করেন ইয়ুং। মনস্তত্ত্বের নীতি হিসেবে প্রথমেই আমাদের মানতে হবে 'বৈপরীত্যের নীতি' বা 'Principle of opposites'-কে যেখানে যে কোনো মানবিক মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার

প্রেক্ষাপটেই অবস্থান করে এক ধরনের বৈপরীত্য। আলোর চিন্তা করতে আমাদের বুঝতে হয় অন্ধকারকে, ভালো কাজ করতে হলে আমাদের মন্দ কাজ-সম্পর্কীয় ধারণা নিতে হবে। এমন সব যুগ্ম-বৈপরীত্যের ধারণা আমরা ইয়ুং-এর দর্শনে পাই। ইয়ুং আরও বলেন যে মানুষের কামপ্রবৃত্তি অন্তর্গত বিষয় বা ধারণা দুটির মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সমান থাকে। ভালোবাসা/ ঘৃণা, এই দুটি বৈপরীত্যকে বিশ্লেষণ করলে 'ভালোবাসা' ও 'ঘৃণা'-র মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যে সমান, এ সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না। ইয়ুং-এর দর্শনে উল্লেখিত যুগ্ম-বৈপরীত্যের সমমানের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকে 'সমমাত্রার নীতি' বা 'Principle of equivalence' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একজন মানুষ যখন মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্যের কোনটাকে গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তখন সৃষ্টি হয় এক ধরনের 'এষণা' বা 'Complex'। একজন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সময়কে গ্রাহ্য করে বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে। একজন তরুণ বা তরুণীর যৌন-বাসনা যে মাত্রায় থাকবে, ঠিক একই মাত্রার যৌন-বাসনা কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার কাছ আশা করা যায় না। দেশকাল-কেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক এই বিবর্তনকে ইয়ুং 'পতনের নীতি' বা 'Principle of entropy' হিসেবে চিহ্নিত করেন। মনস্তত্ত্ববিদ কাল ইয়ুং মানুষের আত্মমুখী (Introvert) ও বহির্মুখী (Extravert) চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রায়োগিক মনস্তত্ত্বের বিষয়। একজন মানুষ আত্মমুখী না বহির্মুখী হবে তা নির্ভর করে অহং, ব্যক্তিগত অচেতন ও যৌথ-অচেতনে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ (Function)-এর ওপর এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-কলাপের উপাদান হল চিন্তা (Thinking), সংবেদ (Sensing), দূরদৃষ্টি (Intuting) ইত্যাদি। কার্ল ইয়ুং সামাজিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তারিতভাবে, তবে তাঁর সব প্রকল্প সমানভাবে সবার কাছে গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সামাজিক মানুষের যৌথ-অচেতনের বিশ্লেষণ ছাড়া মানুষকে ভালো করে চেনার অন্য কোনো উপায় নেই।

রূপকথার মনস্তত্ত্ব

মানুষের ভাষার জগৎ এক রূপকথার জগৎ। এখানে প্রতিটি ভাষাচিহ্ন বিভিন্ন মাত্রার অর্থ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অসীমের দিকে। কোনো-এক স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কোনো-এক ধ্রুব অর্থ যোগাচ্ছে না আমাদের ভাষাচিহ্নগুলো। এমন একটা অবস্থায় আমাদের 'মনস্তত্ত্ব' বা 'চেতনা-কাঠামো' বিবর্তিত হচ্ছে ভাষাকে কেন্দ্র করে, আমরা তৈরি করে নিচ্ছি আমাদের নিজস্ব বিশ্ব (আমি স্মরণ করছি দার্শনিক টমাস কুন-এর Paradigm-এর দর্শন)। আমাদের ভাষা হল এক ধরনের প্রতীকের রাজ্য, আর এই প্রতীকের রাজ্যে ভাষার কারুকার্যে সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টি হয়েছে, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, রূপকথা ইত্যাদির মতো ভাষা-সৃষ্ট উপাদান, তৈরি করেছে বিভিন্ন ফ্যান্টাসির জগৎ, উপস্থিত করেছে নিত্য-নতুন ব্যঞ্জনার মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি। রূপকথা হল ভাষা-সৃষ্ট আদিম সাহিত্য, যা মানবিক চেতনা-চৈতন্যের ফ্যান্টাসিকে এবং মনস্তাত্ত্বিক কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণ করতে যুগে যুগে বারবার উপস্থিত হয়েছে। রূপকথা মানুষের যৌথ-অচেতন কিংবা সমাজ-মনস্তত্ত্বের উপাদান, এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় আমাদের জানা নেই।

একটি শিশু যখন তার বাস্তব (Real) ও 'আয়না-পর্বের' কাল্পনিক (Imaginary) ভুবন পেরিয়ে ভাষার প্রতীকী (Symbolic) বিশ্বে পদার্পণ করে, ঠিক তখনি একজন মা কিংবা

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শিশুটিকে পরিচয় করিয়ে দেয় 'রূপকথার মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার' সাথে। একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া, বাঘ-মামার গল্প, লাল পরী- নীল পরীর কাহিনী, রাজপুত্র-রাক্ষস-রাজকন্যার কার্যকলাপ ইত্যাদি 'রূপকথার' উপাদান হয়েই একটি শিশুর মনে অবস্থান নেয়। একটি শিশু/বালক/বালিকা যেহেতু তার লিঙ্গ সম্পর্কে সচেতন (এই লিঙ্গের সাথে 'নারী-পুরুষের' জৈবিক সংগঠন বা Phallus-এর সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে, লিঙ্গ ও যোনিকেন্দ্রিক যৌন-চেতনার অবস্থান গৌণ বা Latent), সেহেতু 'পরী ও রাজপুত্র' একটি শিশুমনে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই যুগ্ম-বৈপরীত্য হিসেবে কাজ করে। মানুষের যৌথ-অচেতন 'পরী' ও 'রাজপুত্র'-কে গ্রহণ করে কামনা-বাসনা বা Libido-র রূপক সত্য হিসেবে। শিশুকালে অচেতনে গেঁথে যাওয়া 'পরী ও রাজপুত্রের' মিথ্যা-সত্য থেকে একজন মানুষ কখনোই আর মুক্ত হতে পারে না।

রূপকথার সত্য উদ্ধার করার জন্য আমরা আমাদের ভাষা-কাঠামোকেও বিশ্লেষণ করতে পারি। ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ার বিভিন্ন রূপকথার কাঠামো বিশ্লেষণ করে একত্রিশটি মৌলিক আপেক্ষক বা Function চিহ্নিত করেছেন, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল:

১. নায়ককে একটি কঠিন কাজ করতে বলা হল
২. নায়ক কাজটি সমাধান করল
৩. নায়ক মূল্যায়িত হল
৪. খল-নায়ক বা ভিলেনের চরিত্র উন্মোচিত হল
৫. ভিলেনকে নতুনরূপে দেখা গেল
৬. ভিলেনকে শাস্তি দেয়া হল
৭. নায়ক রাজকন্যাকে বিয়ে করল

আমরা আমাদের দেশের রূপকথা বিশ্লেষণ করলেও (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয়ের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বা 'ঠাকুরমার ঝুলি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য) আমরা উপরোক্ত আপেক্ষকগুলো শনাক্ত করতে পারব। সুয়োরানী/দুয়োরানী, রাজপুত্র/কোটালপুত্র, লালপরী/নীলপরী, ব্যাঙ্গমা/ব্যাঙ্গমী, রাক্ষস/রাক্ষসী, রাজকন্যা/সহচরী ইত্যাদি যুগ্ম-বৈপরীত্যের ক্রিয়া ও কর্ম আমাদের ভাষা-কাঠামোকে কেন্দ্র করে মানুষের যৌথ-অচেতনের বিষয়কেই প্রতীক/রূপক হিসেবে উপস্থিত করেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই থাকে না। রূপকথার পরী ও রাজপুত্র মনস্তাত্ত্বিক কারণেই আমাদের অচেতনের অংশ হয়ে অবস্থান করে এবং এ কারণে একটি পুরুষ-শিশুর প্রথম 'পরী' হয় তার মা আর একটি নারী-শিশু তার বাবাকে প্রথম 'রাজপুত্র' হিসেবে স্বীকার করে নেয়। আমরা যদি 'পরী ও রাজপুত্র' প্রকল্পকে আমাদের অচেতনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া হিসেবে মেনে নেই, তবে বিষয়গুলো ফ্রয়েড-কথিত ইদিপাস ও ইলেক্ট্রা এষণার সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করবে না, কিন্তু ফ্রয়েডের 'যৌনতা'-কে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনবে। একটি কল্পনার 'পরী' কিংবা 'রাজপুত্র'র সাথে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন (Latent) যৌনতাকে গ্রাহ্য করে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমাদের যে মনোদৈহিক আকর্ষণ রয়েছে, তারই প্রতিফলিত মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হল একটি পরী কিংবা একটি রাজপুত্র।

রূপকথার উপাদানে যে আমাদের অচেতন লুকিয়ে আছে (অবদমিত অচেতনের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন হিসেবে) তা বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়েন বারফিল্ড বলেন– 'একটি শিশুর সাথে রূপকথার চরিত্রের পরিচয়ই হল কল্পনার জগতে শিশুটির প্রথম অংশগ্রহণ (original participation)। এ ব্যাপারে মারি-লুই দ্য ফ্রাঞ্জ বলেন– 'Fairy tales are the purest and simplest expression of collective unconscious psychic process' আর ফ্রয়েডও স্বীকার করেন যে– 'Fairy tales and myths do not differ fundamentally from dreams and they speak the same symbolic language'।

পরী ও রাজপুত্র প্রকল্প

'পরী ও 'রাজপুত্র' শব্দ দুটি প্রতীকী (symbolic) বিশ্বের ভাষা, যেখানে 'পরী' শব্দটির মনস্তাত্ত্বিক অর্থ হল 'কল্পনার নারী' আর 'রাজপুত্র' শব্দটি বোঝায় 'কল্পনার পুরুষ'-কে। মানুষের জৈবিক জীবন নারী ও পুরুষ-সত্তাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাচ্ছে প্রজন্ম সংরক্ষণের মাধ্যমে এবং এ কারণেই স্বপ্নের 'নারী' আর 'স্বপ্নের পুরুষ' অবস্থান করবে আমাদের চিন্তা-চেতনায়, আর এই স্বপ্নের ঐতিহাসিক/প্রাগৈতিহাসিক উপাদান হবে অচেতনে অঙ্কিত 'পরী' ও 'রাজপুত্রের' ছবি।

পরী ও রাজপুত্র প্রকল্পের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার জন্য ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব, ফ্রয়েড, লাকাঁ ও ইয়ুং-এর দর্শন এবং রূপকথার মনস্তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আমাদের গুহামানব পূর্বপুরুষদের মাঝে যে শক্তিশালী উত্তম শিকারিপুরুষটি অবস্থান করত সেই ছিল 'রাজপুত্র' এবং তার ইচ্ছা আর বাসনাকে কেন্দ্র করেই গুহা-সমাজের নারী বা 'পরী'রা হয়ে যেত পুরুষ বা 'রাজপুত্রের' সম্পদ। পরবর্তীকালে 'প্রজনন বা উর্বরাশক্তির' ধারণা জন্ম দিয়েছিল দেবী-তত্ত্বের এবং আমরা দেবতাদের পাশাপাশি পেয়েছি অনেক দেবী বা পরীকে। দেবতা বা রাজপুত্র হিসেবে আমাদের কল্পনা আর বিশ্বাসের জগতে এসেছে পুরুষ ঈশ্বর, গৌতম বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, শিব, শিবলিঙ্গ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কুবের ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক অস্তিত্ব। পাশ্চাত্যের 'রাজপুত্র'-কেন্দ্রিক পৌরাণিক দেবতাদের উপস্থিতি ছিল সমাজ ও বাস্তবতাকেই গ্রাহ্য করেই। আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদের 'যৌথ-অচেতন' গ্রাহ্য করে অনেক 'পরী', দেবীর চরিত্র নিয়ে, সমাজে অবস্থান করত এবং এখনো করছে। এ প্রসঙ্গে দেবী মনসা, জাঙ্গুলী, পর্ণশবরী, যক্ষিণী, কুষ্মাণ্ডিনী, অম্বিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, বসুধারা, দুর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী ইত্যাদি নামের পরীকেন্দ্রিক দেবীশক্তির বিবর্তনকে আনা যায়। পাশ্চাত্যেও পরীকেন্দ্রিক দেবীর বিবর্তনকে চিহ্নিত করা সম্ভব। ভেনাস, আফ্রোদিতি, ডায়না ইত্যাদি নামের দেবীর সৃষ্টিতে মানুষের অচেতনের পরী-কল্পনাই কাজ করছে প্রত্যক্ষভাবে, এমন চিন্তা যৌক্তিকভাবেই করা সম্ভব।

পুরুষের যৌন-চেতনা সবসময় বহুগামী চরিত্র নিয়ে সমাজে অবস্থান করে এবং এ কারণে একজন পুরুষের কল্পনার পরীর অবস্থানও বিবর্তনশীল। একটি পুরুষ কেন বহুগামী তা বিশ্লেষণ করার জন্য 'শুক্রাণু ও ডিম্বানু তত্ত্ব'-কে বিচার করা সম্ভব। একটি পুরুষের শুক্রাণু একের অধিক নারীর ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে পারে, কিন্তু একজন নারী প্রতি মাসে শুধুমাত্র একটি ডিম্বানুর জন্ম দেয় এবং কোনো একটি একক শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বানুটি নিষিক্ত হলে তা নয় মাস গর্ভে ধারণ

করতে হয়। পুরুষের শুক্রাণুর বহুগামী ক্ষমতা ও নারীর ডিম্বানুর সৃষ্টি ও নিষিক্ত হওয়ার সীমাবদ্ধতা, একটি পুরুষকে 'বহু-পরী-গামী' করে তোলে এবং একটি নারীকে করে তোলে 'একক রাজপুত্রকেন্দ্রিক' প্রজন্মে উত্তরণের সহায়ক শক্তি।

একটি পুরুষের চেতন-অচেতনে যে বহু-পরী-ভোগের যৌন-বাসনা বা উন্মাদনা থাকে তা সমাজ-বাস্তবতায় কখনোই পূরণ হয় না এবং এই কারণে একজন পুরুষ সাধারণত অবদমিত সত্তা হিসেবেই সমাজে অবস্থান করে। যে পুরুষ বহু-পরী-ভোগের লালসায় যত্র-তত্র যৌনকর্মে লিপ্ত হয়, সে-ও একসময় হয়ে যায় যৌনবিকারগ্রস্ত রোগী। নারীদের বেলায় 'রাজপুত্র'-কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনাই প্রাধান্য পায়, একটি নারী সবসময় কামনা করে তার স্বপ্নের পুরুষ কোনো-এক রাজপুত্রকে। আমাদের সমাজে সব পুরুষের গুণ রাজপুত্রসুলভ নয় এবং এ কারণে সমাজের নারীরাও অনেকসময় অবদমিত সত্তা হিসেবেই অবস্থান করে।

একজন অবদমিত পুরুষ বা নারী-সত্তায় ফ্রয়েডের ইদিপাস বা ইলেক্ট্রা এষণা প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এবং এই অবদমিত ইচ্ছার রূপ সৃষ্টি করতে পারে স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নের উপাদান নিয়ে বিভিন্ন প্রতীক ও রূপকের। জাক লাকাঁর মনস্তত্ত্ব গ্রাহ্য করে আমরা বলতে পারি যে রাজপুত্র, নারী বা পরী-কেন্দ্রিক অবদমিত কামনা-বাসনা সৃষ্টি করে নিত্য-নতুন দ্যোতক বা Signifier। বিষয়টিকে একটি ইদিপাস/ ইলেক্ট্রা-এষণাজাত প্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যা নিচে দেখানো হল:

মা"পরী"অন্যান্য নারী"প্রেমিকা"সুচিত্রা সেন"লাবণ্য"
বনলতা"সুরঞ্জনা" " " " মাতৃভূমি" "অসীম
বাবা"রাজপুত্র"অন্যান্য পুরুষ"প্রেমিক"স্বামী রাজপুত্র"
বিরোধ"নতুন রাজপুত্র"পিতৃভূমি" " অসীম

উপরে ইদিপাস/ইলেক্ট্রা এষণার যে প্রবাহ দেখান হল তা ইয়ুং-এর দর্শনে আলোচিত Mother Archetype এবং Father Archetype-কে সমর্থন করে। এখানে উল্লেখ্য যে রাজপুত্র কিংবা পরী-কেন্দ্রিক অবদমন একজন পুরুষ কিংবা নারীর মনে বিভিন্ন মাত্রার মানসিক উপসর্গ নিয়ে আসে এবং এর ফলে ফ্রয়েড-কথিত বিভিন্ন প্রতিরোধ পদ্ধতিও (Defense Mechanism) সক্রিয় থাকে। অবদমিত যে-কোনো সত্তায় আমরা Displacement, Repression, Psychological Projection, Intellectualization, Compensation, Rationalization Ges Sublimation-এর ক্রিয়া-বিক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারব।

সমাজে অবস্থানরত সব সত্তাই (পুরুষ ও নারী) অল্প মাত্রায় হলেও অবদমিত, কিন্তু এই অবদমন সবসময় যে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে, তা নয়। একজন অবদমিত নারী বা পুরুষ তার অচেতনের বিরোধ ও বাধাকে নিজের অজান্তেই সৃষ্টিশীল কাজে রূপান্তর করতে পারেন। মানুষের অবদমিত 'পরী ও রাজপুত্র' কামনা সৃষ্টি করতে পারে মহৎ শিল্প ও সাহিত্য। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ/সমালোচক সৃষ্টিশীল মানুষকে কিছুটা 'খেপাটে' বা 'উদ্বায়ুগ্রস্ত' (Neurotic) হিসেবে চিহ্নিত করেন। Creativity-এর সাথে যে Neurosis-এর সম্পর্ক আছে, তা নিয়ে

লিউনেল ট্রিলিং, এডমুক্ত উইলসন প্রমুখ সমালোচক/ভাষাতত্ত্ববিদরা প্রচুর আলোচনা/সমালোচনাও করেছেন। আমাদের দেশেও কবিসত্তায় যে খেপাটে প্রেম, ভালোবাসা ও কাম-এর আধিক্য দেখা যায়, তার মূলেও রয়েছে 'পরী ও রাজপুত্র'-কেন্দ্রিক Signifier-এর বিবর্তন। আমাদের 'না-পাওয়া' পরী তাই বারবার ফিরে আসে প্রিয়তমা রূপে, নাম হয় নন্দিনী, বনলতা, লাবণ্য কিংবা অন্য কোনো রূপক/প্রতীক।

বাংলাদেশের পরিবেশ ও সমাজ বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে এখানকার পুরুষসমাজ পরী ও নারী-কেন্দ্রিক কামনা-বাসনা নিয়ে ভীষণভাবে অবদমিত (এমনকি চার বিবি করে আনার পরও কিংবা বহু-নারী ভোগ করেও, 'কল্পনার পরী' কামনা-বাসনার অবদমন হয়েই অচেতনে অবস্থান করে)। এমন একটা অবস্থাই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান করা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের দেশের অবদমিত পুরুষসমাজ ফ্রয়েডের Displacement, Denial এবং Compensation নামক প্রতিরোধপদ্ধতিসমূহ গ্রাহ্য করে হয়ে যায় দুর্নীতিপরায়ণ। তাদের এই দুর্নীতিকে তারা Rationalize করে ধর্মের মাধ্যমে, প্রয়োজন হলেই তারা দান করে মসজিদ-মাদ্রাসায়, গরিবদের কিছু টাকা-পয়সা বিতরণ করে এবং সুযোগ পেলে মক্কা-মদীনায় গিয়ে নিজেদের ভাবে শিশুর মতো পবিত্র। আমাদের সামাজিক অবদমন অনেক সময় সৃষ্টিশীল সময় নিয়ে আসে, আমরা আমাদের সমাজে খুঁজে পাই বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, শিল্পী এবং কর্মকুশলী জ্ঞানী-গুণীজনকে।

বাংলাদেশের নারী-জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিক কারণেই অবদমিত, পুরুষসমাজ দ্বারা নির্যাতিত (বর্তমানে শহর-কেন্দ্রিক শিক্ষিত নারীদের বেলায় এমন নির্যাতন কিছুটা কমেছে বটে, কিন্তু নারী-সত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো আসেনি)। আমাদের নারীসমাজ তাদের প্রথম 'রাজপুত্র' বাবা-র আদেশ-নির্দেশেই অবদমিত সত্তা হিসেবে 'রাজপুত্র'-র স্বপ্ন দেখে। বাবা-মা, পরিবার পরিজন যে 'রাজপুত্র'-কে ধরে এনে দেয়, তাকে নিয়েই তার সংসার পাততে হয়, স্বপ্নের 'রাজপুত্রের' দেখা সে কখনোই পায় না। আজকাল কোনো কোনো বাংলাদেশী নারী তাদের 'রাজপুত্র'-কে নিজেই পছন্দ করে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অবদমিত মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো একটি নারীর কাছে 'মিথ্যা-রাজপুত্রের' চরিত্রই উন্মোচিত করে। এমন ঘটনার কারণেই আমাদের সমাজেও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা বাড়ছে, আর একটি নারীকে আবারও খুঁজতে হচ্ছে নতুন কোনো রাজপুত্রকে। কিন্তু একটি বিবাহিত নারী যেহেতু 'নষ্ট, পচে যাওয়া নারী' হিসেবে বিবেচিত হয় আমাদের সমাজে, সেহেতু নতুন স্বপ্নের 'রাজপুত্র' খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং এ কারণে আমাদের নারীসমাজের অবদমন আরও বেড়ে যায়। তারপরও আমাদের সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন এখন শুধু স্বপ্ন দেখতে পারি যে কোনো-একদিন আমাদের সামাজিক অবদমন কমবে কিংবা বাস্তব-গ্রাহ্য অবদমন সহই আমাদের আগামী হবে সৃষ্টিশীল সময়।

অনুচিন্তন

পরী ও রাজপুত্র-কেন্দ্রিক যে প্রকল্প উপস্থাপন করা হল তা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে এই প্রকল্পের অনেক উপাদান হয়তো ইতিমধ্যেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে (যা লেখকের জানা নেই) এবং এ-কারণে প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা ইত্যাদি নিয়ে পাঠক, সমালোচক ও মনস্তত্ত্ববিদরা আরো আলোচনা/সমালোচনা করবেন, এমন আশা করা

যায় । এখানে উল্লেখ্য যে প্রবন্ধটি লেখার আগে আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু ক্ষুদ্র-মাত্রার জরিপ কাজ চালিয়েছিলাম । জরিপ কাজ চালানোর সময় 'পরী' ও 'রাজপুত্র' প্রকল্পের সমর্থনে বেশ কিছু উপাদান উদ্ধার হয়েছিল এবং আমি মনে করি এ ব্যাপারে আরো আলোচনা, সমালোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে ।

তথ্যপঞ্জী

১. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাক লাকাঁ বা পিতৃনামের পরাক্রম, এক্ষণ, ১৩৯৮ ।
২. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, ঢাকা, ১৯৯৭ ।
৩. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, ঢাকা, ২০০৪ ।
৪. মঈন চৌধুরী, ভাষাভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ, উলুখাগড়া, ২০০৬ ।
৫. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টি ও দেশকাল, নিসর্গ, ২০০৬ ।
৬. মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার ধর্মজীবন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭ ।
৭. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৯৪ ।
8. Barfield, Owen, A study in Idolatry, New York, Harcourt, 1965.
9. Dickmaun, Hans, The Psychological use of Fairy Tales. Tr. Boris Mathew, Chiron Publication. 1971.
10. Freud, Sigmund. The Interpretation of Dreams. Ed. Tr. James Strachey, New York, Basic Books, 1965.
11. Jung, C.G. The Collected Works. Ed Herbert Read, Prinston, 1968.
12. Lacan, Jacques, Ecrits, Tr. Alan Scheridan, Tavistock, 1977.
13. Trilling, Lionel. The Liberal Imagination, New York, Viking, 1950.
14. Von Franz, Marie-Louise. The Feminine in Fairy tales. Dallas, 1972.
15. Wilson, Edmund. The Wound and the Bow, New York, Oxford 1997.

আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা

পূর্বকথা

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যে কোনো ঘটনাই সমালোচনাযোগ্য, প্রতিটি ঘটনাকেই 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' হিসেবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যায় । এই 'ভালো' আর 'মন্দ' সম্পর্কীয় Concept বা ধারণা সবসময় আপেক্ষিক; কারণ বিশ্ব, সময় এবং ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার 'ভাষা-চিত্র' অবস্থান করে মানুষের চেতন ও অচেতন মনে । ভাষা যেহেতু প্রচণ্ডভাবে বিনির্মাণযোগ্য, তাই চেতন ও অচেতনের ভাষা কখন কীভাবে, কোন মাত্রায়, আমাদের অর্থ যোগান দেবে, তা আমরা জেনেও জানি না, বুঝেও বুঝতে পারি না । পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তাদের স্বজ্ঞা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সংবেদ ইত্যাদি দিয়ে এক ধরনের 'বিশ্ব-চিত্র' তৈরি করে নেয় বটে, কিন্তু এই 'বিশ্ব-চিত্রে'র রূপ ও স্বরূপ তার একান্ত নিজস্ব । অল্প-স্বল্প সর্বজনগ্রাহ্য 'ভাষা' আমাদের যোগাযোগের হাতিয়ার

হিসেবে আছে বটে, কিন্তু এই হাতিয়ারকে 'অল্প-স্বল্প' বলছি এ কারণে যে আমাদের অচেতন হল ভাষায় তৈরি এক গোলকধাঁধা আর চেতন-এর ভাষা হল ভীষণভাবে বিনির্মাণের বিষয়। 'আমি কী বললাম', 'তুমি কী বুঝলে' 'আর সে কী চিন্তা করে বসে আছে'– এমন সব বাক্য লিখে বা উচ্চারণ করে ভাষার সীমাবদ্ধতাকে বোঝানো যায়।

আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত 'বিশ্বচিত্র'কে সর্বজনগ্রাহ্য করার চেষ্টা হয়েছে সেই আদিকাল থেকে। আমাদের মাঝে যারা সৃষ্টিশীল স্রষ্টা, ভাবুক কিংবা চিন্তক, তারা উপস্থিত হয়েছেন দার্শনিক হিসেবে। সৃষ্টি করেছেন জীবন, সময়, ভাষা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড- বিষয়ক দর্শন। দর্শন শব্দটির অর্থ হল 'দৃশ' বা 'দেখা'। আমরা আমাদের পরিচিত পরিবেশ, জীবন আর পৃথিবীকে কীভাবে দেখছি, তার একটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে দর্শন। কালের সাথে, দেশ-এর সাথে, এই দর্শনেরও বিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন স্রষ্টা, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক তাদের নিজস্ব পৃথিবীকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থিত হয়েছেন নতুন নতুন দর্শন নিয়ে। দর্শন-এর সাথে সাথে বিজ্ঞানও এগিয়ে এসেছে জীবন ও বিশ্বের সত্যকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করার জন্য।

আমাদের জানা বিজ্ঞান ও দর্শন সৃষ্টি করেছে জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। যে দর্শনের শুরু হয়েছিল 'আমি কে?' 'আমি কেন?' 'আমি কোথায়?' আর 'আমি কী'?– এমন চারটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে, সেই দর্শন-চিন্তাই ক্রমাগত বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি করেছে সত্তাবিজ্ঞান, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভাষাদর্শন, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির মতো মৌল-যৌগিক দর্শন বা তত্ত্বসমূহ। পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বসমূহ ক্রমাগত বিবর্তিত হতে হতে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই বলি আর দর্শনই বলি, এই জ্ঞানসমূহকে প্রকাশ করার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে আমরা পাচ্ছি আমাদের ভাষাকে, যা কোনো অবস্থাতেই সব সত্যকে তুলে ধরতে পারে না।

ভাষা যেহেতু সবসময় সত্যকে তুলে ধরতে পারে না, সেহেতু সৃষ্টি হয়েছে 'সমালোচনার'। একজন সাধারণ 'তুমি' কিংবা 'সে' যা বলল, তার সাথে একজন 'আমি' হয় একমত হবে, নয়ত নয়, আর এই একমত 'হওয়া-না-হওয়া'-কে কেন্দ্র করেই আলোচনা-সমালোচনা করা চলে। কিন্তু সমালোচনা করা যাবে এই ভেবেই যদি যুক্তিহীন, তত্ত্বহীন বাক্-বিস্তার করি, তাকে কি সমালোচনা বলা যাবে? মোটেও না, কারণ যুক্তিহীন 'সমালোচনা' করতে পারে একটি বালক, পাগল কিংবা মূর্খ। আমাদের সমালোচনার হাতিয়ার হিসেবে এত তত্ত্ব, এত দর্শন থাকতে যুক্তিহীন 'ভাষার আকাশ' তৈরি করার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছেটা কী? আমাদের দেশে সমালোচনার নামে যা হচ্ছে তা এক ধরনের মূর্খতা কিংবা আরো সরল করে বললে বলতে হয়, আমরা আমাদের অহংকে প্রাধান্য দিয়ে করছি ঝগড়া।

সমালোচনার সাথে 'অহং'-এর সম্পর্ক অনেক। আমরা যা নই, তাই ভাবি নিজেদের। মুখ যেহেতু আছে, ভাষা যেহেতু আছে, তাই অযথা দর্শনহীন, তত্ত্বহীন উচ্চারণ করতে পারি। ইচ্ছে হলে লিখিতভাবে তা তুলে ধরি পাঠকের কাছে মূর্খতার দলিল হিসেবে। এমন অহেতুক 'সমালোচনা' আমরা করতে পারি একটি মাত্র কারণে আর এই সেই কারণটি হল আমরা নিজেকে চিনি না। আমরা কতটা মূর্খ, কী জানি আর কী জানি না, কী বলতে পারি আর কী বলা উচিত নয়, এমন সব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মতো জ্ঞানও অনেক সময় আমাদের থাকে না। কিন্তু নিজেকে চেনার 'জ্ঞান' আমরা খুব সহজেই লাভ করতে পারি, এ কাজটির জন্য প্রয়োজন আত্ম-সমালোচনা। নিজেই যদি নিজের সমালোচক হই, তবেই আমরা হতে পারি

যুক্তিবাদী। এখানে 'অহং-প্রাধান্যের' সাথে 'যুক্তিবাদ'-এর সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। অহংহীন মানুষ পৃথিবীতে নেই এবং অহং ছাড়া মানুষ, মানুষ হিসেবেই গণ্য হতে পারে না। কিন্তু এটাও সত্য যে, যুক্তিহীন মানবসত্তার সৃষ্টি হয় অহং-এর পতনের কারণে। হাইডেগার-এর দর্শন অনুযায়ী জন্মের পর একটি মানুষ 'মৌলিক সত্তা' বা 'Da-Sein' হিসেবে অবস্থান করলেও, জাগতিক লোভ, লালসা আর মিথ্যা-বিষয়ীগততা (pseudo-subjectivity) একটি মানুষকে 'পতিত সত্তা' বা 'Dasman' হিসেবে উপস্থিত করে। এই অবস্থায় একজন মানুষ হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় যুক্তিহীন এবং সে তার 'অহং'-কে প্রাধান্য দিয়ে ভাবতে শুরু করে, সেই হল একমাত্র সত্তা, যে সবকিছু জানে ও বুঝে। এমন অযৌক্তিক-অহং-প্রাধান্য থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের 'আত্মসমালোচনা' করতে হবে এবং নিজের অক্ষমতা আর দোষগুলোকে সনাক্ত করে তা বলার মতো সাহসও রাখতে হবে। আমি এই মুহূর্তে আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা নিয়ে লিখছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু লেখার যোগ্যতা আছে কি-না তা পরখ করার জন্যে প্রথমেই তাই 'আত্ম-সমালোচনা' উপস্থাপন করা উচিত বলে মনে করছি।

আত্ম-সমালোচনা

আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। বাবা ছিলেন একজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর পক্ষের মানুষ ছিলেন তিনি, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে। আমি তাই তাকে কখনো 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলিনি। আমার বাবাসহ সেই সময়ের অনেকেই 'পাকিস্তান, পাকিস্তান' বলে চিৎকার করেছেন। তালিম হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, কবি আব্দুল কাদের, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, আব্বাসউদ্দিন প্রমুখ অনেকেই সেই সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আমি যদি 'দেশ-কাল' ও 'ঘটনার' বিচার-বিশ্লেষণ করি তবে তাদের 'রগ-কাটা' মৌলবাদীদের দলে ফেলে প্রতিক্রিয়াশীল বলব না। যদি সমালোচনা করে এমন কিছু বলি তবে আমি হব একজন যুক্তিহীন মূর্খ।

আমার বাবাসহ সেই সময়ের অনেকেই পরবর্তী পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান দিয়েছেন, কিন্তু আমার চিন্তা করার এমন কোনো কারণ নেই যে আমি তাদের হিপোক্র্যাট বা 'ভোল-পাল্টানো' সাংবাদিক-সাহিত্যিক বলব। তারা যেহেতু ব্যক্তিগত লাভের আশায় এ-কাজটি করেননি, তাই আমি ধরে নেব যে তাদের বিবর্তন হয়েছিল 'বিশ্বাসের' ওপর ভিত্তি করে। আমার বাবা, আমার মা, আমার আত্মীয়-স্বজনদের অনেকে নিয়মিত নামায পড়েন, ধর্মে বিশ্বাস আছে তাদের। ধর্মে বিশ্বাস রাখার জন্য তারা 'মৌলবাদী', এমন যুক্তিহীন কথা বলার মতো মূর্খ আমি নই। যদি আমরা ধর্ম-ব্যবসায়ী না হই, তবে সৃষ্টি, মানবতা আর ধর্মের সাথে কোনো বিরোধ নেই, এটাই আমার বিশ্বাস (যদিও আমি ধর্ম-কর্ম পালন করি না, তবু বিশ্বাস করি ধর্ম অনেক সময় হয়তো-বা মানুষকে মানবতার শিক্ষা দিতে পারে। অজানা-অচেনা মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্যের মাঝে থেকে একজন মানুষ কোনো এক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, এমন ভাবাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আর আমি
মনে করি পৃথিবীতে সাচ্চা 'নাস্তিক' বলে কেউ নেই। যে অন্তত তার বাবা আর মাকে তার জন্মের কারণ হিসেবে মানে, সে-ও আস্তিক। পূর্ব-পুরুষের পুজো করে এমন অনেক মানুষ আছে আমাদের পরিচিত এই পৃথিবীতে।) ধর্ম করলে প্রতিক্রিয়াশীল, আর ধর্ম না-মানলে মানুষ

প্রগতিশীল হয়, এমন ধারণা করা অবশ্যই যুক্তিহীন। আমি যদি দর্শনের তত্ত্বসমূহ মানি, যদি পাঠ করি ব্যক্তি ও যৌথের মনস্তত্ত্ব, তবে আমাকে গ্রাহ্য করতে হবে একজন ব্যক্তি-মানুষের চেতনা-কাঠামো বা প্যারাডাইমকে, অযথা নিজস্ব অহং-এর মিথ্যাযুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার 'লক্ষণরেখা' খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ছিলাম নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কারণ আমার বাবা ছিলেন একজন নিম্নবিত্তের সাংবাদিক-সাহিত্যিক। আমাদের ছেলেবেলার সাংবাদিকরা কোনো প্রতিষ্ঠানের 'কেনা গোলাম' ছিল না, তারা কোনো অবস্থায় 'কলম-সন্ত্রাস' করে চাঁদাবাজি করতে পারতেন না, তারা নিতে পারতেন না ক্ষমতার অংশ হয়ে আর্থিক সুবিধা। আর এসব কারণে সাংবাদিক-সাহিত্যিকরা সবসময় নিম্নবিত্তের মানুষ হয়েই সমাজে অবস্থান করতেন। যেহেতু আমি নিম্নবিত্তের ছিলাম, মার্কস-এর দর্শন আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি জড়িত ছিলাম বাম রাজনীতির সাথে, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ছাত্র-সমিতির সভাপতি। বাম ছাত্র-রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হোক, সমাজতন্ত্র কায়েম হোক, এমন ইচ্ছে আর স্বপ্ন নিয়ে, বাস্তবে এসেই আমি বদলাতে শুরু করলাম। সময়ের সাথে যে ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বদলাতে পারে, অর্থনীতির সুযোগ ও সম্ভাবনার প্রভাবে, তা বুঝতে আমার খুব দেরি হয়নি। আমার মাঝে যে এক তত্ত্বহীন অর্ধমূর্খ হিপোক্র্যাট বসবাস করছে তার পরিচয় আমি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু অর্থের লোভ আর লালসার জয় হয়েছিল চূড়ান্তভাবে। আমি যেহেতু সরকারি চাকরি কখনো করিনি, কিংবা আমি ব্যবসাও করতাম না, সেহেতু আমার অর্থ-উপার্জন প্রক্রিয়ায় 'ঘুষ খাওয়া', 'কালোবাজারি করা', 'ব্যাংক থেকে টাকা মেরে দেওয়া' ইত্যাদি ছিল না। একজন উপদেষ্টা হিসেবে দেশে-বিদেশে কাজ করার ফলে আমার মাসিক আয় খুবই ভালো ছিল এবং এই আয় আমাকে মোটামুটিভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীতে ভর্তি হতে সাহায্য করল। এখানে বলা আবশ্যক যে আমার দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত অবকাঠামোর অংশ হয়ে পরোক্ষভাবে হলেও আমাকে কিছু কিছু দুর্নীতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, আমি যে একেবারে ফেরেশতা তা বলার কোনো উপায় নেই।

আমার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে যখন আমি চিন্তা করি যে যুদ্ধে যাবার বয়স থাকা সত্ত্বেও আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। আমার বয়স যখন ২৪ বছর তখন, ২৭ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে, কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই একটি মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের তারিখ আগেই নির্ধারিত ছিল, তাই ২৭ মার্চ তারিখে আমাদের কাকরাইলস্থ বাড়ি থেকে পালিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়াটাই শ্রেয় ভেবেছিলাম। অথচ আমার বন্ধুদের অনেকেই পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রাণ দিয়েছে। অবশ্য আমি এ-কথাও ভাবি যে মুক্তিযুদ্ধে গেলেও আমি কলকাতার থিয়েটার রোডে থাকতাম, বড় বড় নেতা-ভাইদের 'চামচা' হয়ে কফি-হাউসে আড্ডা মারা আর বউবাজার ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে আনন্দ-ফূর্তি করাই আমার 'মুক্তিযুদ্ধ' (?) হত। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে আমি হতাম এক মহান মিথ্যা-মুক্তিযোদ্ধা। আমি যে এক মিথ্যা-মুক্তিযোদ্ধা হইনি এটা ভেবে আমার ভালোই লাগে এখন। তবে খারাপ লাগে তখন, যখন ভাবি, আমার যুদ্ধ করার সাহস ছিল না।

আমি কিছুদিন অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গে পড়াশোনা করেছি। এ-সময় আমি একটা 'দর্শন পাঠ-চক্রের' সাথে জড়িত হয়ে যাই। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শন এবং আধুনিক দর্শনের অনেক তত্ত্ব-

ধারণার সাথে পরিচয় ঘটল আমার। রাসেল, মুর প্রমুখ থেকে আরম্ভ করে ফ্রেগে, হ্বিগেনস্টাইন, সার্ত্রে, হাইডেগার, দেরিদা, ফুকো, লাকাঁ, ফ্রয়েড, ইয়ুং, পাভলভ, ডুর্কহেইম এবং অন্যান্য আরো অনেকের নাম ও কাজের সাথে পরিচিত হলাম। কিছু কিছু দর্শনতত্ত্ব পাঠও করলাম বটে। কিন্তু খুব যে বুঝতে পেরেছিলাম তা কিন্তু নয়। দেশে ফেরার পর দেখতে পেলাম আমাদের দেশের দর্শন-চর্চা রাসেল-এ এসে শেষ, আধুনিক দর্শন নিয়ে কেউ আলোচনা-সমালোচনাও করে না। ১৯৮৬ সালের দিকে দেখা গেল 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রিক' আড্ডাতে সার্ত্রে, হাইডেগার, দেরিদা নিয়ে দু'একজন তরুণ কথা বলছে, কিন্তু তাদের জ্ঞান ঐ নাম জানা পর্যন্তই। বিষয়টি আমার খারাপ লাগল, আর তাই আমি আমার 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী টাইপের' জ্ঞান নিয়ে দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা শুরু করলাম। আমি দর্শন বিষয়ে মোটেও পণ্ডিত নই। আমি যা পাঠ করেছি তা সম্পূর্ণ বুঝেছি তা-ও নয়। আমি যা লিখি তা সঠিক লিখি, এমন দাবিও আমি করি না। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে তখন যখন দেখি কেউ আমার ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাও করছে না। (এখানে একটা কথা বলি, জাঁক দেরিদা নিয়ে আমার প্রথম প্রবন্ধে অনেক ভুল তথ্য ছিল, আমি আমার 'অল্প বিদ্যার' জন্য দেরিদার দর্শনকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার ঐ ভুল তথ্যের সমালোচনা করে কেউ কোনো কথা বলেনি। কী আশ্চর্য!)।

আমি ভাবতাম আমার মাঝে কবিত্ব আছে, আর তাই আমি কবিতাও লেখা শুরু করলাম। বেশ কয়েকটা কবিতার বইও ছেপে ফেললাম, গাঁটের পয়সা খরচ করে। সাহিত্য-সমাজের অনেকেই ভাবল, আমার টাকা আছে তাই আমি 'কবি'। কিন্তু আমি ভাবলাম টাকা থাকলেই যদি 'কবি' হওয়া যেত তবে বেক্সিমকো, আকিজ বিড়ি, পারটেক্স, কনকর্ড ইত্যাদি গ্রুপের মালিকরা সবাই বড় বড় কবি হত। যাইহোক, আমি কবিতা লিখলাম এক নতুন ভাষার খোঁজে, আর এ-কারণেই আমার কবিতার 'বারোটা' বাজল। কবিতায় ভর করল বিজ্ঞান-চেতনা, দর্শন। আমার কবিতা ঠিক কবিতা হয়ে উঠল না। তবে আমার লেখায় কিছু কিছু কবিতাও যে আছে সেটাও আমি জানি ও বুঝি।

আমি 'প্রান্ত' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতাম। আমার সম্পাদকীয় নীতি ছিল আধুনিক ও প্রথা-ভাঙা গল্প-কবিতা-দর্শন প্রকাশ করব এবং আমি করেছিও তাই। বাংলাদেশে 'প্রান্ত'-ই প্রথম আধুনিক দর্শন-তত্ত্বসমূহ পাঠকের দরবারে তুলে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত 'উত্তর-আধুনিকতা'র তত্ত্ব 'প্রান্ত' ছেপেছিল, আর এ-কারণে 'একবিংশ' নামক একটি লিটল-ম্যাগ সম্পাদক আমাকেও 'উত্তর-আধুনিক' বলে ভাবতে শুরু করেন। 'প্রান্ত' বাংলাদেশের প্রথম লিটল-ম্যাগাজিন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের 'লিটল-ম্যাগাজিন পুরস্কার' পায় (এ-বিষয়ে আমি আগে কখনো কিছুই বলিনি, পুরস্কারটি নিতে আমি কলকাতা যাইওনি)। 'একবিংশ' বাংলাদেশের পত্রিকা হিসেবে পরে কোনো-এক সময় এই একই পুরস্কার পায়। আমি 'একবিংশ'-এর লেখক ছিলাম, 'একবিংশ' যে আমাদের নতুন নতুন কবি ও প্রাবন্ধিক উপহার দিয়েছে তা আমি স্বীকার করি। আমার সময়ে গাণ্ডীব ধরনের কয়েকটি লিটল-ম্যাগ ছিল, যারা কোনো একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যকর্ম চালিয়ে যেতো। এমনসব পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া উপায় কী; আর এসবকে 'গ্রহণযোগ্য' নয় বলে 'বর্জন' করাই শ্রেয়; এ-নিয়ে সমালোচনা করে অযথা সময় নষ্ট করা অর্থহীন।

এখন আমি কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নই, লেখালেখি করা আর ছবি আঁকা আমার মুখ্য কাজ। আমি দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব নিয়ে লিখি, মাঝে মাঝে দু-একটা

'কবিতাও' লিখে ফেলি। আমি যা লিখি তা সঠিক জ্ঞান নিয়ে লিখি কিনা তা জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ-ব্যাপারে কেউই আলোচনা-সমালোচনাও করেন না (কোলকাতার দু'একজন ছাড়া অন্য কারও সমালোচনা-পত্র আমি এখনো পাইনি)।

আমি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আলোচক-সমালোচকদের চিনিও না, কারও সাথে দেখা করে নিজের ব্যাপারে বলিও না। আর দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকদের আমি মোটামুটি ভয়ই পাই, আমার তো জীবন আছে, আমি তো আর ফসিল নই। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে আমার অনেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি যখন কবিতা লেখা শুরু করি, তখন একটা অলিখিত নিয়ম ছিল, কোনো একটি বহুল-প্রচারিত পত্রিকার সাহিত্য-পাতায় কবিতা ছাপা না হলে 'কবি' হওয়া যেত না। আমার যেহেতু 'কবি' হওয়ার ইচ্ছে খুবই ছিল, তাই একদিন আমি ঐ বিখ্যাত পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকের সাথে দেখা করে একটি কবিতা তার হাতে তুলে দিলাম। সাহিত্য-সম্পাদক ভদ্রলোক আমি কী করি, কোথায় থাকি, আমার গাড়ি আছে কিনা, এমন অনেক প্রশ্ন করে আমাকে বিদায় দিলেন। পরদিন ঐ সম্পাদক ভদ্রলোক আমাকে ফোন করে সপরিবারে ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য আমার গাড়ি চাইলেন। আমি গাড়ি দিলাম, তিনি তার পরিবার নিয়ে আমার গাড়িতে চড়ে ঘুরে এলেন, আমার কবিতাও ছাপা হল। ঐ ঘটনার পর আমি আর কোনো দৈনিকের সাহিত্য-সম্পাদকের সাথে দেখা করিনি (একমাত্র আবু হাসান শাহরিয়ার ছাড়া, তার সম্পাদকীয় নীতিকে আমি শ্রদ্ধা করি)।
নিজেকে নিয়ে সমালোচনা করার মতো আর কোনো ঘটনা নেই (আর যা আছে তা সাহিত্যের সাথে, দর্শনের সাথে জড়িত নয় এবং যা আছে তা বলাও উচিত নয় মনে হয়)।

সমাজ নিয়ে আলোচনা

আমাদের দেশে সমালোচক এবং সমালোচনার অভাব নেই। যে-কোনো বিষয়ে সমালোচনা করতে বললেই হল। হাজার-লক্ষ সমালোচকের লাইন পড়ে যাবে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশৃঙ্খল পুলিশ বাহিনী ডাকতে হবে, আর পুলিশরাও এই ফাঁকে দু-পয়সা কামিয়ে নেবে। 'লিপটন তাজা' চায়ের কাপেই বলুন কিংবা রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, পত্রিকা অফিসে, বেশ্যা-বাড়িতে যেখানেই বলুন না কেন, সমালোচক পাবেন, সমালোচনাও হবে। এ কারণ হল, আমাদের দেশে সমালোচনা করার জন্য কোনো যুক্তি লাগে না, বিষয় লাগে না, তত্ত্ব লাগে না, বিবেক লাগে না, শুধুমাত্র 'অহং' থাকলেই হল। আর সবচেয়ে বড় কথা হল সমালোচনায় কোনো কাজও হয় না।

আমাদের দেশের সবচেয়ে নামিদামি লোকদের বলা হয় রাজনীতিবিদ, কখনো কখনো 'ভোট পরীক্ষায়' পাশ করার পর আমরা তাদের বলি সাংসদ। কিন্তু পবিত্র জাতীয় সংসদে বসে মাঝেমধ্যে এই সাংসদরা এমন 'অপবিত্র' ভাষায় আলোচনা-সমালোচনা করেন যে, ঐ-সব কথা শোনার চেয়ে গোপনে বাসায় বসে ট্রিপল-এক্স ডিভিডি দেখা ভালো। নিজস্ব অর্থনীতির উন্নতির জন্য এইসব রাজনীতিবিদ বা সাংসদরা এমন কোনো কাজ নেই যা করতে পারেন না। এবং এ-কারণে তাদের সমালোচনা করা হয় প্রচুর, কিন্তু তাতে আসে যায় কী? যুক্তি আর তত্ত্বহীন বিশ্বে থেকে সমালোচনা করা আর না করার মাঝে কোনো বেশকম আছে বলে মনে হয় না।

দেশ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য আমাদের দেশে অনেক পত্রিকা আছে (প্রতিদিন দু-একটা নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে)। সমাজ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য আরও আছে তিনটে টিভি চ্যানেল (আরও তিনটি আসছে এবং শোনা যায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আরো পাঁচটা আসবে)। এইসব পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলের প্রেক্ষাপটে আছে 'ক্ষমতা কাঠামো' বা power structure। অনেক 'টাকার কুমির' অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনের পর তাদের অর্থ সংরক্ষণ আর ক্ষমতার ভাগ নেয়ার জন্যেই এই পত্রিকাগুলো প্রকাশ করেছেন, মালিক হয়েছেন টিভি চ্যানেলের। এই পত্রিকায় বা চ্যানেলে কর্মরত সাংবাদিক-সম্পাদক যারা আছেন, তাদের বলা যায় 'ক্ষমতার গোলাম'। আত্ম-বিক্রয় করে তারা সাহায্য করছে ঐ-সব 'টাকার কুমির'কে, যারা সমাজকে শোষণ করে, অন্যায় করে, গড়ে তুলছেন টাকার পাহাড় (অবশ্য সাংবাদিক/সম্পাদকের খুব একটা দোষ দেয়া যাবে না, জীবন-ধারণের জন্য তাদের এ-কাজ করতেই হয়)। ক্ষমতার ইঙ্গিতেই তারা দেশের 'ভালো-মন্দ' নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন, মাধেমধ্যে অনেক পত্রিকা ও চ্যানেলের সাংবাদিক/সম্পাদক 'কলম-সন্ত্রাসে' জড়িয়ে পড়েন তার নিজস্ব অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি পত্রিকার সম্পাদক বা চ্যানেলের কর্ণধার 'মুখোশ' পরে থাকেন। ঐ 'মুখোশ' আমাদের বলে যে তিনি একসময় প্রগতিশীল বাম-রাজনীতি করতেন, মহান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, কিংবা তিনি একজন বিখ্যাত কবি বা সাহিত্যিক। মুখোশের আড়ালে কী আছে, সে-বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার মতো লোকও নেই, আর থাকলেও সব কথা কি সবসময় বলতে আছে?

আমি দৈনিক সংবাদপত্রে লিখি না, তার কারণ কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা নয় (প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা একটি পশ্চিমবঙ্গীয় ধারণা এবং এই ধারণার প্রেক্ষাপটে যে খুব ভালো এবং স্বচ্ছ যুক্তি আছে, তা নয়)। আমার দৈনিকে না-লেখার কারণ হল, দৈনিকগুলোকে আমি 'Power structure'-এর অংশ হিসেবে সমাজশোষণের হাতিয়ার ভাবি, আর ২৪ ঘণ্টার জীবন নিয়ে প্রকাশিত একটি দৈনিকে শুধুমাত্র 'পাঠকের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য' ছাপা হতে পারে। কোনো সৃষ্টিশীল লেখা প্রকাশের জন্য দৈনিক পত্রিকা নয় (অবশ্য যারা খুব বিখ্যাত হতে চান, তাদের জন্য দৈনিক পত্রিকা ভালো)।

বাংলাদেশ আবারো পঞ্চম বারের মতো বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে প্রথম হয়েছে। এই দুর্নীতির জন্য গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার, মুদি দোকানদার, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, টিএনও, পুলিশ, ট্যাক্স কর্মকর্তা, সচিব, উজির, নাজিরসহ সরকার ও বিরোধীদলের সব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী দায়ী। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন হলেও, শুধুমাত্র গুটিকয়েক 'দুর্নীতি দমন অফিসার' দিয়ে দেশের সমস্ত দুর্নীতি দমন করা যাবে না। কিন্তু যদি আমাদের পত্রিকা আর চ্যানেলগুলো দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাহায্য করত, যদি প্রতিটি দুর্নীতির খবর কোনোরকম দুর্নীতি না করে পত্রিকায় ছাপা হত, চ্যানেলে দেখানো হত, তবে দেশে দুর্নীতি কমে যেত সন্দেহ নেই। আমাদের পত্রিকা ও চ্যানেলগুলো দেশের মানুষকেও সচেতন করতে পারত দুর্নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু 'সর্ষের মধ্যে ভূত' থাকার কারণে এক কাজটি করা আদৌ সম্ভব না।

সমাজের আলোচনা করতে হলে সমাজতত্ত্ব জানতে হবে, জানতে হবে মানুষের 'যৌথ-অচেতনের' মনস্তত্ত্ব-কে। কিন্তু দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব আর সমাজতত্ত্ব লেখার চেয়ে পত্রিকায় সস্তা 'কলাম' লেখা অনেক ভালো, খুবই তাড়াতাড়ি 'মহা বুদ্ধিজীবী' হওয়া যায়। আর তাই খুব সহজেই কেউ আর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। আর একটি সমাজ যখন তত্ত্বহীন হয়ে পড়ে, তখন দুর্নীতির পাহাড় পর্বত হয়ে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

শিল্প ও সাহিত্যের সমালোচনা

মাঝেমধ্যে শিল্প ও সাহিত্যের ভালো-মন্দ আলোচনা-সমালোচনা পড়ি বড় কাগজে, ছোট কাগজে। কিন্তু এটাও বুঝি আমাদের শিল্প-সাহিত্যকে ঘিরে সমালোচনা-সাহিত্য এখনো গড়ে ওঠেনি। কখনো খুবই ভালো সমালোচনা দেখতে পাই লিটল-ম্যাগগুলোতে। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনার নামে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক আর মাসিকগুলোতে যা ছাপা হয় তাকে কী যে বলি বুঝতে পারি না। ঐ-সব পত্রিকার সমালোচকরা কবিতা নিয়ে লেখেন– 'কবিতার কাব্যভাষা চমৎকার... কবি জীবনকে তার নিখুঁত শব্দ দিয়ে তুলে এনেছেন... কবিতার ছন্দগুণ অপূর্ব.. বইটির প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ভালো... দাম একশত টাকা'। গল্প-উপন্যাস নিয়ে সমালোচনা ছাপা হয়– 'ঘটনার বিন্যাস আমাদের নিয়ে যায় এক জাদু-বাস্তবতার বিশ্বে.. লেখক তার চরিত্র-চিত্রণে অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়েছেন... বইটির ভাষা আরও প্রাঞ্জল হতে পারত... প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ভালো... দাম দুইশত টাকা'। চিত্রকলা প্রদর্শনী ঘুরে এসে শিল্প-সমালোচক লেখেন– 'শিল্পী রঙ ও রেখায় সুন্দরভাবে জীবন ও পরিবেশকে তুলে ধরেছেন... তার শিল্পকর্মে পিকাসোর আবছা ছায়া দেখা যায়... ইত্যাদি ইত্যাদি'। কোনো শিল্প বা সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে যদি 'অহং-প্রাধান্য' দিয়ে যুক্তিহীন কিছু লেখা হয় তবে তাকে কোনো অবস্থাতেই সাহিত্য বা শিল্পের সমালোচনা বলা যাবে না। শিল্প বা সাহিত্য নিয়ে কিছু লিখতে গেলে আমাদের অবশ্যই শিল্পতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব আর নন্দনতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক এবং প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। সাহিত্যের আলোচনা করার জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন New criticism, Archetypal/ Myth Criticism, Psychoanalytic Criticism, Marxism, Post Colonialism, Existentialism, Russian Formalism, Structuralism, Post-structuralism, Deconstruction, Postmodernism, Reader Response Theory, Feminism এবং Genre Criticism সম্পর্কে মৌলিক ও প্রাথমিক তথ্য। আলোচনা-সমালোচনার জন্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পণ্ডিত হতে হবে তা কিন্তু নয়। সমালোচনাও যেন সাহিত্য হয়ে ওঠে, এ-কথা মনে রেখেই আমাদের সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রাথমিক জ্ঞান নেয়া প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে শিল্প-সমালোচনার জন্যে আমাদের জানতে হবে Realism, Impressionism, Expressionism, Futurism, Dadaism, Surrealism এবং Cubism কাকে বলে এবং শিল্প-আন্দোলনের সাথে এই তত্ত্বগুলোর সম্পর্ক কী।

'সাহিত্য-সমালোচনা' আর 'গ্রন্থ পরিচিতি'র মাঝে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনায় থাকবে তাত্ত্বিক এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ, কিন্তু 'গ্রন্থ পরিচয়ে' কোনোরকম বাক্‌বিস্তার করার প্রয়োজন নেই। একজন সমালোচক কিংবা পাঠক একটি বইয়ের পরিচিতি লিখতে পারেন, বইটির Content-কে প্রাধান্য দিয়ে। একটি সাহিত্যকর্মের ভালো-মন্দ নিয়েও গ্রন্থ-

পরিচিতিতে লেখা যায়, লেখা যায় সাহিত্যকর্মের বিষয় ও ভাষা নিয়ে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এমন পরিচিতিমূলক লেখায় 'অহং-প্রাধান্য' রাখা যাবে না।

পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়াও এক ধরনের সাহিত্য-সমালোচনা। একজন পাঠক সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সব কিছু জানবেন, এমন ভাবা ঠিক নয়। তবে যে-পাঠক একটি 'পাঠ-প্রতিক্রিয়া' লিখছেন, তিনি যে বোদ্ধা-পাঠক এ ব্যাপারে সন্দেহ রাখার অবকাশ নেই। পাঠকের ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব এবং জ্ঞানকে কেন্দ্র করেই একটি 'পাঠ-প্রতিক্রিয়া'র সৃষ্টি হয়। পাঠকের বক্তব্য যৌক্তিক কি না, ছাপার যোগ্য কি না, তা দেখবেন একটি পত্রিকার সম্পাদক।

সৃষ্টিশীল লেখক কবি ও শিল্পীদের মাঝে এক ধরনের 'বন্ধুত্ব' থাকে তাদের সৃষ্টির-দর্শনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অনেকসময় 'বন্ধুত্বের' বদলে কাজ করে প্রচণ্ড 'ঈর্ষা'। এই 'ঈর্ষা' থাকা কিন্তু অন্যায় কিছু নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে স্রষ্টা-শিল্পীদের মনস্তত্ত্বে এমন ঈর্ষাবোধের চিহ্ন আমরা খুঁজে পাব। অনেকসময় এই ঈর্ষাই অনেক মহৎ শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের দেশে এমন 'ঈর্ষা' কিন্তু অনেকসময় 'ঝগড়া-তে রূপান্তরিত হয়, আর এই ঝগড়া মাঝে-মধ্যে হয়ে যেতে পারে খুবই 'মজার' কিংবা খুবই 'অশ্লীল'। বাংলাদেশে অনেক কবি/সাহিত্যিক আলোচনা-সমালোচনার নামে অনেক স্যাটায়ার রচনা করেছেন, অনেক সময় সৃষ্টি হয়েছে অশ্লীল ঝগড়ার। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

কবি আল মাহমুদের 'বিশ্বাস'-এর পরিবর্তন হয়েছে তার সৃষ্টিশীল সময়ে। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন। জীবন ধারণের জন্য মৌলবাদী পত্রিকায় চাকরি করেছেন, তিনি প্রগতিশীল নন, তিনি প্রতিক্রিয়াশীল, এমন সব কথা বলে তার 'কবিতা' কিংবা 'সৃষ্টিকে' বাতিল করা যাবে না। আর সত্যি বলতে গেলে, 'প্রগতি' আর 'প্রতিক্রিয়া'-কে কোন সূক্ষ্ম নিয়মে আমরা চিহ্নিত করব, তা-ও আমাদের জানা নেই। এজরা পাউন্ড, হাইডেগার, রাসেল প্রমুখ অনেক সময় তাদের অহং-মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক অযৌক্তিক (?) কাজ হয়তো-বা করেছেন, কিন্তু তাদের সৃষ্টিকে তো আমরা বাতিল করতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দেশে আল মাহমুদ আর শামসুর রাহমানকে কেন্দ্র করে 'প্রগতি' আর 'প্রতিক্রিয়া'-র (?) দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, আর আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। (আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের 'বিশ্বাস'-কে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আল মাহমুদ তার 'ব্যক্তিগত বিশ্বাস'কে যেভাবে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। 'বিশ্বাস' যে আল মাহমুদকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে তা-ও মনে হয় না। তিনি তার কবিতায় হয়তো-বা 'জায়নামাজ', 'সিজদা', 'তসবী' ইত্যাদির মতো শব্দ এনেছেন, কিন্তু তার 'নীল মসজিদের ইমাম' ঠিক আগের মতোই বলেছে– 'এইতো ছতর ঢাকার সময়/কোথায় হারিয়ে এসেছো তোমার বুকের/সেফটিপিন?') যাইহোক আল মাহমুদকে নিয়ে যখন আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তখন আল মাহমুদ লিখলেন তার সমালোচনা, একটি বাজে কবিতায় বা ছড়ায় (কবি/সাহিত্যিকরা তো তাত্ত্বিক না, তাই সাহিত্য/কবিতা/শিল্পই হয়ে যায় তাদের সমালোচনা, এটাই নিয়ম)। আল মাহমুদ লিখলেন:

সবাই বলে ভাঙো ভাঙো কেউ কি কিছু ভাঙে?
ষাটের দশক বগল বাজায় বউ কেড়ে নেয় লাঙে।
.....
.....
এই দেশের এক নাগর কবি রাজরাজরা চেখে

যখন দেখে নড়ছে গদি বিপ্লবী গান লেখে ।
ছোকড়া কিছু পদ্যকারের মধ্যমণি তিনি
চতুর্দিকে ফেউ জুটেছে চায়ের কাপে চিনি ।
–সুড়সুড়ির ছড়া

আল মাহমুদের কাব্যভাষা ছিল নতুন, যদিও তা ছিল প্রথম দিকে জীবনানন্দ দ্বারা প্রভাবিত । আল মাহমুদের কাব্যভাষা অনেক কবিকে প্রভাবিতও করেছিল । কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, প্রথম দিকের ফরিদ কবির, খলিল মজিদ প্রমুখ কবিরা আল মাহমুদের কাব্যভাষা নিয়ে অনেকটাই মোহমুগ্ধ ছিলেন । আল মাহমুদও লিখলেন–

দেখায় কবির মতো, অথচ সে শব্দচোর, খ্যাতিতে প্রবীণ;
সে আছে আমাকে ঘিরে আমারি ঝুলির দিকে চোখ ।
যা আছে আমার কাছে, সবুজ পুঁতির মালা, আর
সুরভী ঘাসের বীজ । কিশোরীর ভাঙা চুড়ি, নীল নাকফুল;
কালো পাহাড়ের মৃন্ময় বাসনকোশন, পুতুলের বৌ–
সে চায় চোরের মত কেড়ে নিতে ।
–শোন শব্দচোর ভাবের তস্কর

কবিতাটি কাকে নিয়ে লিখেছিলেন তা আমি জানি না, তবে আল মাহমুদের এই 'কবিতার সমালোচনা' আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি । তিনি যেহেতু গদ্য লিখতে পারতেন, সরল গদ্যের ভাষায় তিনি একটি সমালোচনা লিখতেও পারতেন, তার 'শব্দচোর', 'ভাবের তস্কর' এই শব্দগুলো সমালোচনার ভাষাও নয় ।

বেশ কয়েকবছর আগে 'মানবজমিন' পত্রিকায় প্রকাশিত আহমদ ছফা আর হুমায়ুন আজাদের আলোচনা-সমালোচনা তর্ক-বিতর্কের স্তর পেরিয়ে ঝগড়ার পর্যায়ে চলে গেল । হুমায়ুন আজাদ এক পর্যায়ে ছফাকে 'উন্মাদ' বললেন আর ছফা লিখলেন– 'শুয়োরের বাচ্চার দাঁত উঠলে সে বাবার পাছায় কামড় দিয়ে দাঁতের ধার পরীক্ষা করে' । ছফা কাকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলেছিলেন আর কে ছিল 'বাবা' তা খোলাখুলিভাবে অবশ্যই বলেননি । কিন্তু আজাদ-ছফা বিতর্ক আমাদের কাছে সাহিত্যের বিষয় বলে মনে হয়নি । আজাদ-ছফা বিতর্কের তৃতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি 'আহা! পণ্ডিত বলে কথা' শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক কবিতা লিখেছিলাম এবং তা 'মানবজমিনে' প্রকাশিত হয়েছিল । কবিতাটি ছিল:

আহা! পণ্ডিত দেখ, পণ্ডিত বলে কথা
বলে,– ইহা উন্মাদ, উহা শুয়োরের ছানা
শব্দের ফলে শব্দও হয় অর্থ দাঁড়ায় যথা
ডক্টর বলে, পণ্ডিত হলে খিস্তিতে নেই মানা ।
একজন তিনি, একক আদম, ভাষার আদিম যম
নিজের ভেতর নিজেকেই কেটে কৃমি,
অন্যজনের দোষ দেবো কী, তিনিই বা কিসে কম

খিটমিট করে লাফ দিয়ে পড়ে নিজের ঘাড়েই তিনি।
কিন্তু এখন কী হবে ভাষার কবিতার হবে কী?
খিস্তি-খেউরে ফ্রয়েড বেরুবে শব্দের প্রতি ফাঁকে
অবদমনের যৌনরাজ্যে পান্তাতে ঢেলে ঘি
ন্যাংটা হয়েই দেখাবে তাহারা সাহিত্য বলে কাকে।

আহারে মূর্খ কাঙ্গাল বাঙাল পণ্ডিত চিনে রাখ
তারা পণ্ডিত যাদের চোয়ালে কব্জায় থাকে ফাঁক।

আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় অনেক সময় সমালোচককে দেখা যায় অন্ধ-দানবের মতো। সাহিত্য পত্রিকা 'একবিংশের' ২২তম সংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদক খোন্দকার আশরাফ হোসেন সমালোচনা করে লিখলেন– 'যে কোনো পাঠকেরই অনধিগম্য থাকবে না বিষয়টি যে উপর্যুক্ত কবিগণ য়ুরোপীয় পোস্ট মডার্নিজমের ভঙ্গিটি (পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু কবির দূতিয়ালীতে) হেফজ করেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন তাদের কবিতায়। মঈন চৌধুরী সম্পাদিত 'প্রান্ত' পত্রিকাটি একসময় এদের বাহন হয়ে উঠেছিল। ঐসব কবিদের মতোই পত্রিকাটিও আজ রূদ্ধস্রোত, কেননা বদ্ধ খালে নৌকা চালিয়ে যাওয়া যায় কতদূর? ক্রমাগত শূন্যের সাথে শূন্য যোগ দিয়ে চলা এক সময় ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি এমনকি আত্মহননের দিকে চালিত করে'।

খোন্দকার আশরাফের আলোচনা-সমালোচনা পড়ে আমার 'অন্ধ দানবের' কথা মনে হয়েছে। 'প্রান্ত' নামের ঐ পত্রিকায় এক সময় নিয়মিত লিখতেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মাসুদ খান, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, সরকার মাসুদ, কামরুল হাসান, টোকন ঠাকুর, কামরুজ্জামান কামু, মুজিব মেহদী, মুজিব ইরম, তাপস গায়েন, ব্রাত্য রাইসু প্রমুখ এবং আমার মনে হয় উল্লিখিত কবিরা এখনও লিখছেন, 'রুদ্ধস্রোতের' প্রান্ত পেরিয়ে হয়তো-বা তারা এখন 'একবিংশের' মহাসমুদ্রে সৃষ্টিশীল। খোন্দকার লিখেছেন 'পশ্চিমবঙ্গীয় কিছু কবির দূতিয়ালিতে' প্রান্তের কবিরা লিখতেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তা-তো দোষের কিছুই নয়। কারণ রোলা বার্থ তো বলেছেন যে আমরা যা লিখি তা আসলে Always already written, আর এক কবির কবিতা থেকে অন্য এক কবিতার সৃষ্টি হতে পারে এ কথাও তো বলেছেন ভাষাতত্ত্ববিদ হ্যারল্ড ব্লুম। খোন্দকার আশরাফ নিজেও অনেক সময় আল মাহমুদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন, তাতে হলটা কী?

খোন্দকার আশরাফ তার সমালোচনায় 'প্রান্তের' রুদ্ধস্রোত দেখেছেন, কিন্তু 'প্রান্ত' যে বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক সাহিত্য-দর্শন আর কাব্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু করেছিল তা দেখেননি কেন বুঝলাম না! 'প্রান্ত' কেন 'রুদ্ধস্রোতে' গেল, তা নিয়ে কিছু যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। 'প্রান্ত'-এর সম্পাদকীয় নীতি ছিল আধুনিক দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদিসহ নতুন মাত্রার সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে লেখা পাওয়া যাচ্ছে না (যা হয়তো-বা ছিল 'প্রান্ত'-এর সম্পাদক হিসেবে, আমার অক্ষমতা, আমি লেখা যোগাড় করতে পারতাম না।) এবং

এ-কারণেই একসময় 'প্রান্ত'-কে রুদ্ধস্রোত ভাসিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু যাই হোক, 'প্রান্ত'-এর প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর 'একবিংশ'-এ আমি লিখতাম, আমার শ্রদ্ধা ও সালাম কবি খোন্দকার আশরাফকে।

'প্রান্ত' সম্পর্কে খোন্দকারের মন্তব্য পড়ে 'একবিংশ'-কে ভালোবেসে ঐ-সময় আমি একটা কবিতাও লিখেছিলাম। কবিতাটি ছিল:

প্রান্ত বাহন স্তব্ধ হয়েছে নিশ্চুপ আফতাব।
কবিজন নেই, কবিতাও নেই, নৌকা চলে না আর,
কী যে হলো আজ প্রাণ-গঙ্গার
চিহ্ন রাখার পর!

সব মুছে যায় একুশ শতক, তাই কি মনে হয়?
রুদ্ধ স্রোতের জমাট ফসিলে রেখা বলে কিছু নেই!
আহা চোখ! চোখ গেল কই? অন্ধের সমকাল
দেখে না কিছুই সময় প্রবাহে, চুপচাপ নিশ্চুপ।

তবুও তাহাকে অনেক সালাম, প্রবল স্রোতের রাজা
রাজ্যে তাহার পতাকা উঠুক, ভেসে যাক স্রোতে,
রুদ্ধ স্রোতের জমিনে এখন জল বলে কিছু নেই
তবুও এখানে ফুলের বাগান, ফুল ফোটে মাঝে মাঝে।

ফুলগুলো দিয়ে নির্যাস করে তাহাকেই দিয়ে দেবো
কবি ও সময় এক হয়ে যাক, এই শুধু আজ চাই,
উঠুক পতাকা তাহার তাহার, সালাম তাহাকে দেই
নতুন সময়ে কণ্ঠ শোনাক কবিতার আশরাফ।

সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে, আর বিশেষ করে সাহিত্যের বেলায় এই অধিকারবোধটা আরও উগ্র হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে 'সমালোচনা সাহিত্য' গড়ে ওঠেনি এবং সমালোচনার নামে যা হচ্ছে তার বেশির ভাগই আসলে অধিতাত্ত্বিক বাক্-বিস্তার। এমন একটা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের 'ছোটকাগজগুলো' বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে [এ-প্রসঙ্গে সূনৃত ৪, জানুয়ারি ২০০৫-এ প্রকাশিত কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর-এর নিসর্গ (১৯ বর্ষ প্রথম সংখ্যা): একটি বিজ্ঞাপনী আয়োজন এবং অন্যান্য শিরোনামের আলোচনা-সমালোচনার প্রসঙ্গ টানতে পারি।

উক্ত আলোচনায় সমালোচক জাহাঙ্গীর কলিম খান ও তপোধীর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ নিয়ে যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে যৌক্তিক, প্রবন্ধ যে অযথা বাক্-বিস্তারের মাধ্যমে 'বারো হাত কাকুড়ের

তেরো হাত বিচি' তৈরি হবার বিষয় নয় তা ভালো করেই বুঝিয়েছেন সমালোচক। কিন্তু সমালোচনাটিতে 'নিসর্গ' নিয়ে, নিসর্গের গেটাপ-মেকাপ নিয়ে অযথা কিছু কথা বলা হয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই সাহিত্য-আলোচনার বিষয় নয়। সমালোচকের 'নিসর্গ' বিষয়ক মন্তব্যগুলো কোনো অবস্থাতেই যৌক্তিক ছিল না এবং নিসর্গে প্রকাশিত অন্যান্য সাহিত্যকর্মগুলোর বিচারও ছিল না স্বয়ংসম্পূর্ণ]। সবশেষে, সব বিবেচনা করে আমি বলব, আমাদের দেশে সমালোচনা-সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারে শুধুমাত্র ছোটকাগজের লেখকবৃন্দ। তারা এ-কাজটি করবেন, এমন আশা করা যায়।

অনুচিন্তন

সমালোচনা কী, সমালোচনার জন্য একজন সমালোচককে কী করতে হয়, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্যই রচিত হল 'আত্ম ও সমগ্রের সমালোচনা'। প্রবন্ধটির রচয়িতা হিসেবে আমি এমন দাবি করব না যে আমি যা লিখেছি তার সবই সত্য। এমনও হতে পারে আমার নিজস্ব 'অহং-চিন্তা' এই প্রবন্ধে প্রচণ্ডভাবে উপস্থিত। আমার এই প্রবন্ধের সমালোচনা করার অধিকার একজন বোদ্ধা সমালোচকের থাকবে, আমার সমালোচনা করে যুক্তি দিয়ে যদি কিছু লেখা হয় তবে সেই লেখাই আমাকে সঠিক পথ দেখাবে বলে চিন্তা করতে পারি।

সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব প্রসঙ্গ: সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রয়োগ

পূর্বকথা বা ভাষাতত্ত্বের পটভূমি

হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স নামের মানুষ-প্রজন্ম মানুষ হয়ে উঠেছে শুধু ভাষার কারণে, এ সত্যকে আমরা এখন আর অস্বীকার করতে পারি না। ভাষা মানুষের চিন্তা-চেতনায় এনে দিয়েছে যুক্তির গণিত, আর এ যুক্তির গণিত মানুষকে বুঝিয়েছে তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি-সম্পর্কীয় উপলব্ধি-ক্ষমতা, সুযোগ দিয়েছে উপলব্ধিসমূহকে প্রকাশ করার, চিনিয়েছে বিশ্বকে। মানুষ যা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারেনি, তা প্রকাশ করার জন্যও ব্যবহার করেছে ভাষার, সৃষ্টি করেছে যাদুবিদ্যাজাত এক ফ্যান্টাসির ভুবন, উপস্থিত হয়েছে অধিবিদ্যা বা Metaphysics।

ভাষা যে এক ধরনের গণিত তা আমরা প্রমাণ করতে পারি। আমরা যদি বলি '২+২+= কত?' তবে উত্তর আসবে ৪। যদি বলি 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন = কে?', তবে বলব– তিনি ছিলেন একজন কবি। 'বাংলাদেশের রাজধানী = কোথায়?', উত্তর আসবে– ঢাকা। হিবটসেনস্টাইন-কথিত মৌলিক বাক্য বা Atomic sentence-এর গণিত-যুক্তি সহজ, আর তাই মানুষ

প্রতিদিন এসব সহজ বাক্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ডক্টর অধ্যাপকও কথা বলতে পারে কোনো এক গ্রামের মূর্খ এক চাষির সাথে। কিন্তু এই ভাষার গতিও মাঝে মধ্যে 'কঠিন' হতে পারে। যদি বলি– 'বাংলাদেশের লোকজনের গড়ে ৩.৬ জন সন্তান আছে', তবে হ্বিটসেনস্টাইন-এর ভাষা-সাহিত্য অনুযায়ী এটি হবে 'জটিল বাক্য' বা 'Complex sentence'। একজন মানুষের সন্তান ১,২,৩ বা ৯, ১০ হতে পারে, কিন্তু ভগ্নাংশ হয়ে কীভাবে ৩.৬ হয়, তা বোঝার জন্য জানতে হবে 'গড়' কাকে বলে। এখানেই চলে আসে নোয়াম চমস্কি-কথিত ভাষাবিষয়ক যোগ্যতা (Competence) ও কৃতি (Performance)-এর ব্যাপার। যারা 'গড়' শব্দের অর্থ জানে না, তারা এই জটিল বাক্যটি থেকে কোনো অর্থই উদ্ধার করতে পারবে না। যদি ভাষার যুক্তিকে আরো একটু জটিল করে বলি– 'চুল তার কবেকার অন্ধকার... মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য', তবে অনেকের কাছে বাক্যটি হিব্রু বা লাতিন ভাষা থেকেও কঠিন লাগতে পারে। যাদের Literary competence আর Performance ভালো, তারা কিন্তু উপরোক্ত পঙ্‌ক্তি থেকে অর্থ খুঁজে পাবে এক নান্দনিক ব্যঞ্জনাসহ।

মানুষের ভাষা বলা, পড়া আর বোঝার Competence ও Performance-এর ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি মানুষের সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী অবস্থান করে বিভিন্ন মাত্রায়। আমরা যে সমাজ ও বিশ্ব দেখি ও বুঝি, তা কিন্তু সব মানুষের জন্য এক নয়। ভাষাভিত্তিক জীবন তার নিজস্ব ভাষার গণিত ও যুক্তি দিয়ে তৈরি করে নেয় তার নিজস্ব পৃথিবীকে, নিজস্ব সমাজ ও সত্তাকে। ফলে 'আমার পৃথিবী', 'তোমার পৃথিবী' আর 'তার পৃথিবী' কখনো এক নয় এবং এর ফলেই আমাদের মাঝে অবস্থান করে, সত্য ও মিথ্যাকে নিয়ে বিভিন্ন রকম ভুল বোঝাবুঝি। আমরা ভাষার 'মৌলিক বাক্য' দিয়ে 'আমাদের সমাজ ও পৃথিবী' তৈরি করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ভাষার জটিল গণিত ব্যক্তি-মানুষের সুখ, কামনা, বাসনা, যৌনতা ইত্যাদিকে গ্রাহ্য করে প্রতিটি মানুষের বিশ্ব ও সমাজকে বিভিন্ন মাত্রায় রেখে দেয়। ভাষা-দার্শনিক হ্বিগেনস্টাইনকে তাই বলতে হয়– 'I am my world... The world is my world... The world is independent of my will.. life is world.' দার্শনিক কার্ল পপার ভাষা-নির্ভর মানুষের জ্ঞানের 'মৌলিক ও একক' বিশ্ব সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ভাষার লিখিত রূপককে চিহ্নিত করেন। তার 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পে তিনি বলেন, ভাষায় লিখিত ও গ্রন্থিত জ্ঞানই আমাদের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। কার্ল পপার-এর 'বিশ্ব-৩' প্রকল্পে প্লাতোর Theory of forms বা Ideas, হেগেলের Theory of objective spirits এবং বোলজানোর Truth in themselves and ideas in themselves-এর সাদৃশ্য আছে এবং আমরা বলতে পারি, শুধু ভাষার লিখিত ও গ্রন্থিত রূপই আমাদের মানুষ-প্রজন্মের সভ্যতা বিকাশের মূল চাবিকাঠি। একটি লিখিত/গ্রন্থিত text বা পাঠ-এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন মাত্রায় বিশ্লেষিত হয় নোয়াম চমস্কি-কথিত Literary performance and competence-এর নির্ভর করে, আর এ কারণেও আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্ব হয়ে ওঠে একক ও অনন্য। প্রতিটি মানুষের বিশ্ব একক ও অনন্য, এই সত্যকে আরো সহজভাবে প্রকাশ করতে গেলে দার্শনিক টমাস কুন-এর 'Paradigm' বা 'চেতনাকাঠামো' নিয়ে কিছু আলোচনা করা যায়। আমরা আমাদের ভাষা আর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকসময় 'সময়'-কে নিয়ে আসি, আমরা বলি বিশের দশক, চল্লিশের দশক, আশির দশক ইত্যাদি। ভাষা আর ভাষা-

কেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রকাশ সবসময় সময়-কেন্দ্রিক, কারণ মানুষের Paradigm বা চেতনাকাঠামো সবসময় বিবর্তনশীল। মানুষের 'ব্যক্তিগত' ও 'সমগ্রের' বিশ্ব প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে এবং কোনো- এক সময় কোনো-এক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বিপ্লবের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের Paradigm বা চেতনাকাঠামোরও বিবর্তন হয় নতুন বিশ্ব গড়ার তাগিদে। বিবর্তিত এই প্যারাডাইম বা চেতনাকাঠামোতে বদলে যায় ভাষার প্রকাশ। একজন স্রষ্টা কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিকও খুঁজতে চেষ্টা করে নতুন ভাষার সৃষ্টিকে।

ভাষার সাথে যখনি Paradigm (চেতনাকাঠামো) আর সময় জড়িয়ে যায়, তখন ভাষার যুক্তিও বদলে যেতে পারে। মীরজাফর, রাজাকার বা এমন ধরনের অনেক শব্দের অর্থ সময়ের সাথে বিবর্তিত হয়ে উপস্থিত হয়েছে আমাদের নতুন প্যারাডাইম-এ। ঊনবিংশ শতাব্দ থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতাব্দের সাহিত্য এবং দাপ্তরিক বাংলা ভাষা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা আমাদের ভাষাতেই 'সময়ের' আর 'চেতনাকাঠামোর' সাক্ষর আবিষ্কার করতে পারবে। এখন যদি কেউ লেখে– 'প্রাচীনা বঙ্গভূমির এই পুরাতন সমাজের ভবিষ্যতে ঈদৃশ শুভ দিন আগমন করিবেক, যখন নিরক্ষর কৃষক বালক অবাধ্য ধেনুবৎসকে তিরস্কারকালে সাধুভাষা প্রয়োগ করিবেক, হট্টমধ্যে পণ্যবীথিকা পার্শ্বে উপবিষ্টা মৎস্যজীবিনী কলহব্যপদেশে অসাধ্বী ভাষার প্রয়োগে কুণ্ঠিতা হইবেক এবং গৌড়ীয় ভাষার কোষগ্রন্থসকল প্রাকৃত শব্দের দুর্ব্বহভারবহনের শ্রম স্বীকারে অব্যাহতি পাইবেক... ইত্যাদি'– তবে এই ভাষা যে বাংলা তা বুঝতেই কষ্ট হবে। মাত্র একশ বছরে আমাদের ভাষা বিবর্তিত হয়ে, শুককীট, মুককীট পর্যায়ে পেরিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে, কিন্তু সময় আর প্যারাডাইম যেহেতু এখনো ক্রিয়াশীল আমাদের ভাষায়, তাই আমরা বলতে পারব না যে আমাদের ভাষা 'প্রজাপতি' হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দে এসে ভাষা নিয়ে আরো অনেক তত্ত্ব উপস্থিত করেন ভাষা-দার্শনিকেরা। ভাষাতত্ত্ববিদ সস্যুর ভাষার জৈবিক সংগঠন ল্যাগ (Langne) আর প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া উচ্চারণ (Parole) বিশ্লেষণ করে ভাষা কীভাবে অর্থ যোগান দেয় তার ব্যাখ্যা দেন। ধ্রুপদী ভাষা-দর্শন অনুসারে ভাষা হল সময় ও সভ্যতার সাথে বেড়ে ওঠা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি শব্দ কোনো-না-কোনো বৈশ্বিক বস্তু, বিষয়, ধারণা বা সংবেদ বোঝাতে উপস্থিত। ব্যাপারটিকে একটি সাধারণ সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়:

ভাষাপ্রতীক বা শব্দ=বস্তু বা বিষয়

সস্যুর উপর্যুক্ত সমীকরণটি অগ্রাহ্য করে বলেন, কোনো শব্দ বা ভাষাপ্রতীক-এর বিপরীতে কোনো বস্তু বা বিষয়-সম্পর্কীয় অর্থ সরাসরি উপস্থিত থাকে না। একটি ভাষাচিহ্ন শুধু একটি 'দ্যোতক' বা 'Signifier' উৎপন্ন করার পর, 'দ্যোতিত' বা 'Signified' হয়ে, আমাদের অর্থ যোগায়। ব্যাপারটির সহজ সরল সমীকরণ হবে নিম্নরূপ:

ভাষাপ্রতীক বা শব্দ=দ্যোতক/ দ্যোতিত

আমরা যদি সমীকরণটি বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব, একটি ভাষাচিহ্ন প্রয়োগে কী ধরনের 'দ্যোতক' সৃষ্টি হল আর সেই দ্যোতক কী 'দ্যোতিত' করল, এটাই হল মুখ্য ঘটনা। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক, একজন 'বাড়ি' শব্দটি বিভিন্ন সময় ব্যবহার করছে। ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্ব অনুসারে 'বাড়ি' শব্দের অর্থ বাসস্থান, গৃহ, নিবাস কিংবা ঘর (সংসদ বাঙ্গালা অভিধান), কিন্তু ভদ্রলোক 'বাড়ি' দিয়ে পাঁচ রকম অর্থ বোঝালেন:

আমি বাড়ি (বাসস্থানে) যাব।
আমি চৌধুরীবাড়ি (চৌধুরীদের আবাসস্থলে) যাব।
আমি রাজবাড়ি (একটা জায়গা) যাব।
আমার মনের বাড়ি (অন্তর, মন) এখন অস্থির।
আমার বাড়ি ফিরে যাওয়ার (মৃত্যুর) সময় হয়েছে।

উপরিউক্ত বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'বাড়ি' শব্দটি পাঁচ রকম 'দ্যোতক' সৃষ্টি করে 'দ্যোতিত' হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কাল মাত্রায়, শব্দের পরম্পরায়। বোঝা যাচ্ছে, অভিধানে লেখা 'সরল অর্থ' শুধু কিছু প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্যই গ্রন্থিত হয়েছে, অভিধান ধরে কেউ যদি আসল অর্থ উদ্ধার করতে চান, কিংবা অনুবাদ করেন, তবে তা 'ভাষাতাত্ত্বিক বিপর্যয়' সৃষ্টিও করতে পারে।

শব্দের মাঝে মন্ত্রের গুণ আছে, শব্দকে আমরা সত্য বলে ভাবি, আমাদের যুক্তিকেও ভেঙে দিতে পারে শব্দের মোহ। আমাদের শব্দকেন্দ্রিক যুক্তির পতন সৃষ্টি করে অধিবিদ্যা। একটি ঃবীঃ বা পাঠকে আমরা আমাদের মতো করে পড়ে, ঃবীঃ-এ যা নেই তাই যোগ করে ফেলি ইচ্ছেমতো। শব্দের মাঝে এই যে 'বিনির্মিত' হওয়ার ক্ষমতা, একেই দার্শনিক জাক দেরিদা বলেছেন Deconstruction, আর এই Deconstruction-এর প্রেক্ষাপটে কাজ করছে শব্দব্রহ্মকেন্দ্রিকতা (Logocentrism), ধ্বনিকেন্দ্রিকতা (Phonocentrism) ও বিচ্ছেদ (Differance)। মানুষের বিবর্তনের সাথে সাথে ভাষারও বিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু এই বিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনায় উপস্থিত হয়েছে ভাষাসৃষ্ট কিছু চিন্তন-কেন্দ্র (Centre) ধ্রুব-উপস্থিতি (Presence)। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্ম, মতামত ও দর্শন গ্রন্থিত হয়ে প্রচারের মাহাত্ম্যে হয়ে উঠেছে দৈবি অনুপ্রেরণার ফসল। বেদ, বাইবেল, কুরআন, গ্রন্থ-সাহেব ও অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ, এমনকি মার্কস-এর 'ডাস ক্যাপিটাল' কিংবা 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ইত্যাদির মতো মননশীল রচনাও আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে ভাষাভিত্তিক শব্দব্রহ্ম বা Logos হিসেবে।

Logos শব্দটির অর্থের মূলে রয়েছে ঐশীবাণী। আদিতে শব্দময় একক ছিল, প্রচণ্ড শব্দে তা ভেঙে সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্বের। ধর্মতত্ত্ব বলে, এই শব্দ-এককের অস্তিত্ব ঐশ্বরিক। বিজ্ঞান এই 'আদিশব্দের' নাম দিয়েছে Big Bang। কিন্তু আমরা অনেকেই এই 'আদি-শব্দ'-কে অধিবিদ্যার উপাদান হিসেবে নিয়েছি, কার্ল ইয়ুং-এর যৌথ-অচেতনের (Collective unconscious) অংশ হয়ে এই অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি স্থান করে নিয়েছে আমাদের মনে 'প্রত্ন-লেখ' (Arche-writing) হিসেবে। ঈশ্বর বললেন 'হও' আর তার শব্দ আদেশেই সৃষ্টি

হয়েছিল মহাবিশ্বের, এমন চিন্তা-ভাবনা করতে আমাদের কোনো যুক্তি লাগে না। ভারতীয় দর্শনে দৈবী বাক্ (ধ্বনি) হল একমাত্র আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্ম ও বাক্ এক ও অভিন্ন সত্তা। উপনিষদে বাক রূপ ব্রহ্মাকে আকাশবৎ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্ম, লাতিন Verbum logus ইংরেজি word শব্দের মূলে রয়েছে এক অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম, যা দেরিদার দর্শনে উপস্থিত হয়েছে শব্দব্রহ্মবাদ কিংবা Logocentrism-এর ধারণা বা Concept নিয়ে। মানুষের উচ্চারিত শব্দের মাঝেও অস্তিত্বের উপস্থিতি থাকে। এখানো আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের রেকর্ড করা কণ্ঠ শুনি, গান শুনি, তবে এই মহামানবের (মহামানব শব্দটি অধিবিদ্যাজাত) অস্তিত্বের কাছাকাছি অবস্থান করছি বলে মনে করি। উচ্চারিত শব্দও অনেক সময় তাই আমাদের মনে ভাষার বিনির্মিত রূপ উপস্থিত পারে, একজনের উচ্চারণ অন্য একজনের কাছে উপস্থিত হতে পারে অধিবিদ্যা বা Metaphysics-এর উপাদান হয়ে। দার্শনিক জাক দেরিদা উচ্চারিত ভাষার এই ধর্মটির নাম দিয়েছেন ধ্বনিকেন্দ্রিকতা Phonocentrism।

ভাষাতে বিনির্মাণ বা deconstruction কাজ করে কেন? এ প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে জাক দেরিদা-সৃষ্ট Differance বা বিচ্ছেদ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। Differance বা বিচ্ছেদ শব্দটি একটি '2in1' বা বাক্সবন্দি শব্দ, যার মাঝে লুকিয়ে আছে La Difference (বিরতি) এবং La Differance (পার্থক্য) (লেখক শব্দটির অনুবাদ করেছেন 'বিচ্ছেদ' হিসেবে, কারণ বিচ্ছেদ শব্দটির অর্থ হল বিভেদ, পার্থক্য, বিরতি)। লিখিত কিংবা উচ্চারিত কোনো শব্দেরই কোনো ধ্রুব উপস্থিতি কিংবা এক অর্থ নেই। আমরা যাই পড়ি বা শুনি না কেন, শব্দগুলো সবসময় কিছু 'পার্থক্য' এবং 'বিরতি' সৃষ্টি করে রাখে নিজেদের মাঝে এবং এর ফলে ভাষা এক ধরনের 'খেলায়' মত্ত থাকে। জাক দেরিদা ভাষার এই খেলার নাম দিয়েছেন 'Free play'। ব্যাপারটি সহজ করে বোঝানোর জন্য দু-একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের দেশে যে আইন আছে তা খুব সুন্দরভাবে সুলিখিত, কিন্তু তারপরও এই আইন-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এখনো উকিল-ব্যারিস্টার-বিচারকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে। আইন যদি এতই সুলিখিত হয়ে থাকে তবে আইনের 'ফাঁক' থাকছে কোথায়? উত্তর হল একটাই, আইনের ফাঁক থাকছে শব্দে, ভাষার খেলায়, Freeplay of Language-এ। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করার জন্য 'দেখা' শব্দটি বিশ্লেষণ করা যাক। ধরা যাক রহিম করিমকে খুন করেছে এবং তা দেখে ফেলেছি আমি, লেখক। যেহেতু ব্যাপারটা আমার সামনে ঘটেছে তাই আমার সাক্ষ্য দেয়ার ফলে ৩০২ ধারাতে রহিমের মৃত্যুদণ্ড হবে প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু আমার 'দেখা' আসলেও 'দেখা' কিনা, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন উকিল সাহেব। উকিল সাহেব আমাকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন আর আমি কী উত্তর দিয়েছিলাম, তা দেখা যাক:

উকিল:
আপনি নিজে দেখেছেন খুন করতে?
আমি:
হ্যাঁ দেখেছি, আমার সামনেই খুন হয়েছে করিম।
উকিল:
তখন কটা বাজে?

আমি:
রাত ৮টা/৯টা হবে ।
উকিল:
রাতে দেখলেন কীভাবে?

আমি:
ঘটনাটা লাইটপোস্টের নিচে ঘটেছিল, দেখা যাচ্ছিল ।
উকিল:
কতদূরে ছিলেন আপনি?
আমি:
২০/২৫ গজ দূরে ছিলাম ।
উকিল:
আপনার চোখের চশমার পাওয়ার কত?
আমি:
মাইনাস পাঁচ ।
উকিল:
আপনি কি ২৫ গজ দূরে কোর্টরুমের দরজায় যা লেখা আছে তা পড়তে পারছেন?
আমি:
কোর্টরুম কিছুটা অন্ধকার, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না ।
উকিল:
রাত তো আরো অন্ধকার, মাইনাস পাঁচ পাওয়ারের চশমা পরে আসলে আপনি কিছুই দেখেননি । আপনি মিথ্যা বলছেন ।
আমি:
লাইটপোস্টের আলো ছিল তো!
উকিল:
জি না, ওই দিন, ওই সময় গুলশান এলাকায় লোডশেডিং হয়েছিল, এই দেখুন বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট হয় জাল ছিল, নয়তো ঘুষ দিয়ে কেনা)

আমার 'দেখা' আর 'দেখা' রইল না, চশমার পাওয়ার, রাতের অন্ধকার ইত্যাদি যুক্তি-অযুক্তির খেলা খেলে, আমার 'দেখা'কে বিনির্মাণ করে আমাকে প্রায় 'অন্ধ' বানিয়ে দিল । রহিম মুক্তি পেল ভাষার খেলায় ।

উপরে কিছু উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কীভাবে আমাদের অভিধানভুক্ত শব্দগুলোর অর্থ দেশ-কাল ও অন্যান্য শব্দের পরম্পরায় Deconstruct হতে পারে । আমাদের জ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা বিনির্মাণ বা Deconstruction দেখতে পাব । দেখতে পাব কীভাবে অধিবিদ্যা গ্রাস করেছে, জ্ঞান, সাহিত্য ও সাহিত্যের মূল বক্তব্যকে । আমরা প্রায়ই সাহিত্য বা সাহিত্যের মূল text বা পাঠ থেকে সরে গিয়ে তৈরি করছি

আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও প্যারাডাইমগ্রাহ্য নিজস্ব বয়ান এবং এ কাজটি সম্ভব হয়েছে ভাষা-শব্দের মুক্ত-ক্রিয়া বা free play-র জন্য। উপনিষদের 'নির্গুণ ব্রহ্ম', প্লেটোর 'আইডিয়া', দেকার্তের 'কজিটো', স্পিনোজার 'গাণিতিক ঈশ্বর', লাইবেনিত্সের 'মোনাড' কিংবা হেগেলের 'পরম বা অ্যাবসল্যুট' সবসময় আমাদের শুনিয়েছে অধিবিদ্যার বাণী, তৈরি করেছে অস্তিত্ব, মন, ঈশ্বর, চরম পরম ইত্যাদির মতো ধ্বংসহীন আদর্শ, অ্যাবসট্রাক্ট বস্তু কিংবা বিষয়ের গোলকধাঁধা। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ পড়ি, তবে দেখা যাবে সেখানেও অবস্থান করছে উপনিষদ-বাহিত চরম, পরম ও ঐশী অস্তিত্বের ধারণা কিংবা আমাদের আউল-বাউল সহজিয়া মতবাদের অধিবিদ্যাজাত তলানি। জাক দেরিদা আমাদের ভাষাকে অধিবিদ্যার হাত থেকে মুক্তি করতে চান, কিন্তু কীভাবে তা করা সম্ভব তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। ভাষা যে মুক্তক্রীড়া বা freeplay-র ফলে বিনির্মিত হয় এটা সত্য, আর তাই কিছু পাঠ করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে দেরিদার সেই বিখ্যাত মন্তব্য– 'There is nothing outside text'। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে সাহিত্যের বেলায় দেরিদার বিনির্মাণ কাজ করবেই, কারণ সাহিত্যের নান্দনিক প্রকাশে গূঢ়োক্তি (trope), ব্যাজস্তুতি (irony), রূপকালংকার (metaphor), আংশিক উপস্থাপন (synecdoche), লক্ষণালংকার (metomomy), অতিশয়োক্তি (hyperbole), রূপান্তর (metalepsis), ইত্যাদি কাজ করে। বিজ্ঞাপন, দর্শন, আইন ও সমাজবিদ্যা থেকে অধিবিদ্যাজাত বিনির্মাণ আমাদের অবশ্যই বাদ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সাহিত্যের বিনির্মাণ নন্দনতত্ত্বগ্রাহ্য করে বলেই বাদ দেয়া সম্ভব নয়। বরং একটি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে কীভাবে বিনির্মাণ কাজ করছে এবং একটি 'text'-এর মাঝে বিনির্মাণযোগ্য কী কী উপাদান লুকিয়ে আছে তা উদ্ধার করাও একজন সাহিত্য-সমালোচকের কাজ। সাহিত্যের বিনির্মাণ নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি করে, এ সত্য আমরা দেরিদার দর্শন থেকে উদ্ধার করতে পারি
এবং এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য পল দ্য মান, হেডেন হোয়াইট হ্যারলন্ড ব্লুম, জিওফ্রে হাটম্যান, হিলস্ মিলার প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ/সমালোচকের লেখা পড়তে পারি।

ভাষার সাথে মানুষের সত্তা ও সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার। তিনি সময়কেন্দ্রিক মানবসত্তাকে Da-sein (মৌলিক সত্তা) ও Dasman (পতিত সত্তা) হিসেবে চিহ্নিত করে ভাষাকে মানবসত্তার সাথে মিশিয়ে দেন। হাইডেগার বলেন– 'Language is the house of Being. Man dwells in this house'। মানুষের সত্তার সাথে যে ভাষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তা আমরা আরো ভালো করে জানতে পারি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব পড়ে। ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়, ভাষার আদান-প্রদানের মাধ্যমেই, একটি মানুষের অদর্শিত অচেতনের সুপ্ত রহস্য জানা যেত। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দার্শনিক জাক লাকাঁ মানবিক চেতনার অস্তিত্ববাদী সমস্যাগুলো আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং নির্ধারণ করেছেন অস্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ। লাকাঁ বলেন– 'মানুষের চেতন ও অচেতন সংগঠিত হয় কল্পনা, প্রতীক আর সত্যের সমন্বয়ে আর এই কল্পনা, প্রতীক ও সত্যের উপাদান হল ভাষা। মানুষের যা পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পায় না, তা অবদমিত সুপ্ত ভাষার প্রতীক সৃষ্টি করে অচেতন মনে অবস্থান নেয় এবং এ কারণে বলা যায় যে মানুষের অচেতনও ভাষায় তৈরি। অচেতনের এই সুপ্ত ভাষা দ্যোতকের পর দ্যোতকের পর দ্যোতক সৃষ্টি করে আমাদের চেতন সময়ে ফিরে আসতে পারে নতুন নতুন কল্পনা, প্রতীক, রূপক ও সত্য হিসেবে।

একজন স্রষ্টা কবি, গল্পকার, নাট্যকার কিংবা ঔপন্যাসিক যখন তার সৃষ্টিকে তুলে ধরেন, তখন তার সৃষ্টিতেও 'অচেতনের ভাষা' বিশাল ভূমিকা রাখে। লাকাঁর তত্ত্ব গ্রাহ্য করে আমরা যদি একটি সাহিত্যকর্মকে বিশ্লেষণ করি, তবে ওই সাহিত্যকর্মে স্রষ্টার অচেতনের স্বাক্ষর অবশ্যই পাব।

বিশ শতকে বুর্জোয়া/প্রলেতারিয়েত, সাম্রাজ্যবাদ/সাম্যবাদ, পুরুষতন্ত্র/নারীবাদ ইত্যাদি যুগ্ম-বৈপরীত্য নিয়েও ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন ঘটেছে। কার্ল মার্কস-এর dialectical materilism, theory of revolution, law of surplus value ইত্যাদি তত্ত্ব ভাষা-সংগঠনেও প্রভাব ফেলে। উপনিবেশের বিস্তার, উপনিবেশে বিদেশিদের অবস্থানকালে সমাজ ও ভাষার বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে উপনিবেশবাদ। নারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব এসেছে, কখনো তা শুধুমাত্র পুরুষের সমান অধিকার চেয়ে নারীবাদী দর্শন হিসেবে বিস্তার লাভ করেছে, আবার কখনো তা উগ্র-নারীবাদের দর্শন হয়ে চেয়েছে জরায়ুর স্বাধীনতা, অবাধ যৌন-মিলনের অধিকার।

সাহিত্য-দর্শন কিংবা সাহিত্যতত্ত্ব

জন্মের পরই একটি মানুষ তার পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করে, তার পরিচয় ঘটে ভাষার সাথে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি মানুষ তার প্যারাডাইমকে গ্রাহ্য করে ভাষার মাধ্যমেই তৈরি করে নেয় তার 'একান্ত ব্যক্তিগত পৃথিবী'। এই 'ব্যক্তিগত পৃথিবীকে' সর্বজনগ্রাহ্য করার চেষ্টা হয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। আমাদের মাঝে যারা সৃষ্টিশীল, স্রষ্টা, ভাবুক কিংবা চিন্তক, তারা উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন দর্শন-তত্ত্ব নিয়ে, সবাইকে বলতে চেয়েছেন জীবন, সময়, বস্তু, ঘটনা, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, ভাষা ইত্যাদি কী এবং কেন। এদের আমরা দার্শনিক বলি, আর তাদের বক্তব্য, রচনা আর গ্রন্থনাকে আমরা বলি দর্শন। দর্শন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'দৃশ' বা 'দেখা'। আমরা আমাদের জীবন, বিশ্ব, পরিবেশ এবং সৃষ্টিকে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি, তার কিছু সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে দর্শন। বিভিন্ন স্রষ্টা, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং দার্শনিক তাদের নিজস্ব পৃথিবীকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থিত হয়েছেন নতুন নতুন দর্শন নিয়ে। দর্শনের সাথে সাথে বিজ্ঞানও এগিয়ে এসেছে জীবন ও বিশ্বের সত্যকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করার জন্য।

আমাদের জানা বিজ্ঞান ও দর্শন সৃষ্টি করেছে জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যা আমাদের ঢ়ধৎধফরমস বা চেতনাকাঠামোকে নতুনভাবে সাজিয়েছে। যে দর্শনের শুরু হয়েছিল 'আমি কে?', 'আমি কেন?', 'আমি কোথায়?' আর 'আমি কী'?– এমন চারটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে, সেই দর্শন চিন্তাই ক্রমাগতভাবে ডালপালা মেলে উপস্থিত করেছে নতুন সত্যকে, সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, সত্তাবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাদর্শন ইত্যাদির মতো মৌল-যৌগিক দর্শন বা তত্ত্বসমূহ। আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানও বিস্তার লাভ করেছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়– শরীর, মন, জীবন, গতি, সময়, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে।

ভাষা আমাদের জীবন এবং চেতন-অচেতন মনের উপাদান এবং এ কারণেই 'ভাষা কী', 'ভাষা দিয়ে আমরা কীভাবে যোগাযোগ করি?', 'ভাষা কীভাবে অর্থ যোগায়?'– এমন সব প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভাষাদর্শনের। ভাষাদর্শনের সব প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরসমূহ খুবই জটিল এবং তাই আমরা এখনো বলতে পারি না যে ভাষা নিয়ে সবই জানি, বুঝি। জীবনের

উপাদান হয়ে ভাষা এক জটিল ব্যবস্থা হিসেবেই আমাদের জীবনে আছে এবং এই ভাষা দিয়ে আমরা সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করি, ভাষা দিয়েই আমরা সৃষ্টি করি আমাদের নান্দনিক প্রকাশ– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি। ভাষার এই শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করেছেন ভাষা-দার্শনিকবৃন্দ, সৃষ্টি হয়েছে নন্দনতত্ত্ব আর সাহিত্যতত্ত্বের। ভাষাভিত্তিক সৃষ্টি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি কী এবং কীভাবে এই সৃষ্টিসমূহের তাত্ত্বিক বিচার ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তা নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা করে সাহিত্যতত্ত্ব। তবে এই সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে চলে আসে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জীবন-দর্শন এবং দার্শনিক তত্ত্বসমূহ। ভাষাভিত্তিক শিল্প হিসেবে যেহেতু সাহিত্য আছে, সেহেতু সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনাও হবে এবং এই আলোচনা-সমালোচনা করতে গেলেই আমাদের প্রয়োজন সাহিত্যতত্ত্ব। একবিংশ শতাব্দে বাস করে আমরা এখন আর যুক্তিহীন, তত্ত্বহীন বাগ্‌বিস্তার করতে পারি না সাহিত্য নিয়ে এবং আমাদের এখন মনে রাখা উচিত যে সাহিত্য-সমালোচনার হাতিয়ার হিসেবে এত তত্ত্ব, এত দর্শন থাকার পরও যুক্তিহীন-তত্ত্বহীন আলোচনা-সমালোচনা করা মোটেও উচিত নয়।

সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য এখন আমাদের হাতের কাছেই উপস্থিত আছে সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি, আর এই পদ্ধতিগুলো হল:

১. নতুন সমালোচনা (New Criticism)
২. কাঠামোবাদ (Structuralism)
৩. রুশ-আকরণবাদ (Russian Formalism)
৪. মনোবিশ্লেষণী সমালোচনা (Psychoanalytic Criticism)
৫. দাদাবাদ/পরাবাস্তববাদ (Dadaism/Surrealism)
৬. অস্তিত্ববাদ/চেতনচিত্রবাদ (Existentialism/Phenomenolog)
৭. মার্কসবাদ (Marxism)
৮. উত্তর-কাঠামোবাদ/বিনির্মাণ (Post-Structuralism/Deconstruction)
৯. উত্তর-আধুনিকতা (Post Modernism)
১০. উত্তর-উপনিবেশবাদ (Post-colonialism)
১১. পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব (Reader-Response Theory)
১২. প্রত্নগঠন/পুরাণ-কেন্দ্রিক সমালোচনা (Archetypal/Myth Criticism)
১৩. নারীবাদ (Feminism)

উল্লিখিত তত্ত্বসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তবে অল্প কথায় কিছু ধারণা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১. নতুন সমালোচনা (New Criticism)

ধ্রুপদী সমালোচনায় (classical criticism) একজন সমালোচক text পাঠের বাইরে গিয়ে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অনেক বাগ্‌বিস্তার করতে পারতেন। আমাদের ছেলেবেলায় বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দু-চার লাইন কবিতা ছেপে আমাদের ব্যাখ্যা করতে বলা হত। ওইসব

কবিতার ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে আমরা লিখতাম– 'এই কবিতার লাইনগুলো 'অমুক' কবির 'অমুক' কবিতা হইতে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কবিতার এই পঙ্‌ক্তিতে কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে... ইত্যাদি ইত্যাদি।' কিছু যুক্তিসহ মনের মাধুরী মিশিয়ে যে যত বেশি লিখতে পারত সেই পেত সবচেয়ে বেশি নম্বর। ধ্রুপদী সমালোচনার সুবিধা ছিল এই যে, আমরা কবির চিন্তাকে কল্পনা করে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে উপস্থাপন করতে পারতাম খেয়াল-খুশিমতো।

১৯২০ সালের শেষ থেকে 'নতুন সমালোচনা' (new criticism) তত্ত্বের শুরু এবং ১৯৩০-এর দশকে তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা পায়। ধ্রুপদী সমালোচনায় ঃবীঃ বা পাঠের বাইরে গিয়ে বাগ্‌বিস্তার করার সুযোগ থাকত কিন্তু নতুন সমালোচনায় এ সুযোগটা আর রইল না। ভাষাসৃষ্ট সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেন নতুন-সমালোচকবৃন্দ এবং তারা বললেন, কোনো সাহিত্য-কর্মকে বিচার ও বিশ্লেষণ করার সময় মূল text বা পাঠ থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো প্রসঙ্গকে আনা বাঞ্ছনীয় নয়। একটি কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নাটক রচনার সময় একজন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের চিন্তা-চেতনায় কী ছিল, তা আবিষ্কার করার চেষ্টা না করে সাহিত্যকর্মটি text বা পাঠকেই আলোচনা-সমালোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

২. কাঠামোবাদ (Structuralism)

ষাটের দশকের প্রথম দিকে কাঠামোবাদী (Structuralism) সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব হলেও ১৯৮০ সাল নাগাদ ও তত্ত্বটি নতুন সাহিত্যদর্শন হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক রোলাঁ বার্থ বলেন যে– একজন লেখক ইতোমধ্যেই লেখা হয়েছে এমন সব সাহিত্যকর্ম থেকে ধারণা/বর্ণনা/বক্তব্য/উপাদান নিয়েই কোনো এক নতুন বিন্যাসে তার নতুন সাহিত্যকর্মটি রচনা করেন এবং লেখার মাধ্যমে একজন লেখক কোনো অবস্থাতেই নিজেকে প্রকাশ করেন না, বরং সমাজ ও সভ্যতার মাঝে অবস্থানকারী ভাষা ব্যবস্থা (যা রোলাঁ বার্থের ভাষায় always already written) থেকে উপকরণ নিয়ে কিছু বিষয়কে উপস্থাপন করেন মাত্র।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে প্রচ্ছন্নভাবে সস্যুরের ভাষা-অর্থতত্ত্ব (semiotics) কাজ করেছে, কারণ সস্যুরই প্রথম ভাষার অর্থ-উদ্ধার প্রক্রিয়ায় ভাষা-অর্থ কাঠামোকে উপস্থাপন করেছিলেন। কাঠামোবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের কোনো কাজই প্রাকৃতিক কিংবা সহজাত নয়, বরং জীবনের প্রয়োজনেই তা মানব-সৃষ্ট। মানুষ যেহেতু তার প্রয়োজনেই ভাষা-সৃষ্ট কর্ম-কাঠামো সৃষ্টি করেছে এবং ভাষার সাহায্যেই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করেছে তার চেতনা ও চৈতন্যকে, সেহেতু যে-কোনো সাহিত্যকর্মও আসলে মানুষের সৃষ্টি-করা কর্ম ও চিন্তাকাঠামোর প্রতিফলন। একজন ভাষা-শিল্পী তার সৃষ্টিকে সামাজিক ও পার্থিব ভাষা-কাঠামোকে গ্রাহ্য করেই রচনা/গ্রন্থনা করেন যা always already written, এবং একটি সাহিত্য-সৃষ্টি স্রষ্টার সাথে কোনো সম্পর্ক না রেখেই সার্বভৌম।

সাহিত্য যে মানুষের ভাষা-কাঠামোকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় তা আমরা বিশ্বসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করেও বুঝতে পারি। রূপকথার রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাক্ষস, পরী ইত্যাদি চরিত্রকে আমরা খুঁজে পাব পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার শিশু-সাহিত্যে। উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যাবে নায়ক, নায়িকা, ভিলেন, প্রেম, বিরহ, সংঘাত ও শান্তিকে। প্রাচীন যুগে যখন পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে

অন্য প্রান্তের কোনো যোগাযোগই ছিল না, তখনো প্রায় একই রকম কাঠামোর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। আমরা তাই রাম-রাবণের 'রামায়ণ' আর কুরু-পাণ্ডবের 'মহাভারত'-এর সাথে 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি'র কাঠামোগত মিল খুঁজে পাই। রাশিয়ার সাহিত্যতত্ত্ববিদ ভ্লাদিমির প্রপ রূপকথার ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে ৩১টি উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, যা আমাদের দেশের রূপকথার বেলায়ও প্রযোজ্য। বিশ্বের উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলেও এক ধরনের কাঠামোগত মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কাঠামোবাদ দিয়ে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্যকে শনাক্ত করতে পারব। ক্লদ লোভি স্ট্রাউস, গ্রেইমাস, জোভেতান তোদোরভ, জেরার্ড জেনে, জোনাথন কালার প্রমুখের সাহিত্য বিশ্লেষণে সংস্কৃতি/প্রকৃতি, উদ্দেশ্য/বিধেয়, প্রেরক/প্রাপক, থিসিস/এন্টিথিসিস, বর্ণনা/উপস্থাপনা, ভালোবাসা/ঘৃণা, ভারসাম্য/ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্যের উল্লেখ আছে, যা ভাষা-কাঠামো এই কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়।

৩. রুশ আকরণবাদ (Russian Formalism)

রুশ আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিল ১৯২০/১৯৩০-এর দশকে তৎকালীন রাশিয়া এবং চেকোশ্লাভাকিয়াতে। এ আন্দোলনের মূল প্রবক্তারা ছিলেন রোমান ইয়াকবসন, মিখাইল বাখতিন, জান মুকরারোভস্কি, রেনে ভেল্লেক প্রমুখ। রুশ আকরণবাদে বলা হয়, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে সামাজিক ভাষা আছে, তাকে 'সাধারণ ভাষা বা 'ordinary language' হিসেবেই গণ্য করা উচিত। সামাজিক ভাষার কাজ হল একটি মানুষের সাথে অন্য একটি মানুষের যোগাযোগ রক্ষা করা এবং এই ভাষার প্রয়োগ/আচরণ খুবই সহজ ও সরল। সাহিত্যের ভাষা কোনো অবস্থাতেই 'সাধারণ ভাষা' বা 'orgindary language' নয়, কারণ আমাদের সামাজিক ভাষাকে 'অপরিচিতিকরণ' বা 'defamiliarize' করার মাধ্যমে 'সাহিত্য-ভাষা'র সৃষ্টি হয়।

সাহিত্যের ভাষা যে আমাদের সামাজিক ভাষাকে অপরিচিতিকরণ বা defamiliarize করে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং এ কারণে রুশ-আকরণবাদকে সাহিত্য-বিশ্লেষণে আনা যায়। কবি আল মাহমুদ কেন বলেন 'গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল কবুল', কেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার উপন্যাস লালসালুতে লেখেন– 'দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সমান। তাই তারা ছোটে, ছোটে।' তাদের এই কথাগুলো তো সাধারণ সামাজিক ভাষার মতো মনে হয় না, তারা নিশ্চয়ই defamiliarize করেছেন আমাদের দৈনন্দিন প্রকাশকে, আর তাই রুশ আকরণবাদকে সাহিত্য-বিশ্লেষণে আনা যায়।

৪. মনোবিশ্লেষণী সমালোচনা (Psychoanalytic criticism)

মানুষের 'মন' নামক ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক অস্তিত্ব আছে, আর মনের চেতন ও অচেতন ঘরে বন্দি হয়ে আছে মানুষের সত্তা, অস্তিত্ব, স্বজ্ঞা, সংবেদ ইত্যাদি ভাষার এক গোলকধাঁধাসহ। ফ্রয়েড, পাভলভ, ইয়ুং, লাকাঁ প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক/ভাষাবিজ্ঞানী মনের কপাট খুলে আমাদের দেখিয়েছেন, ভাষা দিয়ে সৃষ্ট মানুষের মন তার যে কোনো কার্য এবং কার্যের কারণকে প্রভাবিত

করে। বিশেষ করে 'অহং বা Ego' এবং, 'অতি-অহং বা superego'-কে অস্বীকার করে মানুষের 'অদ বা Id' অনেক সামাজিক আদিম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই আদিম প্রবৃত্তি (কামনা, বাসনা, যৌনতা ইত্যাদি) যখন কোনো আর্থ-সামাজিক কারণে 'অবদমিত' হতে বাধ্য হয়, তখন তা ভাষারূপেই অবস্থান নেয় মনের 'অচেতন' কোটরে। ভাষা-সৃষ্ট এই অবদমিত অচেতন একজন মানুষকে বানাতে পারে মনোরোগী, কিংবা অনেক সামাজিক এই অবদমিত অচেতনের ভাষা বিভিন্ন রূপক ও প্রতীক সৃষ্টির মাধ্যমে একজন মানুষকে করে তোলে স্রষ্টা। একজন সৃষ্টিশীল মানুষকে আমরা বলি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার কিংবা শিল্পী। সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে যে অবদমিত কামনা-বাসনার যন্ত্রণা অবস্থান করে, এ সত্যকেও এখন আর আমরা অস্বীকার করি না।

মনোবিশ্লেষণী সমালোচনা-পদ্ধতি সিগমুন্ড ফ্রয়েড আর জাক লাকাঁর তত্ত্বসমূহের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে এবং এই সমালোচনাতত্ত্ব এখন বহুল ব্যবহৃত। লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ একটি text বা পাঠ-এর অন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক উপাদানও এই সমালোচনা-পদ্ধতি দিয়ে উদ্ধার করা যায়। শুধু তাই নয়, একটি text-এর পাঠ কীভাবে একজন পাঠকের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করতে পারে, তা-ও বিবেচনা করে মনোবিশ্লেষণী সমালোচনা-পদ্ধতি। মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতির আর একটি সুবিধা হল এই সমালোচনায় একজন সমালোচক ইচ্ছে করলে অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্বকে টেনে আনতে পারেন এবং অন্যান্য তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও করা যায়।

৫. দাদাবাদ/পরাবাস্তববাদ (Dadaism/Surrealism)

অর্থহীন-যুক্তিহীন শব্দও মানুষকে নান্দনিক উপলব্ধি দিতে পারে অনেক সময়, এ সত্য আমরা বুঝি যখন 'হাত্তিমা টিম টিক, তারা মাঠে পাড়ে ডিম'-জাতীয় কিছু পড়ি। দাদাবাদের জন্মও হয়েছিল এক ধরনের অর্থহীন, যুক্তিহীন এবং স্বেচ্ছাচারী ভাষা প্রয়োগে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে। ১৯২৪ সালে আদ্রেঁ ব্রেতো 'পরাবাস্তববাদ বা surrealism'-এর ইশতাহার প্রকাশ করেন। পরাবাস্তববাদ কল্পনা, স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং অযৌক্তিক উপাদানকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করে। অনেক সামাজিক যুক্তির সাথে মেশানো হয় অযৌক্তিক পরাবাস্তববাদী উপাদান। আধুনিককালের অনেক কবির কবিতায় আমরা পরাবাস্তববাদী উপাদান পাব, অনেক উপন্যাসেও পাব অযৌক্তিক স্বপ্নকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা। যাদু-বাস্তবতা (magic realism) দাদাবাদ/পরাবাস্তববাদের মতোই একটা ব্যাপার, এটাও এখানে বলা আবশ্যক।

৬. অস্তিত্ববাদ/চেতনচিত্রবাদ (Existentialism/Phenomenology)

জন্মের পরই মানুষ তার অস্তিত্ব নিয়ে সচেতন হয়ে যায়, তার ক্ষুধা, কৃষ্ণা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি নিয়ে সে অবস্থান করে এক স্বার্থপর সত্তা হিসেবে। 'স্বাধীনতা', 'সার্বভৌমত্ব', 'মানবিকতা' এবং এ সবের মতো অন্যান্য মানবিক সত্যকে একজন মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু তারপরেও তার মনে কী যেন নেই, আরো বেশি হলে ভালো হত, 'পৃথিবী এক শূন্যতা ছাড়া কিছু নয়', 'জীবনের অর্থ নেই',– এমন সব চিন্তা-ভাবনা আসে। এমন চিন্তা-ভাবনাকে 'মনস্তাত্ত্বিক ফেনমেনা বা চেতনচিত্র' বলতে পারি আমরা। জা-পল সার্ত্রে এবং আলবার্ট ক্যামুকে অস্তিত্ববাদী সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রবক্তা বলা যায় এবং তারা মনে করতেন যে

মানুষ এই অপরিচিত পৃথিবীতে অবস্থান করছে এক নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে, আর এই পৃথিবীতে প্রকৃত সত্য, মূল্যবোধ কিংবা জীবনের অর্থ বলে কিছু নেই। মানুষ শুধু এক ধরনের শূন্যতা (nothingness) থেকে জীবন শুরু করে ক্রমাগতভাবে শূন্যতা (nothingness) পার করে মৃত্যুকে তুলে নেয়। আমরা যাকে 'অস্তিত্ব' বলি তা আসলে এক ধরনের যন্ত্রণা, অথবা বলা যায় এই 'অস্তিত্ব' এক ধরনের অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সার্ত্রে তার অস্তিত্ববাদী চিন্তার এক পর্যায়ে এসে এমনও উচ্চারণ করেন– 'Man (woman) is condemned to be free'। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড সার্ত্রে বা ক্যামুর মতো 'নাস্তিক' ছিলেন না, তার অস্তিত্ববাদে অর্থহীন শূন্যতার জীবনকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার কথা আছে। আমরা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী এই শূন্যতা আর অর্থহীনতাকে খুঁজে পাব। সাহিত্যের সমালোচনায় তাই অস্তি ত্ববাদকে বেশ ভালোভাবেই উপস্থাপন করা যায়।

চেতনচিত্রবাদের (phenomenology) প্রবক্তা ছিলেন দার্শনিক এডমুন্ড হুসার্ল। তাঁর মতে, যে সব বিষয় বা ঘটনা অবশ্যম্ভাবী (immanent) নয় সেগুলোকে আমাদের চৈতন্য থেকে বাদ দিতে হবে এবং যা বাস্তব, যা আবশ্যিক ভাবে ঘটছে, তা phenomenon বা চেতনচিত্র হিসেবেই উপস্থিত। 'সূর্য পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে ডোবে'– এই সত্য যেমন একটা phenomenon, ঠিক তেমনভাবেই মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্যগুলো অবশ্যম্ভাবী সত্য হয়েই উপস্থিত। সাহিত্যের উপস্থিত বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদিকে আমরা তাই চেতনচিত্রবাদ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি।

৭. মার্কসবাদ (Marxism)

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে রয়েছে কার্ল মার্কস-এর সমাজদর্শন। বুর্জোয়া/প্রলেতারিয়েত, শোষক-শোষিত, সাম্রাজ্যবাদ/সাম্যবাদ ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্যকে নিয়ে কার্ল মার্কস-সৃষ্ট দর্শন সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব ফেলে। কার্ল মার্কস কথিত dialectical materialism, theory of revolution, law of surplus value ইত্যাদির মতো তত্ত্ব-ধারণা মানুষকে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং এই সাম্যবাদী সমাজের বাস্তবায়নে সারা পৃথিবীতেই খণ্ডিত/অখণ্ডিতভাবে শুরু হয়েছিল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন/বিপ্লব। কার্ল মার্কস-এর দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ভাষা ও সাহিত্যে এসেছিল নতুন চেতনাকাঠামোগত (paradigmic) উপাদান, যা এখনো বিক্ষিপ্তভাবে ক্রিয়াশীল। মার্কসবাদের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল (Frankfurt School) এবং আমাদের দেশেও মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল প্রচুর সাহিত্যের। সাহিত্য-সমালোচনায় মার্কসবাদী তত্ত্বসমূহকে আমরা তাই অস্বীকার করতে পারব না।

মার্কসবাদ মূলত অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শোষক/শোষিতের সম্পর্ক নিয়েই তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই মতবাদে অবহেলিত হয়েছিল মানুষের প্রেম, লোভ, লালসা, কাম, ধর্ম এবং অন্যান্য মৌলিক মানবিক উপাদান। এক সময় মানবিক মনস্তত্ত্ব আর মার্কসবাদ-এর মাঝে ক্রমাগতভাবে সংঘাত বাড়তে থাকে এবং মার্কসবাদের পতনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। মার্কসবাদের পতন, বুর্জোয়াতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানুষের কাম, লোভ-লালসার জয় ইত্যাদি

নিয়েও আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে প্রচুর এবং সাহিত্যের বিশ্লেষণে আমরা এই প্রসঙ্গগুলোও আনতে পারি বাস্তবতাকে গ্রাহ্য করে।

৮. উত্তর-কাঠামোবাদ/বিনির্মাণ (Post-Structuralism/Deconstruction)

কাঠামোবাদ (Structuralism) ভাষা ও সাহিত্যকে একটি স্থির ও বদ্ধ কাঠামোর অন্তর্গত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ভাষাতে উপস্থিত প্রকৃতি/সংস্কৃতি, ভালো/মন্দ, ঈশ্বর/মানুষ, দিন/রাত্রি, পুরুষ/নারী ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলোর শ্রেণী-মর্যাদাও ছিল স্থির। মানুষ ভাবত 'ভালো'র অবস্থান 'মন্দে'র উপরে, 'মানুষের' অবস্থান 'ঈশ্বরের' নিচে ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তর-কাঠামোবাদ/বিনির্মাণের দর্শন ব্যাখ্যা করে দেখা গেল, ভাষার শব্দসমূহের মুক্তক্রীড়ার (free play) ফলে ভাষায় কোনো স্থির কাঠামো কিংবা ভাষা-অর্থের কোনো নির্দিষ্ট উপস্থিতি থাকে না। ভাষার উপাদান যুগ্ম-বৈপরীত্যেও ঘটে উগ্র শ্রেণী-বিচ্যুতি। যার ফলে 'মন্দ' উঠে আসে 'ভালো'র উপর, 'মানুষ' হয়ে যায় 'ঈশ্বর' থেকে মহান।

উত্তর কাঠামোবাদ বা বিনির্মাণ কী, তা বোঝানোর জন্য প্রবন্ধের শুরুতে জাক দেরিদার ভাষা-দর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। দেরিদা ভাষা থেকে অধিবিদ্যা বাদ দিতে চান, কিন্তু আমরা জানি সাহিত্যে বিনির্মাণ কাজ করবেই, সাহিত্য থেকে অধিবিদ্যাকে পুরোপুরিভাবে বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু বিনির্মাণকে গ্রাহ্য করে একটি সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেক্ষাপট বিচার করতে পারি আমরা, আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি একটি সাহিত্যকর্মের মাঝে উপস্থিত বিনির্মাণযোগ্য বর্ণনা/বক্তব্য/বিবরণ ও অন্য উপাদানসমূহকে। একটি সাহিত্যকর্মে কাঠামোবাদগ্রাহ্য যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র-বিচ্যুতি কীভাবে ঘটে তা-ও বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এই তত্ত্ব দিয়ে। দেরিদার দর্শন বুঝে আমরা হয়তো বলব, 'all reading is misreading', 'all interpretation is misinterpretation' এবং 'There is nothing outside text', কিন্তু text-এর ভেতরে অবস্থান করে বিনির্মিত misreading আর misinterpreatation-এর উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। আমাদের বুঝতে হবে ভাষার মুক্ত-ক্রীড়া বা free play-ই আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে সৃষ্টির ব্যঞ্জনা আর নান্দনিক উপলব্ধি।

৯. উত্তর-আধুনিকতা (Post Modernism)

আধুনিকতা আর উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে আমাদের কিছু দ্বিধা আছে। কোথায় যে আধুনিকের শেষ, আর কখন যে উত্তর-আধুনিকতা শুরু হল এ নিয়ে আমরা তর্ক করতে পারি। কিন্তু সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। এ যেন অনেকটা আলো আর অন্ধকারের মতো। কোথায় অন্ধকারের শেষ আর কোথায় আলোর শুরু, এ নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হয়। তবে এ কথা হয়তো বলা যায় যে, উত্তর-আধুনিকতা একটা ধারণা বা concept, যা আধুনিকতার মাঝে থেকেই চৈতন্যগত কারণে এক পৃথক তত্ত্ব হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটিকে বোঝানোর জন্য একটা খুব সরল-সহজ উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক একটি আধুনিক মেয়ে তার সময়কে গ্রাহ্য করে খুবই ফ্যাশন-সচেতন এবং সে প্রায়ই নতুন নতুন জিনস্-এর প্যান্ট আর টি-শার্ট কেনে আরো আধুনিক হওয়ার জন্য। এক সময় তার মনে হল, তার এই আধুনিকত্বে আর কোনো নতুনত্ব নেই, তাকে আরো ফ্যাশন-সচেতন হতে হবে আরো আধুনিক হওয়ার জন্য। এমন একটা চেতনা-কাঠামো

তৈরি হবার পর সে নতুন নতুন জিনস্-এর নতুন প্যান্ট আর টি-শার্টগুলোকে ছিঁড়ে ফেলল বিভিন্ন জায়গায়, শার্ট আর প্যান্টের রঙকেও বিবর্ণ করে ফেলল ইচ্ছেমতো। তার কেনা নতুন জিনস্-এর প্যান্ট-শার্টের চেহারা দাঁড়াল পুরাতন ছেঁড়া-ফাড়া বিবর্ণ কাপড়ের মতো এবং সে ওই কাপড় পরে নিজেকে ভাবল 'উত্তর-আধুনিক'। উত্তর-আধুনিক নিয়ে উপস্থাপিত উদাহরণটা হয়তো বা খুবই সহজ-সরল হয়ে গেল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় এমন ঘটনা। আধুনিকতা আমাদের সমাজকে সবকিছু দেয়ার পরই, 'আরো চাই' 'আরো চাই'-জনিত শূন্যতা আমাদের উত্তর-আধুনিকতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'আধুনিকতা' আর 'উত্তর-আধুনিকতার' মাঝে কী আছে তা নিজের ছকে দেখানো হল:

আধুনিকতা

১. আধুনিকতার সব কার্যের প্রেক্ষাপটে কোনো কারণ থাকে, দর্শন ও তত্ত্ব থাকে।
২. আধুনিকতায় পরিকল্পনার ভূমিকা থাকে, মানুষ কোনো কিছু করার আগে কোনো এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা/নক্শা নিয়ে এগিয়ে যায়।
৩. আধুনিকতায় ভালো-কে মন্দের উপর রেখে এক ধরনের আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়।
৪. আধুনিকতা সমগ্র নিয়ে চিন্তা করে, কাঠামো নিয়ে চিন্তা করে।
৫. আধুনিকতা কোনো বিষয়ের গহীনে গভীরে যেতে চায়, চায় অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।
৬. আধুনিকতা চায় একীভূত করার কোনো এক প্রক্রিয়া (synthesis) এবং সমাজকে একটা কাঠামোতে বন্দি রাখতে।
৭. আধুনিকতা নিয়ম ও আইনকে মেনে চলে। তারা সমাজে উপস্থিত সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্ঞানী, পণ্ডিত প্রমুখকে মূল্যায়িত করে।

উত্তর-আধুনিকতা

১. উত্তর-আধুনিকতা যে-কোনো কার্যকে 'খেলা' হিসেবেই গণ্য করে, কোনো কারণ, তত্ত্ব বা দর্শন নিয়ে চিন্তা করে না।
২. উত্তর-আধুনিকতা পরিকল্পনাহীন। 'হঠাৎ করে' যা খুশি তাই করা যায়।
৩. উত্তর-আধুনিকতায় ভালো-মন্দ বিচার করার সময় নেই এবং এ কারণে বিশৃঙ্খলাও আসতে পারে।
৪. উত্তর-আধুনিকতা বিনির্মাণ করে নতুন কিছু করার চিন্তা করে।
৫. উত্তর-আধুনিকতা শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যাপারটাই বুঝতে চায়, গহীন-গভীরে দৃষ্টি দেয়ার সময় নেই। অস্তিত্বের অনুপস্থিতি উত্তর-আধুনিকতায় কাম্য।
৬. উত্তর-আধুনিকতা synthesis-এর বিপক্ষে, কোনো-এক antithesis দিয়ে ভাঙতে চায় সমাজকে।
৭. উত্তর-আধুনিকতা নিয়ম ও আইন ভাঙতে চায়। সমাজে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিই তাদের কাছে বড়ো কিছু নয়।

আসলে 'আধুনিকতার' বিরুদ্ধে সময়কেন্দ্রিক বিদ্রোহের নামই 'উত্তর-আধুনিকতা'। আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও দর্শনে যেহেতু উত্তর-আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে, তাই আমাদেরও উচিত হবে 'উত্তর-আধুনিকতা' তত্ত্ব দিয়ে আমাদের সাহিত্যকে বিচার করা।

১০. উত্তর-উপনিবেশবাদ (Post-colonialism)

মূলত ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন আর পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল বিভিন্ন তৃতীয় বিশ্বের দেশ। উপনিবেশ থাকাকালে এই দেশগুলোর সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রচণ্ডভাবে বিনির্মিত/নবনির্মিত হয়। যা উত্তর-উপনিবেশবাদের আলোচ্য বিষয়। ব্রিটেনের উপনিবেশ থাকাকালে ইংরেজ সমাজ ও ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি বাংলাদেশের বঙ্গালদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন এনেছে, তা আলোচনা করা যেতে পারে উত্তর-উপনিবেশবাদ বোঝার জন্য।

বাংলাদেশের বঙ্গাল সমাজ প্রথমত উত্তর-ভারত থেকে আগত আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজনে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করত। পরবর্তীকালে মুসলমান পাঠান ও মোঘলদের উপনিবেশ হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। এ সময় বাংলা ভাষায় ফারসি, আরবি ভাষা-শব্দের সংযোজন ভাষাকে গতিময় করে তোলে, যদিও তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাবই ছিল বেশি। মুসলমান শাসনআমলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির মতো সুযোগ বেশি এসেছিল, এ সত্যও আমরা উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু সামাজিক চরিত্রের পতনও হয়েছিল এ সময়েই উল্লেখযোগ্যভাবে। সমাজ বিভক্ত হয়েছে জাত-পাত আর ধর্মকে কেন্দ্র করে, সমাজে অবস্থান করছিল শ্রেণী হিন্দু/অন্ত্যজ হিন্দু, হিন্দু/যবন, হিন্দু/ম্লেচ্ছ, হিন্দু/নেড়ে, মুসলমান/মালাউন, মুসলমান/নাছারা, মুসলমান/কাফের ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্য। একটি সমাজ যেহেতু জাত-পাত ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভক্ত ছিল, সেহেতু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তা বঙ্গালদের মাঝে কখনো আসেনি, তারা সবসময় পরাধীন থেকে জাত-পাত নিয়েই ব্যস্ত থাকত বেশি। ইংরেজরা এসে বঙ্গাল হিন্দু-মুসলমানদের এই সংঘাতকে কাজে লাগল, divide and rule-নীতি প্রয়োগ করে তারা শাসন করল বাংলাদেশকে প্রায় ২০০ বছর।

আমাদের দেশের লোকজন সবসময় 'সাদা চামড়ার' ভক্ত। আর্য ফর্সা ব্রাহ্মণদের বঙ্গালরা শোষণ করার অধিকার প্রায় বিনা বাধাতেই দিয়েছিল। 'ফর্সা' সাহেবরাও অনেক সময় দেবতার মতোই ছিল বঙ্গালদের তৎকালীন চেতনাকাঠামোতে। ফর্সা 'সাহেব'দের মতো ধনী, বড়ো চাকরিজীবী বঙ্গালরাও 'সাহেব' হতে চাইল; চক্রবর্তী বাবু, মুখুজ্জ্যে বাবু, বাঁড়ুজ্যে বাবু, গোস্বামী বাবু, মিত্র বাবু, ইসলাম বাবু, সবাই 'বাবু', বাদ দিয়ে হয়ে গেলেন 'সাহেব'। অফিসের হেড-ক্লার্ক অবশ্য বাবুই রয়ে গেল। তখনকার বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, মিত্র, গোস্বামী, ঠাকুর, চক্রবর্তী সাহেবরা, সাহেব হতে চইলেও ইংরেজদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারলেন না। বিলেতি মদ্যপান আর বাইজি নাচিয়ে তাই তারা সৃষ্টি করলেন 'বাবু সংস্কৃতি'র। সমাজে পরিবর্তন আসল অনেক, আদি বঙ্গাল সংস্কৃতি থেকে ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'বাবু সংস্কৃতি'র ছায়াতে তৈরি হতে থাকল এক ধরনের 'ইঙ্গবঙ্গ' সংস্কৃতি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দ ইংরেজ পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে কিছু বাংলা পুস্তক রচনা করলেন, যা আসলে ছিল দেব-ভাষা

সংস্কৃতের কাছাকাছি। সংস্কৃত আর ইংরেজি ব্যাকরণ মিশিয়ে তৈরি হল বাংলা ব্যাকরণ, যা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি বাংলা-ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচ্য নয়।

ইংরেজি ভাষার প্রতিও সাধারণ মানুষ ও পণ্ডিতদের দুর্বলতা বাড়তে লাগল, তারা শিখতে চাইলেন ভাষাটি (অবশ্য মোল্লাদের কথায়/ফতোয়ায় মুসলমানরা নাসারাদের ভাষা শিখতে রাজি ছিলেন না)। প্রথমদিকে 'গরু মানে cow আর ষাঁড় মানে husband of a cow'-জাতীয় ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে বঙ্গালরাও এগুতে থাকলেও, পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্য আর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেন আমাদের সাহিত্যিক/দার্শনিকবৃন্দ। আমাদের দর্শন থেকে হারিয়ে গেলেন পাণিনি, পতঞ্জলি, বদরায়ন, নাগেশ ভট্ট প্রমুখ, আমরা ভুলে গেলাম আউল-বাউল-সহজিয়া মতবাদ, আর আমাদের চিন্তা-চেতনায় বাসা বাঁধল দেকার্ত, শপেনহাওয়ার, হেগেল, মার্কস, রাসেল প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যেও প্রভাব ফেলল পশ্চিমের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিকবৃন্দ। আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করি, তবে আমাদের কবিতা, উপন্যাস আর নাটকে পশ্চিমের স্বাক্ষর আবিষ্কার করতে পারব। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা যদি ইংরেজদের উপনিবেশ না হতাম, তাহলে আমাদের দর্শন ও সাহিত্য কেমন হত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যদি আমরা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও দর্শনকে বিশ্লেষণ করি, তবে উপনিবেশবাদ নিয়ে আমাদের কিছু চিন্তা-ভাবনা করতেই হবে।

১১. পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব (Reader-Response Theory)

আমরা ইতোমধ্যেই নোয়াম চমস্কি-কথিত literary performance আর literary competence নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা করেছি। একটি সাহিত্যকর্ম পাঠের সময় পাঠকের 'যোগ্যতা ও কৃতি' প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে এবং পাঠকের যোগ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদির মতো উপাদানের ওপর নির্ভর করে সাহিত্যকর্মটি বিশ্লেষিত হয়। ওলফ্‌গ্যাং আইসার-এর মতে, সাহিত্যের পাঠ হল পাঠক ও text-এর মাঝে অবস্থানকারী এক ধরনের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া, যা পাঠের সময় text ও পাঠকের মাঝে সমানভাবে কাজ করে। পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব সাহিত্য সমালোচনায় প্রত্যক্ষভাবে আনা যায় এবং এ ব্যাপারে আরো জানার জন্য আই.এ.রিচার্ডস, লুইস রোজেনব্লাট, স্ট্যানলি ফিস প্রমুখ সাহিত্যতাত্ত্বিকের লেখা পড়া যেতে পারে।

১২. প্রত্নগঠন/পুরাণ-কেন্দ্রিক সমালোচনা (Archetypal/Myth Criticism)

কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং, জোসেফ ক্যাম্পবেল, রবার্ট গ্রেভস, ফ্রানসিস ফরগুসন, ফিলিপ হুইলরাইট, লেইসি ফিল্ডার, নরথ্রপ ফ্রাই, মাওদ বোদকিন এবং উইলসন নাইট ছিলেন প্রত্নগঠন/পুরাণকেন্দ্রিক সমালোচনার প্রবক্তা। এ তত্ত্বে মানুষের চেতন ও অচেতনের প্রত্ন ও পুরাণকেন্দ্রিক সংগঠনকে বিশ্লেষণ করা হয় যা যে-কোনো সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে উপস্থিত থাকে। কার্ল ইয়ুং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে বলেছেন যে, প্রত্ন-ইতিহাসবাহিত কোনো ঘটনা কিংবা আমাদের জানা কোনো পুরাণকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের মনের গহীনে মনস্তাত্ত্বিক তলানি হিসেবে অবস্থান করে এবং সেসবের প্রকাশ ঘটে আমাদের কর্ম ও সাহিত্যে।

প্রত্নগঠন/পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্য-সমালোচনার প্রেক্ষাপট খুঁজতে আমাদের

যেতে হবে আমাদের শৈশবে, আমাদের ধর্ম ও সমাজবাস্তবতায়। ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনতাম ভূতের, লালপরী-নীলপরীর, রাজকুমার, মদনকুমার আর রাজকন্যা মধুমালার, কঙ্কাবতীর। আমরা জানি বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, রূপবানকন্যা গুনাই বিবি আর নসিমন বিবির গল্প, কারবালার ঘটনা, রাম-রাবণের 'রামায়ণ', কুরুপাণ্ডবের 'মহাভারত' ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রত্ন-কথা ও পুরাণকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ। এইসব রূপকথা আর পুরাণকেন্দ্রিক ঘটনা আমাদের যৌথ অচেতনে (collective unconscious) অবস্থান করে ছায়ার মতো এবং অনেক সময় আমাদের কাজ ও কর্মে এই প্রত্ন-কথা বা রূপকথার উপাদান চলে আসে। সাহিত্য-সৃষ্টির বেলায় মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এই বিষয়গুলো আসতে পারে, আর তাই প্রত্নগঠন/পুরাণকেন্দ্রিক সমালোচনা করে আমরা সাহিত্যের সত্য উদ্ধার করতে পারি।

১৩. নারীবাদ (Feminism)

সেই আদি-গুহামানবের যুগ থেকেই নারীর শ্রেণীমর্যাদার উগ্র বিচ্যুতি ঘটে, পুরুষের স্থান হয় নারীর উপরে, তৈরি হয় 'পুরুষ/নারী' যুগ্ম-বৈপরীত্যটির। এই যুগ্ম-বৈপরীত্য গ্রাহ্য করে ভাষায় ক্রমাগতভাবে আরো অনেক কাঠামোগত যুগ্ম-বৈপরীত্য স্থান করে নেয় এবং প্রতিট যুগ্ম-বৈপরীত্যে নারী হয় অবহেলিত। সূর্য পুরুষ হলে নারী চাঁদ; আলো যদি হয় পুরুষ, তবে নারী অন্ধকার; পুরুষের স্থান যদি হয় উপরে, নারী থাকবে নিচে; বাহির যদি হয় পুরুষের তবে ঘর হবে নারীর,– এমন সব ভাষাকেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্য নারীকে অবহেলা করছে বারবার। আমরা যে আদি-সাম্যবাদী সমাজের চিন্তা করি, যেখানে ছিল সম্পদের সুষম বণ্টন, সেখানেও 'নারী' হয়ে গিয়েছিল 'প্রথম সম্পদ'; কারণ যে পুরুষের শক্তি ছিল বেশি, তার নারীকে স্পর্শ করার ক্ষমতা অন্য কারো ছিল না। আসলে নারী সম্পদ হয়েছিল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যৌনতাকে কেন্দ্র করে। যৌন-ক্রিয়ার সময় নারীর অবস্থান, পুরুষাঙ্গ দিয়ে নারীকে বিদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি ছিল প্রাথমিকভাবে নারীর শ্রেণীমর্যাদা পতনের প্রধান কারণ। ভাষার বিবর্তনের সাথে সাথে, সেই আদিম যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলোর প্রসার ঘটে এবং নারী আর কখনো তার সামাজিক মর্যাদা উদ্ধার করতে পারেনি। কখনো-কখনো নারী দেবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু তা হয়েছে আদিম যাদু-বাস্তবতার (magic realism) ফলে। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন একটি নারীর গর্ভ থেকে অন্য এক নারী বা পুরুষের জন্মগ্রহণের বিচিত্র চিত্র দেখত, তখন তা তাদের জন্য এক ধরনের যাদুবিদ্যাজাত উপলব্ধি নিয়ে আসত এবং পরবর্তীকালে নারীকে তারা গ্রহণ করত একজন জীবনরক্ষাকারী সত্তা হিসেবে, মা হিসেবে। কখনো যৌন উত্তেজনায় তারা নারীকে আনত স্বপ্নের চরিত্র হিসেবে, দেবী হিসেবে। আমরা দেবী হিসেবে ভেনাস, আফ্রোদিতি, দুর্গা, কালী এবং অন্য যে সত্তাগুলোকে চিহ্নিত করেছি, তা আসলে এক ধরনের কামনা/বাসনা কিংবা যাদুবিদ্যাজাত উপলব্ধির ফসল।

বিশ শতকে এসে নারীবাদী দর্শন ও তত্ত্বের প্রসার ঘটে। সিমন দ্য বোভেয়া, বেটি ফ্রাইডেন, কেট মিলেট, জুডিথ ফেটারলি, এলিন শোওয়াল্টার, সান্ড্রা গিলার্ট, সুসানগুবার, জুলিয়া ক্রিস্টিভা, টরিল মোই, কেলি অলিভার প্রমুখ হলেন আধুনিক নারীবাদের প্রবক্তা। মূলত পুরুষের সমান অধিকার চেয়ে নারীবাদী দর্শন-তত্ত্বের প্রসার ঘটলেও, পরবর্তী পর্যায়ে নারীবাদী সাহিত্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ফরাসি নারীবাদে, নারীর অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে অবস্থানরত

মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর ওপর জোর দেয়া হয়। কিছু তত্ত্বে ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত আসে যে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন আসলে প্রকাশের সময়ই পুরুষতন্ত্রের পক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল। নারীবাদের একটি শাখা নারীদের অধিকার আদায়ের তত্ত্ব উপস্থাপন করার সাথে সাথে জরায়ুর স্বাধীনতা, অবাধ যৌন-সম্ভোগের অধিকার এবং নারী-সমকামিতার পক্ষেও বক্তব্য রেখেছে। বাংলা সাহিত্যেও নারীবাদকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা এসেছে বিশ শতকের প্রথম থেকেই। প্রথম দিকে নারী-স্বাধীনতার বক্তব্য/বিবরণ সীমাবদ্ধ ছিল ঘর ও পরিবারকে কেন্দ্র করে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নারীবাদী চিন্তা-চেতনার ঘর ও পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক আন্দোলন হিসেবেই উপস্থাপিত হয়। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে আমরা তাই এসব সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন অবশ্যই করতে পারি।

সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার বিশ্লেষণে ইচ্ছে করলেই 'ভালো' আর 'মন্দ' সম্পর্কিত আমাদের চিন্তা-চেতনাকে উপস্থিত করতে পারি, কারণ 'ভালো' আর 'মন্দ' সম্পর্কীয় মানবিক বিচার ও উপলব্ধি সব সময়ই আপেক্ষিক। কোনো-একটি ঘটনা বা বিষয় যদি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবে এই 'ভালো-মন্দের বিচার' আরো জটিল হয়ে পড়ে, কারণ প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব চেতনা-কাঠামো নিয়ে ভাষাভিত্তিক ক্রিয়া-কর্মকে নিজের মতো করে বিনির্মাণ ও বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। ভাষা যেহেতু সব সময় বিনির্মাণযোগ্য, তাই ভাষার সত্য কোনো সময়ই সর্বজনগ্রাহ্য সত্য নয়। একজন 'তুমি বা 'সে' যা বলল বা লিখল, তার সাথে একজন আমি হয় একমত হবে, নয়ত নয়; আর এই একমত 'হওয়া-না-হওয়া'কে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয় আলোচনা-সমালোচনার। এখন প্রশ্ন হল, আলোচনা-সমালোচনা করা যায়, এরকম একটা চিন্তা-চেতনা মাথায় রেখে কি আমরা কোনো লিখিত বক্তব্য বা বিষয় নিয়ে অযথা যুক্তিহীন, তত্ত্বহীন বাকবিস্তার করতে পারি? যদি করি, তবে তাকে কি আলোচনা-সমালোচনা বলা যাবে? মোটেও না, কারণ যুক্তিহীন, তত্ত্বহীন অযথা বাকবিস্তার করতে পারে একটি বালক, পাগল কিংবা একজন মূর্খ মানুষ। আমাদের হাতে এত তত্ত্ব, দর্শন আর যুক্তি থাকার পরেও যুক্তিহীন 'ভাষার-আকাশ' তৈরি করাটাকে এক ধরনের অন্যায় হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। আলোচনা-সমালোচনার সময় একজন আলোচকের/ সমালোচকের 'অহং'-এর ভূমিকাও থাকে প্রচুর। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আলোচনা-সমালোচনা করার সময় অযথা অহংকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, আলোচনা-সমালোচনার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে যুক্তি তত্ত্ব ও দর্শনের, অহং-এর নয়।

একটি সাহিত্যকর্মের আলোচনায়/সমালোচনায় আমরা বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আসতে পারি। একটি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কিংবা নাটকের বিশ্লেষণে কোনো একটি একক সাহিত্যতত্ত্ব আসবে, তা কিন্তু নয়। সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনায় একই সাথে বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও প্রসঙ্গ আসতে পারে তবে আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগকালে যথাসম্ভব text বা পাঠ-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে অযথা text-এর বাইরে গিয়ে আলোচনা-সমালোচনার পরিধি বাড়ানো উচিত নয়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগ করার ইচ্ছে নিয়ে প্রথমেই আমি আলোচনা করব কবি আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন' শিরোনামের সনেটগুচ্ছের। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি এবং এটি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হবার দাবি রাখে। ইতঃপূর্বে কবিতাটি নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং সে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে কবিতার কাঠামো, উপমা, অলংকার, ছন্দ, ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। বেশিরভাগ সমালোচক কবিতার গ্রন্থনাতে উপস্থিত যৌনতা, সাম্যবাদী বাণী, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি শনাক্ত করেছেন। আমরা যদি কবিতাটি সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করি, তবে ইতোমধ্যে যারা কবিতাটি বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের বক্তব্য বাতিল হয়ে যাবে না, বরং তাদের আলোচনার সাথে বর্তমান আলোচনা এক হয়ে এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে।

আল মাহমুদের এই কবিতায় (বা সনেটগুচ্ছে) প্রকৃতভাবে উপস্থিত হচ্ছে এক নারী এবং সেই অবিবাহিত শ্যামাঙ্গী নারীটির সাথে এক কবিসত্তার বিবাহ-প্রস্তাব-এর ওপর নির্ভর করেই কবিতাটি এগিয়ে গেছে, কবিতার শিরোনাম হয়েছে 'সোনালী কাবিন'। আমরা যদি কবিতাটি পড়ি, তখন খুঁজে পাই এই নারী-সত্তার প্রেক্ষাপটে অন্য একটি সত্তাকে এবং এই সত্তার নাম 'জন্মভূমি'। আল মাহমুদের কবিতাসত্তায় এক কুমারী নারীর প্রতীক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে 'জন্মভূমি' কিংবা 'স্বদেশচিন্তা'। এই প্রতীকের উৎসবিন্দুকে খুঁজে পেতে হলে আমাদের যেতে হবে প্রত্ন-কাঠামোর/পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বে, যেখানে প্রত্ন-ইতিহাস আর পৌরাণিক চরিত্রসমূহ কীভাবে আমাদের যৌথ-মনস্তত্ত্বে অবস্থান করে, তা দেখানো হয়েছে। আল মাহমুদের প্রত্নচিন্তা এবং পৌরাণিক ঘটনাবিন্যাসের তলানি (residue) একটি নারীরূপ প্রতীকের মাঝে খুঁজে পেয়েছে 'জন্মভূমি' বা 'স্বদেশ'কে, এবং তিনি তাঁর প্রত্নচিন্তাজাত কৌম সমাজকে একজন নারীর প্রতি তাঁর কামনা-বাসনা, ইচ্ছে-স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন বর্তমানে। এ প্রসঙ্গে আল মাহমুদের কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা যাক:

ক. এ-তীর্থে আসবে যদি ধীরে অতি পা ফেলো সুন্দরী,
মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়,
ছিন্ন তালপত্র ধরে এসো সেই গ্রন্থ পাঠ করি
কত অশ্রু লেগে আছে এই জীর্ণ তালের পাতায়।
কবির কামনা হয়ে আসবে কি, হে বন্যবালিকা
অভাবে অজগর জেনো তবে আমার টোটেম,
সতেজ খুনের মতো এঁকে দেবো হিঙ্গুলের টিকা
তোমার কপালে লাল, আর দীন-দরিদ্রের প্রেম।

খ. পূর্ব পুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল– রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল?

আরশি নগরে খোঁজা বাস করে পড়শী যে জন
আমার মাথায় আজ চূড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,

গ. যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
একদা তারাই জেনো গড়েছিলে পুণ্ড্রের নগর
মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড় ।
আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পট্টিকেরা পুরীর গৌরব,
রাক্ষসী গুল্মের ঢেউ সবকিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝির চিৎকারে বাজে অমিতাভ গৌতমের স্তব ।

আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় সময়কে বিনির্মাণ করেছেন সফলভাবে। তাঁর স্বদেশ-চিন্তা ঐতিহাসিক বঙ্গ ও বঙ্গের কৌম সমাজ নিয়ে শুরু হলেও, কবিতার সত্য বর্তমান বাংলাদেশকেও তুলে ধরে। পাঠকেন্দ্রিক সমালোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, আল মাহমুদের মতো এখনকার পাঠকও বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় 'নীল...অহরহ দংশনের ভয়ে'। বাংলাদেশে এখন জ্ঞানচর্চার পরিবেশ চূড়ান্তভাবে বিপন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক খুন হন তার সহকর্মী শিক্ষকের নির্দেশে। বর্তমানের রাজনীতি, সামাজিক বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের মানুষকে কেন্দ্র করে 'মানবত্ববোধ' খুব একটা কাজ করছে না, আমরা সবাই হয়ে গেছি পশুসুলভ 'সিনানথ্রোপাস' কিংবা 'অস্তিবাদী জিরাফ'। আল মাহমুদ তাই কবিতায় লিখেন:

ক. হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গোটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে:
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে ।
খ. অতীতে যাদের ভয়ে বিভেদের বৈদিক আগুন
করতোয়া পার হয়ে এক কঞ্চি এগোতো না আর,
তাদের ঘরের ভিতরে ধরেছে কি কৌটিল্যের ঘুণ?
ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বার বার;
বর্গীরা লুটছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ ।

গ. আবাল্য শুনেছি মেয়ে বাংলাদেশ জ্ঞানীর আতুড়
অধীর বৃষ্টির মাঝে জন্ম নেন শত মহীরূহ,
জ্ঞানের প্রকোষ্ঠ দেখো, ঝোলে আজ বিষণ্ন বাদুড়
অতীতে বিশ্বাস রাখা হে সুশীলা, কেমন দুরূহ?

কী করে মানবো বলো, শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি এই
শীলভদ্র নিয়েছিলো নিঃশ্বাসের প্রথম বাতাস,
অতীতকে বাদ দিলে আজ তার কোনো কিছু নেই
বিদ্যালয়ে কেশে ওঠে গুটিকয় সিনানথ্রোপাস।
... ...
আমাদের কলাকেন্দ্রে, আমাদের সর্ব কারুকাজে
অস্তিত্ববাদী জিরাফেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।

আল মাহমুদ তাঁর 'সোনালী কাবিন' সনেটগুচ্ছে 'শোষক-শোষিত' যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বারবার আনেন, উন্মোচন করেন ঐতিহাসিক শোষণের রূপ ও স্বরূপ। তিনি প্রাচীন বঙ্গাল কৌম সমাজের সাম্যবাদী চরিত্রকেও বিশ্লেষণ করেন এবং তিনি স্বপ্ন দেখেন এক মার্কসবাগ্রাহ্য সাম্যবাদী সমাজের। সমালোচনার এই সাম্যবাদী সমাজে নেই ধর্মের বাড়াবাড়ি, নেই জাতপাতকেন্দ্রিক বিভেদ। বঙ্গ দেশের আদিম জাতপাতহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা পাঠকের চেতনাকাঠামোকে নতুনভাবে সাজায়, যদিও একজন পাঠক ভালো করেই বোঝে যে এমন জাতপাতহীন সাম্যবাদী সমাজ এখন আর নতুনভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। জাতপাত-ধর্মহীন সাম্যবাদী সমাজ কেমন ছিল তা দেখতে পাই আল মাহমুদের কবিতায়:

ক. সে-কোন গোত্রের মন্ত্রে বলো বধূ তোমাকে বরণ
করে এই ঘরে তুলি? আমার তো কপিলে বিশ্বাস,
প্রেম কবে নিয়েছিলো ধর্ম কিংবা সংঘের শরণ?
মরণের পরে শুধু ফিরে আসে কবরের ঘাস।
যতক্ষণ ধরো এই তাম্রবর্ণ অঙ্গের গড়ন
তারপর কিছু নেই, তারপর হাসে ইতিহাস।

খ. মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোনো সামন্তের নামে কোনদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে এই নগ্ন মস্তকের 'পরে।

গ. শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।

আল মাহমুদের কবিতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমরা উদ্ধার করতে পারি ইদিপাস-এষণা-জাত যৌনতাকে। ভাষা-কাঠামো-গ্রাহ্য চিন্তা-চেতনায় 'স্বদেশ' সব সময় 'মা'-এর সাথে তুল্য হলেও, আল মাহমুদের কবিতায় এসেছে তা এক শ্যামাঙ্গী তরুণী হিসেবে। এই তরুণীর রূপ বর্ণনায়, প্রেমের প্রসঙ্গ উচ্চারণে এবং 'সোনালী কাবিন' লেখার প্রস্তাবে এসেছে যৌনতা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে। কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা আবিষ্কার করতে পারি 'নারীবাদী' উপাদানও। 'যৌনতার' পাশাপাশি 'নারীশক্তি'-কে স্বীকার করে নেয়াটাও কবিতাটির উল্লেখযোগ্য বক্তব্য। যে নারীকে খেতের আড়ালে এসে নগ্ন হয়ে তার যৌবন বিলিয়ে দিতে বলা হচ্ছে, সেই একই নারীর মাঝে 'মৃত্যুর পিঞ্জর ভাঙা বাঁচার নিয়ম'ও দেখতে পাচ্ছেন কবি। যৌনতা আর নারীবাদবিষয়ক কিছু পঙ্‌ক্তি নিচে তুলে দেয়া হল:

ক. ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দুটি জলের আওয়াজ–
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণ্যমান রক্তের ধাঁধায়।

খ. তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ,
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশি ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পর্ণময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।

গ. কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয় আসে,
কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।
মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণাহারী যম,
বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম।

ঘ. শুভ এই ধানদূর্বা শিরোধার্য করে মহীয়সী
অবরু আলগা করে বাঁধো ফের চুলের স্তবক,
চৌকাঠ ধরেছে এসে ননদীরা তোমার বয়সী
সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক
বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল

গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল ।

'সোনালী কাবিন' সনেটগুচ্ছ নিয়ে আরো অনেক কথাই বলা যায়, প্রতিটি পঙ্‌ক্তির বিনির্মাণ-বিশ্লেষণ করা যায় সাহিত্যতত্ত্বকে গ্রাহ্য করে এবং এ কারণেই বলা যায় বাংলাসাহিত্যে 'সোনালী কাবিন' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ।

আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ যে-কোনো সাহিত্যকর্মে করা সম্ভব । ইতঃপূর্বে আমার প্রকাশিত গ্রন্থ সৃষ্টির সিঁড়িতে সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে কিছু আলোচনা-সমালোচনা করা হয়েছিল । যেহেতু ওই আলোচনা-সমালোচনাও বর্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রাসঙ্গিক, তাই তার কিছু অংশ এই প্রবন্ধেও সম্পাদনাসহ সংযোজন করা যায় । এখানে উল্লেখ্য যে, আমার পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনায় মুখ্যত কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, বিনির্মাণ ও অস্তিত্ববাদ প্রাধান্য পেয়েছিল । তবে, তাতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে ।

কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে যদি আমরা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর বিচার-বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যাবে প্যারাডাইস লস্ট ভালো ও মন্দের বৈপরীত্য নিয়ে রচিত, যেখানে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ সত্তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভালো কিংবা উত্তমের অস্তিত্ব আর মন্দ কিংবা অধম-অস্তিত্ব সম্পূরক হিসেবে অবস্থান নিয়েছে উত্তম সত্তার অধীনে । ভালো/মন্দ কিংবা উত্তম/অধম এই যুগ্ম-বৈপরীত্যকে দ্বিতীয় চিন্তায় বিশ্লেষণ করলে উগ্র শ্রেণীমর্যাদার বিচ্যুতি ঘটতে পারে এবং পতিত-অস্তিত্ব কিংবা অধম উঠে আসতে পারে উত্তমের উপরে । এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠবে, ঈশ্বর যদি শুদ্ধ-অস্তিত্ব হিসেবে উত্তম-সত্তার ধারক হন তবে শয়তানকে সৃষ্টি করলেন কেন? কেন সৃষ্টি হল অহমের? শয়তানের পতনের জন্য দায়ী ছিল কে? মানুষ কিংবা শয়তানকে পাপে প্রলুব্ধ করেছিল কোন সত্তা? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ঈশ্বরের পরিপূর্ণ শুদ্ধ ও উত্তম অস্তিত্ব-কাঠামো ভেঙে পড়ে, কারণ পাপ ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের এক অন্য রকম বিপরীত চরিত্রই উন্মোচিত হয় । এ অবস্থায় আমরা কোনো ধ্রুব উত্তম সত্তাকে খুঁজে পাই না, ফলে প্রচলিত ধারণায় গ্রাহ্য 'ভালো/মন্দ' যুগ্ম-বৈপরীত্যকে নতুনভাবে সাজিয়ে বলতে হয়– মন্দের পরেই ভালোর সৃষ্টি আর মানুষের পতনের পরই অবস্থান করছে উত্তমের সত্তা । ঈভের প্রতি এডামের প্রেম ছিল উত্তম সত্তার অধীন, যাকে অশুভ শয়তান সত্তা পতনের পূর্বে কলুষিত করেছিল । প্যারাডাইস লস্ট-এর ভালো ও মন্দ সত্তার বিনির্মাণ করেছেন বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক । ব্লাকের ধারণায়, মিল্টন তাঁর কাব্যে শয়তানের পক্ষ নিয়েছিলেন আর শেলির মতে প্যারাডাইস লস্ট-এ শয়তানের চরিত্র ছিল ঈশ্বরের চেয়ে মহৎ । শয়তান এডাম ও ঈভের প্রেম ও দৈহিক মিলনের সপক্ষে ছিল বলেই হয়তো মানবিক চেতনার দৃষ্টিতে শয়তানকে ছোট করে দেখা সম্ভব নয় ।

বাংলা ভাষায় লেখা বিভিন্ন কাব্য ও সাহিত্যকর্মের বিনির্মিত রূপ ও স্বরূপকে বিশ্লেষণ করা যায় । মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্য এ প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য । মেঘনাদবধ কাব্য লেখা রামায়ণের কিছু অংশকে কেন্দ্র করে, যেখানে ধ্রুপদী বিশ্বাসের অন্তর্গত 'রাম/রাবণ' যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিনির্মাণ করা হয়েছে নতুনভাবে । এ কাব্য সম্পর্কে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । যদিও তিনি তাঁর আলোচনায় দেরিদার deconstruction-কে আনেননি (সত্তরের দশকে দেরিদার প্রসঙ্গ আনা সম্ভবও ছিল

না) তবুও তাঁর আলোচনায় বিনির্মাণ-দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। এ কাব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য– 'মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ভিত্তি রামায়ণে'র খণ্ডাংশ। কিন্তু কাহিনী ও চরিত্র মধুসূদনের হাতে নবরূপে নির্মিত। রামায়ণের নায়ক, ধর্মের প্রতীক, রামচন্দ্র এখানে পররাজ্য আক্রমণকারী: লক্ষ্মণ কাপুরুষাধম, বিভীষণ রক্ষোকুলগ্লানি। অন্যদিকে রামায়ণের রাক্ষস রাবণ এখানে নায়কের শৌর্যবীর্য ও গুণাবলিমণ্ডত, দশানন তার রামায়ণানুগ দশমুণ্ডবিশিষ্ট বীভৎস আকৃতির বর্ণনা নয়– দশজন অতুলনীয় মহাবীরের শক্তির সমাহাররূপে কল্পিত। মেঘনাদ অমিতশক্তি রাবণেরই যৌবন-প্রতিরূপ। কাব্যের ট্রাজেডি, কবির পরিকল্পনা রাবণকে ঘিরেই আবর্তিত। রাবণের অতুল শক্তি ও তার নিয়তিনিহিত পরিণাম মধুসূদনের কালের নব্যবিকাশোন্মুখ বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তেরই অসাধারণ বাণীরূপ।... চিত্রাঙ্গদা, সীতা, জটায়ু এবং দেবদেবীদের সংলাপে সীতাহরণরূপ চরিত্রদৌর্বল্যই রাবণের ট্রাজেডির কারণ বলে নির্দেশিত। চরিত্রের অন্তর্গত ত্রুটির ফলে ট্রাজেডি ঘনীভূত হবার এই সেক্সপিয়রীয় কৌশল মধুসূদন সুস্পষ্টভাবে অনুসরণ করেছেন, মনে হয়। কিন্তু রাবণের উক্তিতে বা আচরণে এই 'পাপ'-সচেতনতার কোনো চিত্র নেই, বরং বারবার তার বিমূঢ় প্রশ্ন 'কি পাপ দেখিয়া রে দারুণ বিধি হরিলি এ ধন তুই?' বিশেষত সীতাহরণকে সে আদৌ পাপ বলে মনে করে না; ভগ্নি শূর্পনখার প্রতি রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অপমান প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যেই যেন তার সীতাহরণ। তাই তার ট্রাজেডি যেন দুর্লক্ষ্য নিয়তির বিধান–'

উল্লিখিত আলোচনা-অংশ থেকে আমরা রাম-রাবণের পৌরাণিক ঘটনার বিনির্মাণকে চিহ্নিত করতে পারি। মেঘনাদবধ কাব্যে রামায়ণের কাহিনীবিন্যাসের সাথে প্রাচ্যের মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও পাশ্চাত্যের মিল্টন, ত্যাসো, ভার্জিল, দান্তে, হোমারের কাব্য ও গ্রিক পুরাণের বিনির্মিত উপাদানকেও চিহ্নিত করা যায়। মিল্টনের কোমাস কাব্যে উল্লেখিত সেবান নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাব্রিনা ও তার বান্ধবী লাজিয়া মেঘনাদবধে এসছে বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গে আর ত্যাসোর Cerusalemme Liberta কাব্যের কুহকিনী আর্মিডা উপবনে বিলাসমত্ত রিনাল্ডের কাহিনীর বিনির্মাণ হয়েছে অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরীর বাইরে মেঘনাদের প্রমোদউদ্যান ও প্রমীলাকে কেন্দ্র করে, যেখানে প্রমীলা সর্বাংশে আর্মিডা নয় আর আর্মিডার উপবনের স্থানে উপস্থিত মেঘনাদের নিজস্ব প্রমোদউদ্যান। মেঘনাদ হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেবদেবীদের উল্লেখ মূল রামায়ণে নেই; কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে এ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে যা হোমারের ইলিয়াড কাব্যে উল্লেখিত জুপিটারপত্নী জুনো ও নিদ্রাদেব সমনাসের ষড়যন্ত্রের সাথে তুল্য। মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলা নারীত্বের কোমলতা ও শৌর্যের প্রতীক, যাকে ইলিয়াডে উল্লেখিত হেক্টরপত্নী এ্যান্ডোম্যাকি ও ত্যাসোর আর্মিডার সাথে তুলনা করা সম্ভব। ভার্জিলের ঈনিদ কাব্যের নায়ক ইনিয়স তাঁর পিতা অঙ্কাইসিসের নিকট থেকে যেরূপ ভবিতব্যদর্শন লাভ করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ঠিক এই রকম ভবিতব্য দর্শন লাভ করেন তার মাতার কাছ থেকে। মেঘনাদবধে লক্ষ্মণের চরিত্র দৈবানুগ্রহপুষ্ট নরাধমসদৃশ। নিরস্ত্র মেঘনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাতে সশস্ত্র লক্ষ্মণ যখন চেতনাহীন তখন মায়াদেবীর যত্নে কাপুরুষ লক্ষ্মণ চেতনা ফিরে পায় এবং মেঘনাদের প্রতি শর নিক্ষেপ করে। শরবিদ্ধ মেঘনাদ নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় যখন লক্ষ্মণের দিকে হাতের কাছে পাওয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহার ইত্যাদি ছুঁড়তে থাকেন তখন– 'মায়াদেবী মায়া, বাহু-প্রসরণে, ফেলাইযা দূরে সবে, জননী যেমতি খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে করপদ্ম-সঞ্চালনে।' মায়াদেবীর সাহায্যে কাপুরুষ লক্ষ্মণের বেঁচে যাওয়া, ইলিয়াডে উল্লেখিত যেনেলাসের

প্রতি প্যান্ডরাস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর দেবী মিনার্ভা কর্তৃক ব্যর্থ করার সমতুল্য। মেঘনাদবধ কাব্যে এ রকম অনেক উপাদান পাওয়া যাবে, যা ইতঃপূর্বে লিখিত ঘটনার বিনির্মিত রূপ। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যের প্রচলিত সাহিত্য-বিশ্বাসে যে কোনো ধরনের কাহিনীর বিস্তার জন্ম-জন্মান্তর কালকেন্দ্রিক হলেও, মধুসূদন দত্ত তাঁর কাব্য শুরু করেছেন পৌরাণিক রামায়ণের ঘটনাবিন্যাসের মধ্যবিন্দু থেকে। কাঠামোবাদী ও উত্তর-কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী, যে কোনো সাহিত্যকর্মের যে কোনো পর্বে একজন পাঠক পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই প্রবেশ করে অর্থ উদ্ধার করতে পারেন। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য সৃষ্টির বেলায়ও রামায়ণের মধ্যপর্বে প্রবেশ করেছেন আর উপস্থাপন করেছেন এক নতুন বিনির্মিত অসাধারণ সাহিত্যকর্মকে।

দেরিদার বিনির্মাণ দর্শন অনুযায়ী, যে-কোনো সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা অসীমের দিকে প্রবাহিত, যাকে text-এর free play বা মুক্ত-ক্রীড়া বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষের অস্তিত্ব যেহেতু ভাষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাই বিনির্মাণের সাথে সাথে
মানুষের অস্তিত্বকেন্দ্রিক উপলব্ধিসমূহ ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বই হয়ে ওঠে একটি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উপাদান। এ প্রসঙ্গে 'প্রথম দিনের সূর্য' নামক কবিতাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে দেরিদার বিনির্মাণ ও অস্তিত্ববাদী সাহিত্যতত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করা সম্ভব। মৃত্যুর এগারো দিন আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ছিল:

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নতুন আবির্ভাবে,–
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়–
কে তুমি।
পেল না উত্তর॥

কবিতাটি অবশ্যই দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু অসাধারণ ব্যঞ্জনা ধারণ করে পাঠকের অনুভূতিকে উপস্থিত করে বিভিন্ন মাত্রায়। কবিতাটি সম্পর্কে কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের ব্যাখ্যা– 'সত্তার নতুন আবির্ভাব'-এর অন্তর্গত 'সত্তা' অস্তিত্বের পরিচয়বহ, আর উদ্‌গত কোনো এক নতুনতর খণ্ডের মধ্যে চিরপ্রবাহী অস্তিত্বের এই আবির্ভাবকে নিয়ে প্রথম দিনের সূর্যের প্রশ্ন। আবার নিজ অস্তিত্বের সূত্র ধরে এ জিজ্ঞাসা চলে যায় সর্বময় সত্তা স্বভাবের প্রতি। তখন ব্যক্তিবিন্দু থেকে এই

রহস্যোপলব্ধি আবার সরে যায় ব্যাপ্ত বহির্মুখে, কবিতাটি মুক্তি পেয়ে যায় বিশ্বতোমুখ জ্যোতির্ময়তার মধ্যে। নিজের এবং নিজের বাইরের অস্তিত্বের যে সমজাল বিকীর্ণ আছে, তাকে ক্রমশই সরে যেতে দেখেছেন বিস্মিত অন্ধকারে, সেই অস্তিত্বের পরম শেষ পর্যন্ত রহস্যময় থেকে যাচ্ছে তার কাছে, হয়তো সব কবির কাছেই থেকে যায় তাই। আধুনিক মন প্রবল সায় পায় এই কবিতায়, যে আধুনিক মন জানে সে নিজেই নিজের কাছে অন্তহীন রহস্য, আপনাকে এই জানা তার ফুরায় না। কবির অন্তিম সময়ে এক নতুন বিপন্নতার বোধ এখানে আরক্তিম হয়ে উঠেছে। নিরবধি 'নীরব শূন্যতা আমারে কাঁপায়'– পাস্কালের এই ভীষণ নীরবতার চিহ্ন তার মনকে এখন অধিকার করে নিতে চাইছে। অংশের উত্তর আছে পূর্ণের মধ্যে, এক মুহূর্তের জন্য যখন এ আশ্বাস অসম্পূর্ণ লেগেছে 'কবির কাছে তখনই জীব'-খণ্ড দাঁড়াতে পারল তার নিজের রহস্যে, নিজের প্রতিষ্ঠায়, নিজের মহিমান্বিত উত্তরহীনতার মাঝখানে।'

প্রজ্ঞাবান প্রাবন্ধিক আবু সায়ীদ আইয়ুবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, "কবিতাটির মূলে রয়েছে একটি প্রশ্ন 'কে তুমি?' কী তুমি বা কেন তুমি নয়, কে তুমি? প্রশ্নটি সনাক্তের, আইডেনটিটির– এতগুলি লোকের মধ্যে কোন বিশেষ লোকটি তুমি, এমন কী পরিচয় আছে তোমার যাতে অন্য দশ জনের মধ্যে তোমাকে, একমাত্র তোমাকেই চেনা যায়? এ প্রশ্ন ব্যক্তিবিশেষকেই; ব্যক্তিবিশেষকেই করা হয়েছে কবিতাটিতে। সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। সৃষ্টি বা স্রষ্টা বিষয়ে কোনো অজ্ঞাবাদ এখানে ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত হয়েছে একজন ব্যক্তির অসম্পূর্ণ পরিচয়ের আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠার বেদনা।"

দেরিদার বিনির্মাণ অস্তিত্ববাদী সাহিত্যতত্ত্বকে গ্রাহ্য করে কবিতাটির কিছু নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। লেখকের ব্যাখ্যায়, প্রশ্নচিহ্নহীন প্রশ্ন-সংবলিত কবিতাটিকে দুটো পর্বে ভাগ করা সম্ভব, যার মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করে একটি কালকেন্দ্রিক বা temporal বাক্য– 'বৎসর বৎসর চলে গেল'। একথা ভাবা যেতে পারে যে, কবিতার উল্লিখিত দুটো পর্বকে কেন্দ্র করে অস্তিত্ব/ অনস্তিত্ব (being/nothingness) আর চেতন/অবচেতন (conscious/sub-conscious) যুগ্ম-বৈপরীত্যদ্বয়ই ক্রিয়াশীল। কবিতাটির প্রথম পর্বের প্রথম বাক্য 'প্রথম দিনের সূর্য' আর দ্বিতীয় পর্বের প্রথম বাক্য 'দিবসের শেষ সূর্য' এক ও অভিন্ন সত্তা, এ কথা ভাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? কালকেন্দ্রিক মধ্যবাক্য (বৎসর বৎসর চলে গেল) দিয়ে বিভাজিত দুটো পৃথক সত্তাকেই কবিতায় উন্মোচন করা হয়েছে 'যার মূলে রয়েছে অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব কিংবা চেতন/অবচেতনের দ্বন্দ্ব। প্রথম দিনের সূর্যরূপে কল্পিত অস্তিত্বশীল বা চেতন সত্তা তার বিপরীত সত্তাকে, অহংস্বরূপ উদ্ধারের জন্য যে প্রশ্নচিহ্নহীন অতীন্দ্রিয় 'কে তুমি' প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, তার উত্তর মেলেনি। সময়কেন্দ্রিক মধ্যপ্রবাহের ফলে এক সময় অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব বা চেতন/অবচেতন যুগ্ম-বৈপরীত্যের শ্রেণীমর্যাদার বিচ্যুতি ঘটে। এবার অনস্তিত্বশীল কিংবা অবচেতন সত্তা তার বিপরীত সত্তাকে আরো একটি প্রশ্নহীন 'কে তুমি' প্রশ্ন উত্থাপন করে, কিন্তু উত্তর পাওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে কবিতার দুটো পর্বেই একই ধরনের প্রশ্নচিহ্নহীন প্রশ্ন থাকলেও উত্তর হিসেবে 'মেলেনি উত্তর' আর 'পেল না উত্তর'-কে পাওয়া যায়। একই মাত্রার প্রশ্নের বিপরীতে দুটো ভিন্ন মাত্রার প্রকাশ (নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট), দুটো ভিন্ন সত্তার উপস্থিতি ও চরিত্রকে চিহ্নিত করে। কবিতাটির বিনির্মিত ব্যাখ্যায় অনস্তিত্ব বা শূন্যতার প্রাধান্য লক্ষ করার বিষয়। সত্তার নতুন আবির্ভাবের উত্তরহীন কোলাহল পেরিয়ে 'পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়'

যে বিপরীত সত্তা উত্তরহীন স্তব্ধতায় অবস্থান নেয়, সে 'নিস্তব্ধতা' ও 'সন্ধ্যার' সাথে একাকার হয়ে শূন্যতা বা nothingness প্রকাশ করে, আর জীবনের সাথে শূন্যতা বা nothingness-এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠভাবে। শঙ্খ ঘোষের 'অহং-রহস্য' কিংবা আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস' হয়তো-বা কবিতাটিতে অবস্থান করছে, তবে conscious/unconscious-এর বৃত্ত ছাড়িয়ে being আর nothingness-এর দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াই কবিতাটির মুখ্য উপাদান, এ কথা বলা বোধহয় অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনায় আমরা মানবিক যৌথ অচেতনের উপাদান 'প্রত্ন-চিন্তা', 'পুরাণ', 'ধর্ম-দর্শন' এবং 'আধুনিকতা'-কে খুঁজে পাব। তাঁর গদ্যসাহিত্য ও কবিতা/কাব্যে আমরা তাই আউল, বাউল, সহজিয়া দর্শন এবং বেদ, উপনিষদ, 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-এর তত্ত্ব ও পুরাণকে বারবার ঘুরে ফিরে আসতে দেখি। কাঠামোবাদ ও প্রত্নগঠন/পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব ও বিনির্মাণ দিয়ে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন কাব্যনাট্যটি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যাবে দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে সুখ/দুঃখ, জয়/পরাজয়, অহিংসা/হিংসা, ধর্ম/অধর্ম, প্রশংসা/নিন্দা, ঔদার্য/হীনতা ইত্যাদির মতো মানবিক গুণাবলির শ্রেণী-মর্যাদা বা hierarchy-র উগ্র বিচ্যুতি ঘটানো হয়েছে, ফলে দুর্যোধনের চরিত্র হয়ে উঠেছে মহান ও বীরতুল্য। আমরা আরো দেখতে পাব, ধর্ম/অধর্মকে বোঝার পরেও ধৃতরাষ্ট্র ভালোবাসার কাছে পরাজিত, কারণ তিনি পিতা। একজন পিতার ভালোবাসাকেন্দ্রিক সামাজিক ও মানবিক উপলব্ধি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় বিচারকেও পাঠকের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে ন্যায় বিচার হিসেবেই উপস্থিত করতে চায়। পুত্রের প্রতি গান্ধারীর ঘৃণা আর দ্রৌপদীর প্রতি গান্ধারীর ভালোবাসা, ইদিপাস-এষণার প্রচলিত রূপকে গ্রাহ্য করে না। ধৃতরাষ্ট্র/ দুর্যোধন, গান্ধারী/দুর্যোধন আর গান্ধারী/দ্রৌপদীর সম্পূরক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট গান্ধারীর আবেদন কাব্যের বিনির্মিত উপলব্ধি কৌরব পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যহীনতাকেও উপস্থাপন করে বিভিন্নভাবে।

আমরা যখন জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি, তখন তার 'অন্তরের ফসিল' কিংবা 'অচেতন মনের' টুকরো টুকরো উচ্চারণ আমাদের নিয়ে যায় কবির অচেতন সত্তায়, আর তাই আমরা ভাবতে পারি যে, জীবনানন্দকে সবচেয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায় মনোবিশ্লেষণী পদ্ধতিতে। জীবনানন্দের কবিতায় উপস্থিত 'অন্ধকার', 'আঁধার', 'রাত্রি', 'পেঁচা', ইত্যাদি আমাদের বলে যে তিনি ছিলেন জগৎ বাস্তবতায় একান্তভাবে নিঃসঙ্গ এবং তাঁর ব্যক্তিগত সময় ছিল ভীষণভাবে হতাশায় পরিপূর্ণ। হাজার বছর হাঁটার পর নাটোরের বনলতা সেন-এর সাথে দেখা হয়েছিল কবির, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে সেই স্নিগ্ধ কোমল বনলতা কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ছোট্ট একটা প্রশ্ন– 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' বনলতার এই আন্তরিক ছোটো উচ্চারণ 'সুখের প্রতীক' হয়ে পথহারা কবির অস্তিত্বকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল, কিন্তু কবির এই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বলার উপায় নেই। বনলতাকে বা সুখকে কাছে পেয়েও কবিকে বলতে শুনি– 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। কবি জীবনানন্দের 'ব্যক্তিগত সময়' বা 'অচেতন' ছিল হতাশায় জর্জরিত, আর তাই মাঝে মাঝে মনে হয় কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আর ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামের নিচে চাপা পড়ে কবির যে মৃত্যু হল, তা হয়তো-বা ছিল প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এক 'আত্মহত্যার' ঘটনা।

এত অন্ধকার আর এত রাত্রির পর, হাজার বছর হাঁটার পর, মৃত্যুই হয়তো-বা ছিল জীবনানন্দের 'পাখির নীড়', 'সুখ', কিংবা 'বনলতা সেন'।

কবি শামসুর রাহমান আমাদের সময়ের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর কবিতায় আমরা পাই নাগরিক জীবন, পুরনো ঢাকার 'ভাষার প্রভাবে' উর্দু-ফার্সি শব্দের উচ্চারণ, পশ্চিম-দেশীয় 'পুরাণের' প্রভাব এবং আধুনিক চিন্তা। প্রত্ন-কাঠামো/পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে আমরা উপস্থিত করতে পারি শামসুর রাহমানের ইকারুসের আকাশকে, যেখানে তিনি বলেন:

...তাই কামোদ্দীপ্ত যুবতীর মতো
অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রোদ্রের সমুদ্রে নিয়ে গেল। দ্বিধাহীন আমি উড়ে
গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোন রক্ষাকবচহীন
প্রার্থনার মতো।

শামসুর রাহমান তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' বিনির্মাণ করেছন রজার ম্যাকগাফের 'what you are' এবং অড্রিয়ান হেনরির 'without you' শিরোনামের কবিতা থেকে। এমন বিনির্মাণের চরিত্র আমরা রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ এবং শহীদ কাদরীর কবিতায়ও পাই, যা দেরিদীয় সাহিত্য ও হ্যারল্ড ব্লুমের তত্ত্বকে সমর্থন করে।

বাংলা উপন্যাস বিশ্লেষণেও আমরা সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের উপন্যাসের নায়ক, নায়িকা, ভিলেন, ভারসাম্য, ভারসাম্যহীনতা, মিলন-বিরহ ইত্যাদি কাঠামোবাদগ্রাহ্য সত্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস লালসালু আমাদের সমাজকে উপস্থিত করেছে, যেখানে ধর্ম-ব্যবসা উপস্থিত এক 'অস্তিত্ববাদী' ও 'অমানবিক' উপাদান হিসেবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 'যে কোনো পাপ' কিংবা 'লোক ঠকানো' জায়েয, এমন একটা 'যৌথ অচেতনের' ব্যাপার আমরা উপন্যাসটিতে পাই। আমাদের সমাজে সেই প্রাচীনকাল থেকেই গুরুবাদ, পীরতন্ত্র উপস্থিত ছিল এবং এখনো তা অবস্থান করছে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। আমরা ব্যাপারটি জানি, কিন্তু তা প্রতিরোধ করি না, আমাদের 'যৌথ অচেতনে' অবস্থানকারী 'ধর্ম-ভয়'-এর কারণে। লালসালু উপন্যাসের মজিদ চরিত্র 'অস্তিত্ববাদী' এবং সে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা বলে, ধর্মের নামে ধর্ম-ব্যবসা করে। মহব্বতনগর গ্রামের লোকজনও 'অস্তিত্ব' রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু যখনি তারা অসহায়, ঠিক তখনি 'ধর্ম' তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনায়। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদের 'অস্তিত্ব' রক্ষা হয়, সম্পদের মালিক হতে তার দেরি হয় না। উপন্যাসটিতে মজিদ, রহিমা ও জমিলাকে কেন্দ্র করে আমরা মনস্তাত্ত্বিক ইদিপাস ও ইলেক্ট্রা-এষণাকে শনাক্ত করতে পারি, বিশেষ করে সতীন হওয়া সত্ত্বেও রহিমা এবং জমিলার সম্পর্ক অনেকটা মা ও মেয়ের মতো। ধর্ম/প্রকৃতি, এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের উগ্র-বিচ্যুতি আমরা দেখতে পাই উপন্যাসটিতে। হঠাৎ করে শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হলে গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে দেখতে পাই হাহাকার, প্রকৃতির অবস্থান হয় ধর্মের উপরে। মজিদের কাছে মানুষ প্রতিকার চায়, কিন্তু শোনা যায় কিছু ধর্ম-বাণী– 'নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কেল রাখো।' মজিদের এই logocentric অহং একসময় তার পারিবারিক জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে।

বিধ্বস্ত ফসলের ক্ষেত আর মানুষের হাহাকার নিয়ে শেষ হয় যৌথ অচেতনের কাঠামোভিত্তিক লালসালু উপন্যাসটি ।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মাঝে একটি । উপন্যাসটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে মানুষ, প্রকৃতি, নদী ও জীবনসংগ্রামের উপাদানসমূহকে । উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্রে অবস্থান করছে হোসেন মিয়া, কুবের, কপিলা চরিত্র । হোসেন মিয়া একজন অসাম্প্রদায়িক সর্বজনগ্রাহ্য চরিত্র, কিন্তু মার্কসবাদী চিন্তায় তাকে সাম্রাজ্য বিস্তার-এর স্বপ্নে বিভোর একজন মানুষ হিসেবেই দেখা যায় আর নতুন উপনিবেশ হিসেবে উপস্থিত হয় ময়না দ্বীপ । উপন্যাসটিতে উপস্থিত মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলোও বিশ্লেষণযোগ্য, বিশেষ করে কুবের ও কপিলার সম্পর্ককে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ।

অনুচিন্তন

ভাষাভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগ সম্পর্কে যা উপস্থাপিত হল, তা কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । প্রতিটি সাহিত্যতত্ত্ব আলাদাভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে । বাংলা কবিতা, কাব্য ও উপন্যাস নিয়ে যে আলোচনা সমালোচনা করা হল, তা-ও আংশিক বা খণ্ডিত । প্রতিটি একক সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্লেষণসহ বাংলা সাহিত্যকর্মের আলোচনাও এই প্রবন্ধে যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়নি বলে লেখক মনে করে । আমাদের দেশে সাহিত্য-আলোচনায় আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের ব্যবহার খুব একটা হয় না । আমরা এখনো ধ্রুপদী বা নতুন সমালোচনা নিয়েই ব্যস্ত । প্রবন্ধটি আলোচক-সমালোচকদের আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবে এবং আমরা সাহিত্য-সমালোচনায় আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব ব্যবহার করব, এ আশা অবশ্যই করা যায় ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জাক লাকাঁ বা পিতৃনামের পরাক্রম', 'এক্ষণ', ১৩৯৮ ।
২. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জাক দেরিদা বা দর্শনের আত্মহত্যা', 'এক্ষণ', ১৩৯৫ ।
৩. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'লিভারপুল কবিকুল', 'প্রান্ত', ১৯৯০ ।
৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, দেশ পাবলিশিং, ১৯৮৪ ।
৫. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, পাঠক সমাবেশ ১৯৯৭ ।
৬. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৪ ।
৭. সৈকত হাবিব, সম্পাদনা, বনলতা সেন, ষাট বছরের পাঠ, কথাপ্রকাশ, ২০০৪ ।
8. Heidegger, Martin, On way to the Language, Harpper & Row, 1971.
9. Lentrechia, Frank, After New Criticism, Athlone Press, 1980.
10. Lodge, David, Modern Criticism and Theory, Longman, 1988.
11. Norris, Christopher, The Deconstructive Turn, Methuen, 1984.
12. Ray, William, Literary Meaning, Basil Blackwell, 1986.
13. Rice, P. Waugh, P. Modern Literary Theory, Edward Arnold, 1987.
14. Selden, Raman, A Guide to Contemporary Literary Theory, Harvester Press, 1986.

সৃষ্টি ও দেশ-কাল

পূর্বকথা

দেশ বা স্থান নিয়ে আমাদের ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট, কারণ আমাদের চারপাশে যে বস্তুসমূহ আমরা দেখি তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা নিয়ে আমাদের মনে কোনোরকম সংশয় কাজ করে না। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুর রূপ ও স্বরূপ বুঝি, আর আমাদের নিজস্ব দেহের সাথে তুলনা করেই আমরা বলি– 'এটি ছোট', 'ওটা বড়' কিংবা 'ঐটা বিশাল'। 'কাছে' আর 'দূরে'– এই শব্দ দুটিও আমাদের বুঝিয়ে দেয় বস্তুটির 'দেশ-মাত্রা' বা আয়তন সম্পর্কে। সূর্য আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে, দেখতে ছোট লাগলেও সূর্য যে আসলে বিশাল তা বুঝতে আমাদের পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে হয় না। কাছে ও দূরের আপেক্ষিকতা আমরা আমাদের সজ্ঞা, প্রজ্ঞা আর জ্ঞান দিয়েই বুঝে নিতে পারি। আমরা এটাও বুঝি যে, 'দেশ বা স্থান' হল বস্তুর বিন্যাসজাত তল আর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা হল বস্তু-বিন্যাসের মাত্রা। কিন্তু এটাও সত্য যে আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে অনেক সময় আমাদের পরিচিত পৃথিবীর অনেক বস্তুর 'দেশ-মাত্রা' বুঝতে পারি না। আমরা আকাশ দেখি, বলি বিশাল আকাশ, কিন্তু মহাজগতের অংশ হয়ে আকাশ যে কত বড় তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়। একটি বালুকণাকে আমরা ক্ষুদ্র বলি, চুলের প্রস্থকে বলি 'অতি ক্ষুদ্র', কিন্তু জীবাণু, অণু, পরমাণু ইত্যাদি কতটা ক্ষুদ্র তা আমাদের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বোঝার উপায় নেই। আসলে আমরা সবাই বাস করি এক 'সাধারণ-জ্ঞানের' বিশ্বে, যা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রাহ্য নয়, এমন সব বস্তুর 'দেশ বা স্থান' নিয়ে কিছু বলতে গেলেই আমাদের মুখের ভাষা আর কাজ করে না। আমরা গণিত দিয়ে বোঝাতে চাই বস্তুর ক্ষুদ্রত্ব বা বিশালত্বকে।

দেশ বা স্থান-এর সাথে যদি সময় বা কাল যোগ হয় তবে আমাদের 'সাধারণ-জ্ঞানের' পৃথিবী বেশ এলোমেলো হয়ে যায়, কারণ বস্তুর 'দেশ-মাত্রা'র সাথে 'সময় বা কাল মাত্রা'-কে এক করে দেখা সাধারণ-জ্ঞানের কাজ নয়। আর সত্য বলতে গেলে সময় বা কাল সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তা মোটামুটি মনস্তাত্ত্বিক, কারণ আমাদের এমন কোনো ইন্দ্রিয় নেই যা দিয়ে সময় বা কালকে ধরে দেখা যায়। তবে সময় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি হলেও, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে তা মাপতে চেষ্টা করি, আর এই পরিমাপ প্রক্রিয়ায় আমরা নিয়ে আসি বস্তুর তুলনামূলক অবস্থানকে। বস্তুর তুলনামূলক অবস্থান আমাদের সময় সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং এ কারণে পূর্বের আকাশে সূর্য দেখলে আমরা বলি– 'ভোর', মাঝ আকাশে সূর্য দেখে বলি– 'দুপুর হয়েছে', আর পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেলে বলি– 'সন্ধ্যা হল'। আমাদের হাতে যে ঘড়ি পরি তা কিন্তু আসলে সময়কে দেখায় না, বরং ঘড়ির কাঁটা একটি ৩৬০ ডিগ্রি 'দেশের' বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে আমাদের সময় সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয় মাত্র। ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সময়কে বুঝতে হলে আমাদের বস্তুর বিন্যাস বা দেশকে তুলনামূলক বিচারে আনতে হয়। এমনকি আমাদের জীবন নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি কিংবা জীবনের বিভিন্ন স্তর যখন ভিন্ন জৈবিক উপাদান নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সময় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবমান সত্তার কোষ-ক্রোমোজম-কেন্দ্রিক বিবর্তন আমরা ভালো করেই বুঝি আর এই বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যে সময় কাজ করছে তা-ও স্বীকার করে নেই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে। যেদিন মৃত্যুর 'সময়' আমাদের 'জৈবিক দেশ'-কে কেড়ে নেয়, আমাদের মৃত্যু হয়, ঠিক তখনি শেষ হয়ে যায় একজন ব্যক্তি-মানুষের 'দেশ-কাল'। এখানে বলা প্রয়োজন যে কোনো জৈব কিংবা অজৈব বস্তুর বিবর্তন বা নতুন বিন্যাস আসে (যা দেশকে কেন্দ্র করে হয়) কোনো একটি একক কিংবা যৌথ ক্রিয়ার ফলে। 'সূর্য ওঠা', 'সূর্য ডোবা', 'জন্ম হওয়া', 'কাজ করা', 'ঘুমিয়ে থাকা', 'চুলে পাক ধরা', 'মরে যাওয়া' ইত্যাদি হল এমন সব ক্রিয়া যা একটি দেশের মাঝে বস্তুর নতুন বিন্যাস আনে এবং এই ক্রিয়াকেন্দ্রিক নতুন বিন্যাসই আমাদের কাছে উপস্থিত করে 'সময়' নামক ধারণাকে।

দেশ ও কালের সাথে 'ক্রিয়া'কে আনলেই আমাদের ভাবতে হয় 'অতীত' 'বর্তমান' আর 'ভবিষ্যৎ' নিয়ে। সময়ের এই তিনটি মাত্রা নিয়ে কিন্তু বেশ কিছু দার্শনিক সমস্যা রয়েছে। আমরা যদি ভেবে নেই যে 'দেশ'-এর মতো 'সময়'ও একটি ক্ষেত্র (কালক্ষেত্র) এবং তা স্থির, তবে 'অতীত' বা 'ভবিষ্যৎ' বলার কোনো অর্থই হয় না। আমরা এমন অবস্থায় শুধু বলতে পারি 'রবীন্দ্রনাথ আছেন রবীন্দ্রনাথের সময়ে', 'আমি আছি আমার বর্তমানে, যা আমার কাছে সত্য' এবং 'আগামীতে কিছু না কিছু থাকবে বা ঘটবে, যা আমার জানাই নেই'। আমি যদি বলি 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন' তবে তা স্থির 'কালক্ষেত্রের' প্রেক্ষিতে সঠিক বচন হবে না, কারণ স্থির সময়ক্ষেত্রের কোনো এক বিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ এখনো অবস্থান করছেন। আগামীতে কী হবে তা নিয়ে বলাও এক ধরনের 'মিথ্যা-বচন', কারণ আমাদের যা জানা নেই তা নিয়ে অযথা বলা উচিত নয়। আমাদের বর্তমান আমাদের কাছে সত্য এবং 'অতীত' ও 'ভবিষ্যৎ' নিয়ে আমরা যা বলি তা আসলে 'বর্তমান' কালেরই এক ধরনের প্রকাশ।

সময়ের ক্রিয়াকে চিন্তা-ভাবনায় এনে যদি আমরা বলি– 'সময় একটা প্রবাহ, বয়ে যাচ্ছে নদীর মতো'– তবে বাক্যটিকে আমাদের মনস্তত্ত্ব খুব সহজেই গ্রহণ করবে এবং এমন অবস্থায় আমরা বলতে পারব 'অতীত', 'বর্তমান' আর 'ভবিষ্যৎ' আছে। সময়ের প্রবাহ অতীত থেকে প্রবাহিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আগামীর দিকে, এমন চিন্তা-ভাবনার কারণেই যৌক্তিকভাবেই আমরা 'অতীত', 'বর্তমান' আর 'ভবিষ্যৎ' নিয়ে কথা বলতে পারি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়– 'সময় কোন গতিবেগে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর মতো'– তবে এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না। যদি গতিবেগই না-জানলাম তবে 'প্রবাহিত হয়'– এমন মিথ্যা বলব কেন? আসলে মানুষের মন তো সবসময় গণিত বা যুক্তি মানে না, আর তাই মনস্তাত্ত্বিক 'সময় প্রবাহের' গতিও থাকে না– এমন একটা চিন্তা-ভাবনা করেই আপাতত 'সময়প্রবাহকে' মেনে নেয়া যেতে পারে, আর তো কিছু করার নেই।

দেশ-কালের সাথে যদি বিশ-শতকের আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতা নিয়ে আসি তবে আমাদের পরিচিত 'সাধারণ-জ্ঞানের' পৃথিবী হয়ে যাবে ভীষণভাবে এলোমেলো। এই আপেক্ষিকতার জগতে গতির সাথে সময়ে সংকোচন/প্রসারণ হতে পারে, দেশ-কাল হতে পারে প্রচণ্ডভাবে আঁকাবাঁকা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব খুব সহজে উপস্থাপন করা যাবে না, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়, তবে খুব সহজে এ কথা বলা যায় যে আপেক্ষিক তত্ত্বে দেশ ও কাল সবসময় দ্রষ্টার গতির ওপর নির্ভর করে। আমাদের পরিচিত বিশ্বের কোনো বস্তুই স্থির নয়,

মহাবিশ্ব আর অণুবিশ্বের (atomic world) সমস্ত বস্তু/কণা কোনো এক নির্দিষ্ট গতি নিয়ে চলছে এবং এ গতির কারণেই কোনো অণুজাগতিক বা মহাজাগতিক ক্রিয়া ঘটনা একই সাথে ঘটছে তা বলা যায় না। আর কোনো বস্তু যদি আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছে, তবে সেই বস্তুর, দেশ-কাল অন্য কোনো গতিশীল বস্তুর সাথে আপেক্ষিকভাবেই নির্ণয় করতে হবে এবং এমন অবস্থায় দেশ-কাল-এর সংকোচন কিংবা প্রসারণও ঘটতে পারে। তবে আমাদের পরিচিত বিশ্বের বস্তু-সমারোহে যেহেতু গতির সীমাবদ্ধতা কাজ করে, সেহেতু আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাব আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারি না। তবে আপেক্ষিক তত্ত্বে উল্লিখিত আলোর চরম/পরম গতিকে ধ্রুবক মেনে, নান্দনিক চিন্তা-চেতনা নিয়ে আমরা গাইতে পারি– 'আলো আমার আলো ওগো, আলোয় ভুবন ভরা'।

আমাদের দেশ-কাল

দেশ ও কাল নিয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে, কিন্তু তারপরেও দেশ ও কালের উপলব্ধি/সংবেদ নিয়ে আরও কিছু বলা দরকার। আমরা জন্মের পর বসবাস করি আমাদের পরিচিত পরিবেশে, যা গড়ে ওঠে আমাদের সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান আর চেতনা-কাঠামোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আমরা আমাদের এই পরিচিত পরিবেশকেই বলি 'সাধারণ-জ্ঞানের' পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সজ্ঞা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান বা চেতনা-কাঠামো বিভিন্ন মাত্রায় থাকার কারণে 'আমি', 'তুমি' আর 'সে'-এর পৃথিবী কখনো এক হয় না। আর প্রতিটি মানুষের 'সাধারণ জ্ঞানের' পৃথিবী বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করার কারণে তাদের 'দেশ-কাল' মাত্রাও মনস্তাত্ত্বিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকে। তবে দেশ-কাল নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবস্থান করে তাকে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সাধারণ জ্ঞানের দেশ-কাল:

জন্মের পর দেশ ও কাল সম্পর্কে ধারণা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ হয়ে উপস্থিত থাকে। নিজের সাথে মা, বাবা, পরিবার ও পরিবেশের সংঘাতই দেশ-কাল নিয়ে আমাদের ধারণা হয়। দেশ ও কালের ধারণা অভিজ্ঞতাপূর্ব– এমন কথাও অনেক দার্শনিক বলেছেন। জন্মের পর আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বাড়ার সাথে সাথে আমরা দেশ-কাল ও আপেক্ষিকতা নিয়ে কিছু ধারণা বা Concept তৈরি করে নেই এবং এ ধরনের Concept নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, পরিবেশ ইত্যাদি আপেক্ষিক আমাদের দেশ-কালকে নতুন নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। নিম্নবিত্তের একজন মানুষের কাছে ২০০ বর্গফুটের একটা ঘর 'বড় বাড়ি' হিসেবে গ্রাহ্য হলেও মধ্যবিত্তের জন্য তা হবে ১২০০ বর্গফুট আর উচ্চবিত্তের জন্য তা ৪০০০ বর্গফুটও হতে পারে। একজন নিম্ন-আয়ের মানুষ বাসে চড়ে কোনো জায়গায় একঘণ্টা পর পৌঁছে বলতে পারে– 'খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম', কিন্তু একজন বিত্তবান তার পাজারো গাড়িতে চড়ে একই জায়গায় ২০ মিনিটে পৌঁছে উচ্চারণ করতে পারে– 'দেশের অবস্থা যে কী হল, এখানে পৌঁছতেই ২০ মিনিট সময় নষ্ট হয়ে গেল।' আমাদের সাধারণ-জ্ঞানের পৃথিবীতে দেশ-কাল নিয়ে কিছু ধ্রুবকও উপস্থিত থাকে। সাধারণ জ্যামিতি ও পাটিগণিতের জ্ঞান বস্তুর দেশ-কাল

নিয়ে কিছু সার্বজনীন মাত্রা আনতে পারে আর আমরা বুঝতে পারি 'মিটার-কেজি-সেকেন্ড' বলতে কী বোঝায়।

২. গাণিতিক দেশ-কাল:

গাণিতিক দেশকাল সবসময় সাধারণ-জ্ঞানের বিশ্বে উপস্থিত থাকে না, কারণ বিষয়টি হল মহা-বিশ্ব (Cosmic world) আর অণুবিশ্ব (atomic world)-এর বিষয়। এখানের দেশ-কাল প্রচণ্ডভাবে আপেক্ষিক আর আলোর গতির আপেক্ষিকতায় দৃশ্যত আঁকাবাঁকা। একটি পরমাণুর ভেতরে যে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি আছে এবং কণা-কোয়ান্টাম তত্ত্বের আওতায় যে সব কণা (যেমন: আপ-কোয়ার্ক, ডাউন-কোয়ার্ক, গ্লুয়ন ইত্যাদি) অবস্থান করে, তাদের দেশকাল বর্ণনা করতেই গাণিতিক দেশ-কাল-এর জটিল গণিত ব্যবহার করা হয়। নিউটন, আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, হকিংস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান-চেতনাকে বুঝতে হলে এই গাণিতিক দেশকালকেও বুঝতে হবে। তবে একজন মানুষ ইচ্ছে করলে সাধারণ-জ্ঞানের পৃথিবী থেকেও তার নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে গাণিতিক দেশ-কালকে বুঝতে পারে। গাণিতিক দেশ-কালের সব গণিত-সত্য যে ধ্রুবক, তা কিন্তু নয়। পার্থিব সময়কে কেন্দ্র করে গাণিতিক দেশ-কালের গণিত নতুন বিন্যাসে আসতে পারে এবং এ কারণে বলা যায় গাণিতিক দেশ-কালের গণিতও মিথ্যাপ্রতিপাদনযোগ্য।

৩. জৈবিক দেশ-কাল:

মানুষের জীবন বা সচল দেহ যে দেশ-কালের উপাদান তা আমরা বুঝতে পারি, আর তাই আমাদের বাউল কবির গান–

> 'মন আমার দেহ ঘড়ি
> সন্ধান করি বানাইয়াছে কোন মিস্তরি
> একটা চাবি দিয়া দিছে ছাইড়া
> জনম ভইরা চলতে আছে'

মানুষের জন্মের পরপরই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি জীবনের উপাদান হয়েই মানবদেহে উপস্থিত থাকে, আর আমরা আমাদের দেহ-ঘড়ি'র সময়কে বুঝে নিয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা ইত্যাদির মতো জৈবিক উপাদানসমূহকে তৃপ্ত করতে সচেষ্ট হই। শিশুবয়সে আমাদের একমাত্র আশ্রয় থাকে 'মা' এবং জৈব-দেহের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনার সবকিছুই মা'কে কেন্দ্র করেই তৃপ্ত হয়। ঠিক ঐ সময় আমরা তৈরি করে নেই একজন প্রতীকী-আমি-কে, যা পরবর্তীকালে দেশ-কাল-মাত্রার এই পৃথিবীতে অবস্থান করে এক অতৃপ্ত 'আমি-সত্তা' হিসেবে। আমরা যখনি আমাদের যৌবনে উপস্থিত হই, তখন আমাদের যৌনতাসহ সব ধরনের কামনা-বাসনা ইচ্ছেমতো তৃপ্ত করতে পরি না বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশজাত কারণে, আর এর ফলে 'সময়ের' সাথে 'কামনা-বাসনা'র সংঘাত অনিবার্যভাবেই উপস্থিত হয়। 'সময়ের' সাথে আমাদের 'কামনা-বাসনার' এই সংঘাতই হল 'অবদমন' যার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে যায়

অচেতনে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা বুঝতে পারি আমাদের দৈহিক পরিবর্তন, আমরা যে মৃত্যুর দিকে ধাবমান এক 'সময়-গ্রাহ্য' সত্তা তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। শরীরের কোষ-ক্রোমোজমের ক্ষয়, চুলের রঙ সাদা হয়ে যাওয়া, সব ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অক্ষমতা ইত্যাদি আমাদের জৈবিক দেশ ও কালকে মূর্ত করে তোলে। জীবন যে একটা ঘড়ি এবং এ ঘড়ি যে একদিন থেমে যাবে, এ চিন্তায় অনেক সময় আমাদের মনে উপস্থিত হয় অধিবিদ্যাজাত উপলব্ধি, সবকিছুর হিসাব মিললেও জীবনের হিসাব মিলে না কিছুতেই।

৪. ব্যক্তিগত দেশ-কাল:

ব্যক্তিগত দেশ-কালের অবস্থান আমাদের মনে, কিংবা সমকালীন বিজ্ঞান গ্রাহ্য করে বলা যায় আমাদের মস্তিষ্ক-নিউরোনে। 'সাধারণ জ্ঞানের' পৃথিবীতে থেকে ও দেশকাল গ্রাহ্য করে একজন মানুষ যখন তার 'জৈবিক দেশ-'কালের' সমস্ত কামনা-বাসনাকে পূর্ণ বা তৃপ্ত করতে পারে না, ঠিক তখনই এক অবদমিত কামনা-বাসনার 'দেশ-কাল' তৈরি হয় মানুষের অচেতন মনে। আমরা যেহেতু আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা, পাওয়া, না-পাওয়া, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির মতো উপলব্ধি-সংবেদকে শুধুমাত্র ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করি বা বুঝি, তাই আমাদের 'অচেতন' ও ভাষা দিয়ে তৈরি। আমাদের অচেতনের 'দেশ-কালে' যদি প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টি নিয়ে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে ওখানে আছে যৌন অবদমন, পাওয়া না-পাওয়ার সংঘাত, মানবিকতা আর অমানবিকতার দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার অসমাপ্ত ভাষ্য।

মানুষের অচেতন মনের 'দেশ-কাল' যে সবসময় অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে তা নয়। এই অচেতন মনের সচেতন প্রকাশ নিয়ে আসতে পারে মনোরোগ, দিবা-স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসি, অসামাজিক অহংবোধ, অধিতাত্ত্বিক উপলব্ধি, আত্মহত্যার বাসনা, বিকৃত কাম, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির মতো মানসিক বা ব্যক্তিগত দেশকাল। তবে অবদমিত কামনা-বাসনার স্বপ্নরূপ আর ফ্যান্টাসি অনেক সময় একটা মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। না-পাওয়ার বেদনাকে একজন মানুষ তার অচেতন থেকে তুলে এনে 'নতুন করে পাওয়ার' আনন্দে নতুন সৃষ্টি করতে পারে। যে মানুষ তার অচেতনের অবদমিত কামনা-বাসনার যন্ত্রণাকে নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে তৃপ্ত করতে চায়, তাকে আমরা বলি স্রষ্টা।

সৃষ্টির যন্ত্রণা ও দেশ-কাল

সৃষ্টির জন্য যন্ত্রণা থাকতেই হয়, তা সে স্রষ্টা ঈশ্বরই হোক, মানুষই হোক কিংবা প্রকৃতিই হোক। প্রসববেদনা ছাড়া সন্তান যে পৃথিবীর মুখ দেখে না, এ সত্য তো মানুষ মাত্রই জানে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে– 'যন্ত্রণাটা কিসের?' উত্তর একটাই আছে, তা হল, অচেতনে অবদমিত কামনা-বাসনার বিষাক্ত ছোবল। ঈশ্বর যদি এই বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, যদি তার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়ে থাকে দেশ-কাল, গ্রহ-নক্ষত্র, পালসার, কোয়াসার ইত্যাদি, তবে বলতেই হবে ঈশ্বর স্বয়ং ছিলেন মানসিকভাবে প্রচণ্ডমাত্রায় অবদমিত। এ অবদমন হয়তো ছিল একাকিত্বের, কিংবা এমনও হতে পারে অন্ধকার ছাড়া আলোকিত ঈশ্বরের কোনো মূল্যই ছিল না।

ঈশ্বর প্রসঙ্গ যখন এল তখন বিশ্ব-সৃষ্টি নিয়ে কিছু বলি। ধর্মতত্ত্ব বলে, আদিতে শব্দময় একক ছিল। তিনি বললেন– 'হও', আর তার আদেশেই সৃষ্টি হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। মীমাংসা

দর্শনে বলা হয়েছে, দৈবী বাক্ (ধ্বনি)-ই আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্মা ও বাক্ এক ও অভিন্ন সত্তা। উপনিষদে বাক্-রূপ ব্রহ্মকে আকাশের মতো বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। আর যে-কোনো সৃষ্টির প্রেক্ষাপটেই যেহেতু ঋণাত্মক ধনাত্মক অস্তিত্বের সংঘাত প্রয়োজন, বিলীনতা প্রয়োজন, তাই সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ ও প্রকৃতি (নারীসত্তা), শিব (পুরুষ) ও শক্তি (নারী), এডাম ও ঈভ কিংবা আদম ও হাওয়া। পুরুষ (পজেটিভ) আর নারী (নেগেটিভ), ভাষাকেন্দ্রিক এই চিন্তা-চেতনা থেকেই জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্য (binary oppositions)। সৃষ্টির পেছনেও তাই কাজ করছে এক ধরনের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া, যেখানে চেতন আর অচেতন মনের সংঘাতই মুখ্য, আর এই সংঘাতকেই আমরা বলতে পারি 'সৃষ্টির যন্ত্রণা'। যদি আমরা বিজ্ঞান দিয়ে 'সৃষ্টির যন্ত্রণা'-কে বুঝতে চাই তবে দেখতে পাবো 'পজেটিভ' আর 'নেগেটিভ' শক্তির কারুকাজ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শুরু হয়েছিল এক 'বিগ-ব্যাংগ' দিয়ে। প্রথম তিন সেকেন্ডে কী ঘটেছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু তারপর থেকে বিশ্ব ক্রম-প্রসরমান; সৃষ্টির অভ্যন্তরে চলছে নিত্য-আমরা সৃষ্টির কারুকাজ, দেখতে পাচ্ছি আলো, আবার দেখছি কালো বিবরের অন্ধকার। যদি তাপ-গতিবিদ্যার (Thermodynamic)-এর দ্বিতীয় সূত্র গ্রাহ্য করি, তবে দেখতে পাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাড়ছে অসঙ্গতি (entropy), যাকে অবশ্যই 'সৃষ্টির যন্ত্রণা' বলা যায়।

মানুষ জন্মের পর হঠাৎ করেই উপস্থিত হয় এক যান্ত্রিক যন্ত্রণার পৃথিবীতে, যেখানে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মেটানোই হল জীবনের একমাত্র কাজ। জীবনের জৈবিক-দেশকালে এই ক্ষুধা-তৃষ্ণাই বারবার বিবর্তিত হয়। শিশুকালে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা মেটানোর দায়িত্ব মা নিলেও, যখন মা শিশুটিকে স্তন্যপান থেকে দূরে রাখতে চান, ঠিক তখনি শিশুটির অচেতনে এক ধরনের complex-এর সৃষ্টি হয়। একটি শিশুর ভাই/বোন-এর জন্মও এক ধরনের হিংসার উদ্রেক করে শিশু-অচেতনে। বাবা আর মা-এর মাঝে যে প্রেম ও ভালোবাসা থাকে, তা নিয়েও একটি শিশুর মনে ইডিপাস কিংবা ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স কাজ করতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের মনে বাসা বাঁধে যৌন ক্ষুধা/তৃষ্ণা এবং অন্যান্য অনেক চাওয়া/পাওয়ার উপাদান। কিন্তু বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক লিখিত/অলিখিত নিয়মকানুনের ফলে এবং অনেকসময় আমাদের অযোগ্যতার কারণেও, আমরা যা চাই তা পাই না। আর এ না-পাওয়া কামনা-বাসনাই অবদমিত হয়ে বাসা বাঁধে আমাদের অচেতনে। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষই এই অবদমিত কামনা-বাসনার অচেতন মন নিয়ে, এক পতিত-সত্তা হিসেবে তাদের দেশকালে অবস্থান করে এবং তাদের কর্মকাণ্ডে উপস্থিত থাকে মিথ্যা বিষয়ীগততা (pseudo-subjectivity), বাচালতা, বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রকাশ, ভণ্ডামি, মিথ্যা-অহংবোধ, পরচর্চা, অপরাধপ্রবণতা, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি। অবদমিত কামনা-বাসনার অস্থির অচেতন নিয়ে অনেকে আবার হয়ে যান মাদকাসক্ত, মনোরোগী, অসামাজিক সাইকোপ্যাথ কিংবা মানুষ নামের পশু।

তবে এ কথাও সত্য যে অবদমিত অচেতনের প্রকাশ অনেক সময় সৃষ্টিশীল হতে পারে এবং আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষই তাদের ব্যক্তিগত দেশকালের কোনো-না-কোনো সময়ে সৃষ্টিশীল হয়ে থাকে। আমাদের সবার মাঝেই আছে কবি, আছে শিল্পী, আছে সঙ্গীত, আছে ছন্দ, কিন্তু যে চেতন থেকে অচেতনের যন্ত্রণার প্রকাশ নন্দনতাত্ত্বিকভাবে করতে পারে, সেই হল স্রষ্টা। যে স্রষ্টা হয়, সেই হয় সৃষ্টির ঈশ্বর এবং সেই হয়তো বলতে পারে– 'আমিই ঈশ্বর', 'আনাল হক্'

কিংবা 'তৎ ত্বম অসি'। সৃষ্টির যন্ত্রণা নিয়ে একজন স্রষ্টা-মানুষ তৈরি করে তার ব্যক্তিগত সৃষ্টির দেশকাল, আর এই সৃষ্টির দেশকাল-এর উপাদান হয়:

ক. কবিতা
খ. গল্প-উপন্যাস
গ. চিত্রকলা
ঘ. ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প
ঙ. নাটক/চলচ্চিত্র
চ. সুরসৃষ্টি/সঙ্গীত
ছ. নৃত্যকলা
জ. আলোকচিত্র

উপর্যুক্ত সৃষ্টিগুলোর দেশ-কালকেন্দ্রিক চরিত্র কী, তা এবার দেখা যাক।

ক. কবিতা

কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে খুব সহজেই আমরা বলতে পারি– 'কবিতা হল এক নতুন ভাষায় নতুন সময় সৃষ্টি করা'। আমাদের সমাজ ও পরিবেশ যে ভাষা সময়-গ্রাহ্য করে উপস্থিত, তা কোনো অবস্থাতেই আমাদের চেতন-অচেতনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারে না। আর এটাও সত্য যে আমাদের সামাজিক ভাষা বহুলভাবে চর্চিত হয়ে কিছুটা ক্লিশে এবং এই ভাষার নন্দনতাত্ত্বিক চরিত্র সৃষ্টিশীল কিছু করার জন্য উপযুক্তও নয়। একজন কবি স্রষ্টাকে তাই পুরাতন সামাজিক ভাষা দিয়েই এ নতুন ভাষা সৃষ্টি করতে হয় এবং এই নতুন ভাষার ছন্দ তৈরি করে এক নতুন সময়। আমরা একজন কবির এই সৃষ্টিশীল নতুন সময়কে বলতে পরি 'আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ' নির্মাণ। কবিস্রষ্টার এই নতুন সময়ের উপাদান হয় তার অচেতনে রক্ষিত বিভিন্ন অবদমন এবং কবির চেতন-বর্তমানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সাথে অচেতন-জ্যামিতির সৃষ্টিশীল সংঘাত। একজন কবি যে 'আপেক্ষিক মিথ্যার জগৎ' তৈরি করেন, তা মেনে নিয়ে বোদলেয়ার (P. Baudelaire) বলেন 'Great poetry is essentially stupid; it believes', আর ইয়েটস-এর ভাষ্য হল– 'Poets are good liars...', একজন স্রষ্টা কবি কখনো কিছু বলে না, সে নতুন ভাষায় আমাদের সময় সৃষ্টি করতে চায়, আর এ কারণে পল ভ্যালেরি উচ্চারণ করেন– 'I did not want to say but wanted to make... it was this intention of making which wanted what I said...'. এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর মন্তব্য– '...poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling; it takes its origin from emotions recollected in tranquieity'.

একজন কবির অবদমিত কামনা, বাসনা, যৌনতা এবং পাওয়া না-পাওয়ার সংঘাত একটি কবিতায় নতুন ভাষার নতুন সময় আনে এবং এমন একটা সৃষ্টিশীল সময়ে অগ্রজ কোনো এক কবির প্রতি নতুন কবির ঈর্ষাও কাজ করে প্রচণ্ডভাবে। কবি আল মাহমুদ তার কবিতায় 'নতুন সময়, নতুন ভাষা' সৃষ্টি করেছেন জসীম উদ্‌দীন আর জীবনানন্দের দেশ-কালকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তিনি যে এক নতুন কাব্যভাষাও সৃষ্টি করেছেন, এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। অগ্রজ কবির প্রতি আল মাহমুদের সৃষ্টিশীল ঈর্ষা, আর যৌনতা, ইতিহাস সচেতনতা, পাওয়া না-

পাওয়ার সংঘাত ইত্যাদি আমরা তার কবিতায় পাই। নিচের উদাহরণগুলো পড়লেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন:

১. কখনো ভোরের রোদে শিশিরের রেণু মেখে পায়
সে পুরুষ হেঁটে যায় কুয়াশায় দেহ যায় ঢেকে,
আবার দুপুরে দেখি ঘুমিয়েছি প্রাচীর ছায়ায়
কী জানি কী স্বপ্ন নিয়ে কঠিন পাথরে মাথা রেখে,
সে এক অবাক লোক মুখ তার ধূসর ধূমল,
কোনো নারী কোনোদিন তার তরে মাখে নি কাজল।

২. চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়।

৩. বর্গীরা লুটছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।

কবি আল মাহমুদের 'সৃষ্টির যন্ত্রণা' এক 'নতুন ভাষায়' আমাদের 'নতুন সময়' উপহার দিয়েছে বটে, কিন্তু কোনো এক সময় এই কবির পতনও ঘটেছে জাগতিক মিথ্যা বিষয়ীগততায়। আর তখন ঠিক ঐ স্রষ্টা আল মাহমুদকে আমরা অনেক সময় খুঁজে পাইনি।

কবি শামসুর রাহমান আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান কবি। তার অনেক কবিতায় আমরা পেয়েছি 'নতুন ভাষার নতুন সৃষ্টি, নতুন সময়'। কিন্তু অনেক সময় শুধুমাত্র 'প্রধান কবি' হওয়ার কারণেই তিনি সৃষ্টির যন্ত্রণাহীন অনেক অনেক কবিতা-অকবিতা লিখেছেন, যা শুধুমাত্র তিরিশ, চল্লিশ দশকের মামুলি সম্প্রসারণ বা extension হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। স্রষ্টা-কবি শামসুর রাহমানের সৃষ্টিশীল দু-একটা কবিতার উদাহরণ দেয়া যায়:

১. ... তাই কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো
অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাস আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রৌদ্রের সমুদ্রের নিয়ে গেলো। দ্বিধাহীন আমি উড়ে
গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোন রক্ষাকবচহীন
প্রার্থনার মতো

২. অনেক আলোকবর্ষ যাপন করতে পারি, তোমারই উদ্দেশ্যে
সাঁতার না জেনেও নিঃশঙ্ক দ্বিধাহীন

গহন নদীতে নেমে যেতে পারি
তোমার সন্ধানে ক্রোশ ক্রোশ দাউ দাউ পথ হেঁটে
অগ্নিশুদ্ধ হতে পারি, পারি
বুকের শোণিতে ফুল ফোটাতে পাষাণে।

কবির ব্যক্তিগত দেশকালে যে সবসময় সৃষ্টিশীল সময় থাকে তা নয়। অনেক সময় একজন সৃষ্টিশীল সত্তা তার নিজস্ব অহং-কে অতিমাত্রার প্রাধান্য দিয়ে, শুধুমাত্র অহংবোধের বাড়াবাড়ির কারণেই হারিয়ে যেতে পারে। এমন কবি-সত্তার কাছে 'বিখ্যাত' হবার মোহই হয়ে ওঠে মুখ্য এবং এ কারণে তার অচেতন-কামনা-বাসনার উগ্র প্রকাশ 'সৃষ্টির সময়' তৈরি করার অনুকূলে থাকে না। এমন একটা ব্যাপার আমাদের দেশে কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আজাদ-এর বেলায় ঘটেছে। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন আমাদের সময়ের অন্যতম পণ্ডিত ভাষাবিজ্ঞানী। ভাষা-বিজ্ঞান নিয়ে লেখা তার প্রবন্ধ এবং রচিত বই বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন প্রচণ্ডভাবে সাহসী এবং সাম্প্রদায়িকতার/মৌলবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। কিন্তু তার এই সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড কিছু বিতর্কিত 'নতুন সময়' সৃষ্টির জন্য ব্যাহত হয়। প্রথম বিতর্কের সৃষ্টি করলেন তিনি প্রবচনগুচ্ছ লিখে, যেখানে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বানালেন গণিকা। তিনি রচনা করলেন 'নারী' নামক একটি সংকলন, যার মাঝে তিনি একই কথা লিখলেন বারবার। তারপর আজাদ বাংলাদেশের সমস্ত উপন্যাসকে 'অপন্যাস' হিসেবে বিবেচনা করলেন তার নিজস্ব অহং-প্রাধান্যকে উগ্র মর্যাদা দিয়ে। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি যে কতটা হিংস্র ছিল, সমাজবিরোধী ছিল, তার বিশদ বর্ণনা আজাদ সঠিকভাবেই দিয়েছেন। কিন্তু তার মনের অন্তঃস্থলে যে বিতর্কিত হয়ে বিখ্যাত হওয়ার মোহ কাজ করত তা হয়তো সত্য। হুমায়ুন আজাদের অচেতনে যে অবদমিত যৌনতা আর পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব ছিল, তা কিন্তু আজাদকে দিয়ে ভালো কবিতাও লিখিয়েছে। কবি আজাদ লিখতে পেরেছিলেন:

১. শূন্যতাই সঙ্গ দেবে যতো দিন বেঁচে
আছো, শূন্যতাই পূর্ণ করে রাখতে তোমাকে;
অরণ্যে সবুজ হয়ে বেড়ে উঠবে শূন্যতা, শূন্যতার
অরণে তুমি ঘুরবে একাকী;

২. আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্য মারা যাবো
খুব ছোট একটা স্বপ্নের জন্য
খুব ছোট একটা দুঃখের জন্য
আমি হয়তো মারা যাবো কারো ঘুমের ভেতরে
একটি ছোট দীর্ঘশ্বাসের জন্য
একফোঁটা সৌন্দর্যের জন্য।

কবিতার 'দেশ-কালে' কবিও থাকে, কারণ কবিতা হল স্রষ্টা কবির তৈরি 'নতুন সময়'। কবিতার ভাষাতে তাই আমরা সব সময় একজন কবির 'অন্তরের ফসিল' কিংবা 'অচেতন মনের' টুকরো

টুকরো উচ্চারণ খুঁজে পাই। যদি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি, তবে বারবার পাবো 'অন্ধকার', 'আঁধার', 'রাত্রি', 'পেঁচা' সময়। যদি 'জীবনানন্দের অন্ধকার'-কে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আনি, তবে বুঝতে পারি কবির 'ব্যক্তিগত সময়' ছিল হতাশায় পরিপূর্ণ। হাজার বছর হাঁটার পর নাটোরের বনলতা সেনের সাথে দেখা হয়েছিল কবির, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে সেই স্নিগ্ধ কোমল বনলতা কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলে ছোট্ট একটি প্রশ্ন– 'এতোদিন কোথায় ছিলেন'? বনলতার এই ছোট্ট একটা প্রশ্নই পথহারা আর ক্লান্ত কবিকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল। কিন্তু কবির শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বলার উপায় নেই, বনলতাকে কাছে পেয়েও কবিকে বলতে শুনি– 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। কবি জীবনানন্দের 'ব্যক্তিগত সময়' বা অচেতনে যে হতাশার জগৎ ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না, আর তাই মাঝে মধ্যে ভাবি, নিজেকেই প্রশ্ন করি, কোলকাতার রাসবিহারী এভিন্যু আর ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামের নিচে চাপা পড়ে কবির যে মৃত্যু হল, একি ছিল নিছক দুর্ঘটনা, নাকি ছিল আত্মহত্যা?

কবির ব্যক্তিগত দেশকালের সৃষ্টি কবিতা বা 'নতুন সময়কে' পাঠ করে একজন পাঠক। একটি কবিতার 'নতুন সময়'-কে সঠিকভাবে বোঝার জন্য একজন পাঠককেও তাই অল্প মাত্রায় হলেও 'কবি' হতে হয়। কবির সময় থেকে পাঠকের সময় অনেক দূরে থাকলে, কবিতার নন্দনতত্ত্ব একজন পাঠককে কোনো অবস্থাতেই সুন্দরের উপলব্ধি দিতে পারে না।

খ. গল্প-উপন্যাস

একটি ছোটগল্প হল কিছু খণ্ড -মুহূর্তের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক 'নতুন সময়'। একজন গল্পকার তার ব্যক্তিগত সময়ের ওপর নির্ভর করে তার গল্পে আনতে পারেন বিভিন্ন খণ্ড মুহূর্তের চরিত্র এবং এই চরিত্রগুলোর সম্মিলিত মুহূর্তই আমাদের সামনে উপস্থিত করে এক নতুন সময়কে। গল্পের প্রয়োজনে কত সংখ্যক চরিত্র বা খণ্ড-সময় থাকবে, তা নির্ধারণ করে গল্পকারের সৃষ্টিশীল ইচ্ছা, তার ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীল সময়ের প্রয়োজন, আর তার স্বপ্ন বা ফ্যান্টাসির মাত্রা। একটি গল্পে যে আদৌ চরিত্র থাকতে হবে তা নয়, তবে খণ্ড-সময়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন ঘটনাকে অবশ্যই থাকতে হবে। খণ্ড-সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে এমন চরিত্র বা ঘটনা একজন পাঠককে দিতে পারে বাস্তবতা সম্পর্কে 'নতুন সময়', কিংবা এমনও হতে পারে একটি ছোটগল্প পাঠককে উপস্থিত করে অতিবাস্তব, পরাবাস্তব কিংবা যাদু-বাস্তবতার নতুন সময়ে।

একটি ছোটগল্প যখন কিছু খণ্ড-মুহূর্তকে নিয়ে নতুন সময় তৈরি করে, একটি উপন্যাস তখন তৈরি করে নতুন সময়-প্রবাহ। একটি উপন্যাসে যেহেতু 'সময়-প্রবাহ' উপস্থিত থাকে, সেহেতু একজন পাঠক উপন্যাসের খণ্ড-সময় বা চরিত্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই চলে যেতে পারে অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে। ছোটগল্প বা উপন্যাসের ভাষা কেমন হবে তা নির্ভর করে লেখকের সৃষ্টিশীল সময়ের ওপর, এবং অনেক সময় খণ্ড-সময় বা চরিত্রের প্রয়োজনকে গ্রাহ্য করে।

গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টির সময় মানুষের যৌথ অচেতনও (Collective Unconscious) কাজ করতে পারে, যা কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়। আমরা যদি উপন্যাস বা গল্পের কাঠামো বিশ্লেষণ করি, তবে ওখানে নায়ক, নায়িকা, ভিলেন ও কিছু

পার্শ্বচরিত্রের খণ্ড সময়কেন্দ্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া দেখতে পাব এবং এ কারণে বিভিন্ন গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতেও আমরা একইরকম ঘটনা বা সময়-কাঠামো আবিষ্কার করতেও পারি। কিন্তু একজন গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের সাথে অন্য এক স্রষ্টার 'সময়-কাঠামো' একই রকম হয় না 'খণ্ড-সময়' বা 'চরিত্রের' ভিন্নমাত্রিক বিন্যাসের জন্য। গল্প আর উপন্যাস নিয়ে পল ভেইস তাই বলেন– 'A Story makes vivid and immediate the tragic or comic import of existence... in the shape of characters and incidents which embody, possess and control the movement of that time.' যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করি, তবে দেখতে পাব অনেক স্রষ্টাই সৃষ্টি করতে পেরেছেন গল্প আর উপন্যাস-ভিত্তিক 'নতুন সময়'। আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে, পেয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুবিমল মিশ্র প্রমুখের মতো গল্পকার/ঔপন্যাসিক। বাংলাদেশে পেয়েছি আমরা শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক প্রমুখকে। আমাদের নতুন সময় উপহার দিয়েছে 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পথের পাঁচালী', 'বেদেনী কন্যার কাহিনী', 'গণদেবতা', 'কবি', 'জননী', 'খোয়াবনামা', 'চিলেকোঠার সেপাই', 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', 'লালসালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো' ইত্যাদির মতো উপন্যাস এবং অসংখ্য সৃষ্টিশীল গল্প।

গ. চিত্রকলা

চিত্রকলা আমাদের চোখের সামনে 'দেশ বা space'-কে তুলে ধরে। আমরা আমাদের সময় নিয়ে বিশ্ব-বাস্তবতায় থেকে চারপাশের বস্তুজগতের সব কিছুই দেখি, কিন্তু বস্তুর মাঝে যে দেশ বা space-এর অসধারণ জ্যামিতিক মনস্তাত্ত্বিক, স্বপ্নময় আর নান্দনিক কারুকাজ রয়েছে তা বুঝতে পারি না। একজন শিল্পী এই 'দেশ বা space'-কে দেখতে পায় তার 'ব্যক্তিগত সময়' দিয়ে, আর আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে ঐ 'দেশ বা space'-এর অসাধারণ চিত্ররূপ। কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতিরূপ কিংবা Duplicate copy তৈরি করা কিন্তু শিল্পীর কাজ নয়, কোনো বস্তু বা বিষয়ের অন্তরে যে সুন্দর আছে, তাকে রঙ আর রেখায় প্রকাশ করাই হল শিল্পী-স্রষ্টার কাজ। চিত্রকলা আমাদের এমন এক নতুন 'দেশ বা space' দেখায়, যা একক ও অনন্য। আমরা আমাদের পরিবেশের যাই দেখি না কেন, তার বাহ্যিক কাজের প্রকাশ হয় রঙ, রেখা, আলো আর অন্ধকার দিয়ে। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে রঙ নিয়ে আমরা কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করলেও, রেখা আর আলো-ছায়ার কারুকাজ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু জয়নুল যখন তার 'রেখা' দিয়ে একজন নারী, পুরুষ, কাক কিংবা একটি শিশুকে আঁকেন, তখনই আমরা দেখতে পাই 'ক্ষুধা, 'তৃষ্ণা', 'মৃত্যু', 'দুর্ভিক্ষ', আর 'জীবন যন্ত্রণা'-র ছবি। কী আছে জয়নুলের রেখায় যা আমাদের অন্তরের চোখ খুলে দেয়? জয়নুলের কাক 'কা-কা' শব্দ না করেও আমাদের কেন বলে 'তুমি মানুষ, আমি কাক, আমরা ক্ষুধার্ত; ঐ ডাস্টবিন খুঁজে আমাদের খাদ্য খেতে হবে। দেখ দর্শক, এখন ডাস্টবিনের পচা-গলা খাদ্য নিয়েই মানুষ ও কাকের লড়াই।' পিকাসোর জ্যামিতির সাথে বাংলার লোকশিল্পকে এক করে কামরুলের লাল, নীল আর হলুদ রঙ, আর তার সাথে রেখার অসাধারণ বিন্যাস, আমাদের উপহার দেয় বাংলাদেশের নারীর

ত্রিমাত্রিক রূপ, তাদের অন্তরের গোপন প্রকাশ। সুলতানের রঙ আর রেখা বাংলার মানুষের Anatomy-কেও বদলে দেয়, পেশিবহুল নারী ও পুরুষ তুলে ধরে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী চরিত্র। কিন্তু এরকম হয় কেন? কী আছে জয়নুল, কামরুল আর সুলতানের হাতে? আসলে শিল্পীর হাতে থাকে কারুকাজ করার মতো রঙ, তুলি আর কলম, কিন্তু শিল্পীর মনে থাকে তার সৃষ্টির চাবিকাঠি, সে জানে কী করে 'দেশ বা space'-কে দেখাতে হয়।

একটি শিল্পকর্মকে রঙ ও রেখার কোন বিন্যাসে বা কোন চৈতন্য-পদ্ধতিতে প্রকাশ করবেন, তা নির্ভর করে স্রষ্টা-শিল্পীর 'দেশ-কাল'-মাত্রার ব্যক্তিগত সময়ের ওপর। আর এই সময়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে Realism, Impressionism, Expressionism, Futurism, Dadaism, Surrealism, Cubeism ইত্যাদি নামের শিল্প-প্রকাশের তাত্ত্বিক পদ্ধতির। এই পদ্ধতিগুলোর প্রেক্ষাপটেও কাজ করেছে একজন স্রষ্টা-শিল্পীর 'দেশকাল'-কেন্দ্রিক সৃষ্টি-প্রকাশের নতুন 'সময়'।

'চিত্রকলা কী, ছবি কাকে বলে?' এমন প্রশ্নের উত্তর একজন সাধারণ সামাজিক মানুষ খুব সহজে দিতে পারে না। ছবি ও চিত্র-কলা নিয়ে স্রষ্টা-শিল্পীরা কে কী বলেন তাই তবে শোনা যাক। ভ্যান গগ (V.Van Gogh) মনে করেন, রঙ হল একটি ছরিব প্রাণ, আর তিনি উচ্চারণ করেন 'Color is itself expresses something; never mind the object'। আবার গয়া (F.Goya) বলেছেন 'Color does not exist in nature any more than lines...।' রেখা যে চিত্রের মূল উপাদান, তা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (L.Da Vinci) বুঝেছিলেন আর তাই তার বক্তব্য হল 'The air is full of an infinite number of radiating straight lines which cross and weave together without ever coinciding; it is these which represent the true form of every object's essence।' একটি ছবির নান্দনিক প্রকাশের পেছনে যে যুক্তি কাজ করে, একে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রেডন (O.Redon) বলেন '...Placing the logic of the visible at the service of the invisible', আর একই বিষয়কে একটু অন্য মাত্রার ব্যাখ্যা দিয়ে পুশিন (G. Pussin) বলেন– 'Painting is nothing but an image of incorporeal things despite the fact that it exhibits bodies'। ছবি আঁকতে গিয়ে আত্মার অতৃপ্তির কথা, যন্ত্রণার কথা বলেছেন অনেক স্রষ্টা-শিল্পী। পিকাসোর (P. Picaso) বক্তব্যে আত্মার যন্ত্রণার কথা ফুটে ওঠে, তিনি বলেন– 'I get an indigestion of greenness. I must empty this sensation in a picture'।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একটি ছবি আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে বস্তুর নান্দনিক কিন্তু আপাতত অদৃশ্য বিন্যাসকে তুলে আনে, আর এই প্রকাশের জন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে রঙ, রেখা, আলো আর অন্ধকারের কারুকাজ এবং স্রষ্টা-শিল্পীর 'দেশ-কাল' কেন্দ্রিক সৃষ্টি-তত্ত্ব।

ঘ. ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প

ভাস্কর্য আর স্থাপত্যশিল্প নান্দনিকভাবে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে 'দেশ বা space'-কে আবদ্ধ বা Bound করে। আমাদের পরিচিত পৃথিবী হল দেশ-কাল-কেন্দ্রিক বস্তুর বিন্যাস, যেখানে 'দেশ বা space' হল বস্তুসমূহকে ধারণ করার মাত্রা-কোনো-এক স্রষ্টা যখন তার কল্পনার মাধুর্য মিশিয়ে কোনো-এক নতুন 'দেশ বা space' সৃষ্টি করে, তখন তাকেই আমরা বলি ভাস্কর্য বা স্থাপত্যশিল্প।

একটি ভাস্কর্য সৃষ্টির সময় একজন স্রষ্টা-ভাস্কর এক নতুন 'দেশ বা space'-এর বাহিক্য রূপকে উপস্থাপন করেন, আর ভাস্কর্যের আভ্যন্তরীণ আয়তন (Volume) শুধুমাত্র বাহ্যিক রূপকে ধারণ করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়। একটি শৈল্পিক ভাস্কর্যের বাহ্যিক রূপে অবস্থান করে অগণিত রেখার জ্যামিতিক বিন্যাস, যা একটি বস্তুর রূপের নান্দনিক বিম্ব কিংবা এমনও হতে পারে একটি ভাস্কর্য শুধুমাত্র একজন ভাস্করের অচেতনের বিমূর্ত প্রকাশ। ভাস্কর্যের আয়তন নির্ভর করে পরিবেশের ওপর, তিনমাত্রার পরিবেশের বিভিন্ন অনুষঙ্গকে (প্রকৃতি, স্থান ও অবকাঠামো, ক্রিয়াকলাপ) প্রাধান্য দিয়েই একজন ভাস্কর তার নতুন 'দেশ বা space'-কে আবদ্ধ করেন ভাস্কর্য হিসেবে। ভাস্কর্যের রূপ ও স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে পল ভেইস (Paul Weiss) বলেন– 'A work of sculpture materially presents us with a newly created, voluminous, occupied space', আর রডিন (A. Rodin)-এর বক্তব্য হল 'Each profile is actually the outer evidence of the interior mass; each is the perceptible surface of a deep section... the reality of the model...seems to emanate from within.' একটি ভাস্কর্যের অনন্যতা নিয়ে বারনিনি-র (G. L. Bernini) বক্তব্যও উল্লেখ করার মতো। তিনি বলেন 'Sometimes in order to imitate the original one must put into a marble portrait something that is not in the original.'

বাংলাদেশের ভাস্কর্যের ঐতিহ্য ছিল উল্লেখ করার মতো। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাকুরের কালো ব্যাসল্ট বা কষ্টি-পাথর খোদাই করে যে-সব হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছিল, তার নান্দনিক মূল্য অসাধারণ। কষ্টি-পাথরের খোদাই করা অবলোকিতেশ্বর, খসর্পণ, সুগতিসন্দর্শন লোকেশ্বর, ষড়ক্ষরী-মণ্ডল, সিদ্ধৈকবীর, হেরুক, প্রজ্ঞাপারমিতা, মার্ত ভৈরব, মহাপ্রতিসরা, বিষ্ণু, নন্দী, সূর্যদেব, সদ্যোজাত, মনসা, গৌরপার্বতী ইত্যাদি ছিল অসাধারণ শিল্পকর্ম। ময়নামতি, পাহাড়পুর আর মহাস্থানগড়ের পোড়ামাটির ভাস্কর্যও ছিল উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। বাংলাদেশে ইসলাম-ধর্ম প্রচার হওয়ার পর ভাস্কর্য-শিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা যায়নি। পাকিস্তানি আমলেও ভাস্কর্যশিল্প উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভাস্কর্য-শিল্প নতুন প্রাণ পেয়েছে বলা যায় এবং মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক কিছু ভালো ভাস্কর্য এখন আমরা দেখতেও পাই।

স্থাপত্য-শিল্প হল ভাস্কর্যের মতোই নতুন 'দেশ বা space'-সৃষ্টির নান্দনিক কাজ। একজন স্থপতি আসলে প্রাকৃতিক 'দেশ বা space' থেকে কিছু অংশ নিয়ে নতুন বিন্যাসে 'দেশ বা space'-কে আবদ্ধ (bound) করেন। এটি ভাস্কর্যের বাহ্যিকরূপশিল্প হিসেবে আমাদের নান্দনিক উপলব্ধি দেয়, আর একটি স্থাপত্যশিল্পের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ 'দেশ বা space'-এর যৌথ বিন্যাস আমাদের মনে আনে শিল্পকর্মের অনুভূতি। একটি স্থাপত্যশিল্পের অভ্যন্তরীণ

বিন্যাস সবসময়ই মানুষের কার্যকলাপের সাথে জড়িত। এ বিষয়ে মন্তব্য করে পল ভেইস (Paul Weiss) বলেন- ''The architect makes the three-dimentional space of daily life into a constituent part of an architectural work. He creates a new space which man can use while occupying a relevant common-sense space'. একটি নান্দনিক স্থাপত্যকর্ম তৈরি করার সময় একজন স্থপতি স্থাপনাটি কী কারণে ব্যবহার হবে, এটির পরিবেশ কী, কোন কোন বস্তু দিয়ে স্থাপত্যকর্মটি তৈরি হবে, এমন সব বিষয় বিবেচনা করেন। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিন্যাস যেন শৈল্পিক হয়, এ বিষয়েও বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেন একজন স্থপতি। স্থাপত্যশিল্প নিয়ে লা করবুজিয়রের (La Corbusier) মন্তব্য হল– 'Architecture is the masterly, correct and magnificent play of forms and light'. আর মাইজ ভেনডার রো (Mies Van Der Rohe) বলেন 'Less is more'। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বাঁশ, শন, মাটি ও করোগেটেড টিন দিয়ে যে বসতবাড়ি তৈরি করা হয়, তার মাঝে নান্দনিক কারুকাজ তেমন থাকে না। তবে মসজিদ নির্মাণে মুঘল স্থাপত্য আর মন্দির নির্মাণে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের চিন্তা-চেতনার উপস্থিতি আমাদের নান্দনিক উপলব্ধি দেয়। ঢাকা শহরের শেরে-বাংলা নগরের নির্মিত লুই আ কান (Luis I Kahn)-এর স্থাপত্য শিল্প-কর্ম সংসদ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে আধুনিক স্থাপত্য চিন্তা-চেতনার প্রতিফলিত রূপ নিয়ে নতুন নতুন ভবন/স্থাপন নির্মিত হচ্ছে।

ঙ. নাটক/ চলচ্চিত্র

দেশ, কাল ও গতি এই তিনটি উপাদান নিয়ে উপস্থাপন করা হয় নাটক এবং চলচ্চিত্র। তবে শিল্প হিসেবে একটি নাটক বা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে উপস্থিত থাকে গল্পের ভাষা, বিভিন্ন চরিত্র এবং দর্শকের মনস্তত্ত্ব। প্রতিটি মানুষের 'মন' একান্ত ব্যক্তিগত হলেও অনেক বিষয়ে মানুষের মাঝে 'যৌথ-অচেতন' বা 'Collective unconsciousness' কাজ করে। একজন চলচ্চিত্র কিংবা নাটকের পরিচালককে মানুষের 'যৌথ-অচেতনে' গ্রাহ্য এমন একটি বিষয়কে শিল্পিতভাবে তুলে ধরতে হয়। একটি নাটকের ভাষা, উপস্থাপনা ও নান্দনিক গুণ অনেকটাই নির্ভর করে চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সময়-কেন্দ্রিক ভাষা-উচ্চারণ আর অভিনয়-ক্ষমতার ওপর। একটি নাটক যেহেতু একটি সীমাবদ্ধ 'দেশ-বা space'-এ অনুষ্ঠিত হয়, তাই 'দেশ-বা space'-এর সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচন হয় মনস্তাত্ত্বিকভাবে, উপস্থাপনার গুণে। নাটকের বিষয়-বস্তু বা ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদনা করা যায় না, আর তাই পরিচালকের শিল্পবোধ আর কল্পনাশক্তি দিয়েই নাটকের সাথে একাত্ম হয়ে যায় দর্শকরা। চলচ্চিত্রের বেলায় 'দেশ-বা space'-এর সীমাবদ্ধতা থাকে না, চলচ্চিত্র সম্পাদনযোগ্য এবং কিছু অংশ নতুনভাবে তৈরি করাও (Re-make) সম্ভব। কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষমতা, পরিচালকের নান্দনিক শিল্পবোধ, সম্পাদকের সৃষ্টিশীল ইচ্ছে, চলচ্চিত্রের অবকাঠামো ইত্যাদি একটি চলচ্চিত্রকে গতিশীল দেশ-কালের শিল্প হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনায় উপস্থিত করে।

বাংলা ভাষায় বিশ্বমানের নাটক ও চলচ্চিত্র আমরা দেখতে পেয়েছি। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র আমাদের দিয়েছে এক নতুন দেশ-কাল। বাংলাদেশেও মুক্তিযুদ্ধের ওপর বেশ কিছু

ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাট্যশিল্পে বিবর্তনও হয়েছে শৈল্পিকভাবে। আমরা পেয়েছি 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা', 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন', 'বিচ্ছু' ইত্যাদি মতো ভালো নাটক।

চ. সুরসৃষ্টি/ সঙ্গীত

সঙ্গীত ও সুরসৃষ্টি নিয়ে ভেইস (Paul Weiss)-এর মন্তব্য হল– 'Music is the art of creating a structured audible becoming...the art of structuring an emotionally sustained common time'। সঙ্গীত আর সুরসৃষ্টি আমাদের নতুন সময় উপহার দেয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদের নিয়ে যায় হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, প্রেম, স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভঙ্গের উৎসস্থলে।

সে সুরস্রষ্টা, তার সৃষ্টিতে হয়তো-বা শব্দের উপস্থিতি না-ও থাকতে পারে, কিন্তু একজন সুরস্রষ্টার সুরের ইঙ্গিতে বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র, গান গায় এক সঙ্গীত-শিল্পী। সঙ্গীত নিয়ে ম্যানডেলসন (Mendelssohn) বলেন– 'The thoughts which are expressed to me by music that I love are not too indefinite to put into words, but on the contrary, too definite'. সঙ্গীত আমাদের এমন এক মগ্নতায় নিয়ে যায়, যা আমাদের অন্য কোনো শিল্প-মাধ্যম দিতে পারে না। বিষয়টা উপলব্ধি করে চপিন (F. Chopin) বলেন– 'Nothing is more odious than music without hidden meaning.' আর এ ব্যাপারে প্যাটার (W. Pater)-এর বক্তব্য হল– 'All art constantly aspires towards the conditions of music'.

পাক-ভারত উপমহাদেশের সঙ্গীত-ঐতিহ্য বিশাল। বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, নবাব ও বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত-শিল্পী ও সুর-স্রষ্টারা সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ সব সুর ও সঙ্গীত। বিভিন্ন স্রষ্টা-শিল্পী তাদের সৃষ্টিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি করেছেন বিভিন্ন ঘরানার। বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজগৎও সর্বভারতীয় সঙ্গীত-ঘরানাকে কেন্দ্র করে এখনো সৃষ্টিশীল। মিয়া তানসেন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, বিসমিল্লা খাঁ, আমজাদ আলী খান প্রমুখ স্রষ্টা-শিল্পীর 'সময়' বিবর্তিত হয়ে আমাদের বর্তমানে এসেও সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ও কবি নজরুলও ছিলেন স্রষ্টা-সুরকার। তাদের সঙ্গীতও আমাদের সমাজ ও পরিবেশকে এখনও নতুন 'সময়' উপহার দেয় কথা ও সুরের মূর্ছনায়।

বাংলাদেশের লোক ও মরমী সঙ্গীত আমাদের চিন্তা-চেতনাকে আন্দোলিত করে। লালন ফকির, দেওয়ান হাসন রাজা, বাউল আব্দুল করিম প্রমুখ সৃষ্টিশীল মরমী কবি ও বাউলদের সঙ্গীত আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবেই 'নতুন সময়ে' নিয়ে যায়। বাংলাদেশের ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, জারি ও অন্যান্য লোকসঙ্গীতেও আমরা সৃষ্টির আমেজ পাই।

ছ. নৃত্যকলা

মানুষের দেহ আসলে বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস বা form-এর সমন্বয়। এই জ্যামিতিক form বা বিন্যাসগুলো আবার কিছুটা নমনীয় (flexible), ইচ্ছেমতো নতুন জ্যামিতিক বিন্যাসে আনা

যায় বিভিন্ন সুরে আর ছন্দে। নান্দনিকভাবে দেহের এই বিন্যাস বা form-কে ভেঙে-চুরে নতুন 'দেশ-কাল' সৃষ্টি করাকে তাই আমরা বলি নৃত্যকলা।

নৃত্যকলার ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবের দেশ-কালে। জীবনের আনন্দ-উল্লাস আর দুঃখ-বেদনা প্রকাশের জন্য তারাও দেহের জ্যামিতিকে নতুন নতুন মাত্রায় নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে ধম-দর্শনের সাথেও জড়িয়ে গেল নৃত্যকলা। দেবতাকে খুশি করার জন্য দেবালয়ে সঙ্গীতের ছন্দে, এমনকি শুধুমাত্র মন্ত্র উচ্চারণের সাথে বিভিন্ন নৃত্যের মুদ্রা ব্যবহারের নিয়ম চালু হল। ফসলের বপন, ফসল তোলা এইসব ক্রিয়াকর্মের সাথে আনন্দ-উল্লাসকে যোগ করে মানুষ পুজো করল ফসলের ক্ষেতকে, প্রকৃতিকে, আর এই পূজার অংশ হয়ে আসল সঙ্গীত আর নৃত্যশিল্প।

পশ্চিমে বিভিন্ন পুরাণকে কেন্দ্র করে, রূপকথাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল ব্যালে ও অন্যান্য নৃত্য-কলার তাত্ত্বিক পদ্ধতির। পাকভারত উপমহাদেশে নৃত্যকলা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর পুজোতে ব্যবহৃত হতে হতে, চর্চিত হয়ে সৃষ্টি করল এক ধ্রুপদী শিল্পপদ্ধতির। এখনো আমাদের দেশে যে নৃত্যকলার চর্চা হয় তা মূলত 'ক্ষেত্র-পূজা' বা 'প্রকৃতি-পূজা'র আধুনিক বিবর্তিত রূপ।

নৃত্যশিল্প আমাদের দেহ-ভঙ্গীকে বিভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়। দেহের এই শিল্পিত ভঙ্গীগুলোকে আমরা বলি নৃত্যের মুদ্রা। আমরা যে মুদ্রা ব্যবহার করি, তা আসলে প্রকৃতি থেকেই নেয়া। কিন্তু এই মুদ্রার নতুন সৃষ্টিশীল বিন্যাসে নৃত্যকলাকে আত্মপ্রকাশের শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। নৃত্যকলা সম্পর্কে তাই শাওন (T. Shawn) বলেন– '...the dance includes every way that man of all races in every period of the world's history have moved rhythmically to express themselves'। সময়ের সাথে নৃত্যকলার সম্পর্ক স্থাপন করে মার্সিকানো (M. Marsicano) বলেন– 'The true duration of a dance lies in the time of creating the image, a long gradual realization of which the performance is the final act'।

জ. আলোকচিত্র

কোনো একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে দেশ ও কালকে স্থির করে রাখার পদ্ধতিকেই আমরা বলি 'আলোকচিত্র'। আলোকচিত্র (Photography) আমাদের চোখের সামনে অতীতের কোনো এক 'সময় ও দেশ' (Space)-কে বন্দী অবস্থায় তুলে ধরে। আলোকচিত্র শিল্প হিসেবে তখনই উপস্থিত হয়, যখন একজন আলোকচিত্র-শিল্পী আলো ও ছায়ার জ্যামিতিক বিন্যাসকে গ্রাহ্য করে কোনো-এক নির্দিষ্ট নান্দনিক দেশ-কালের ফ্রেমকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। আলোকচিত্র-শিল্প আমাদের সামনে তুলে ধরে ইতিহাস, তুলে ধরে একটি ঘটনার কেন্দ্রমূলে থাকা আনন্দ কিংবা বেদনার চিত্র। এই আনন্দ বা বেদনার 'দেশ-কাল'-কে যে-শিল্পী আলো ও আঁধারের সৃষ্টিশীল বিন্যাসে, রঙের গভীরতায় এবং ঘটনার বাস্তবতাসহ বন্দী করতে পারেন, তাকেই আমরা বলব সৃষ্টিশীল আলোকচিত্র-শিল্পী।

অনুচিন্তন

সৃষ্টির সাথে দেশ ও কালের সম্পর্ক বুঝতে গিয়ে প্রবন্ধটি লেখা শুরু করেছিলাম। লিখতে গিয়ে ভাষা, মনস্তত্ত্ব, বাংলাদেশের সাহিত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি নিয়েও কিছু অসম্পূর্ণ আলোচনা করতে হল। লেখক হিসেবে আমার উপলব্ধি বলে– আমরা আমাদের দেশের সৃষ্টিশীল কাজগুলোর দেশ-কাল, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো এখনো উন্মোচিত করতে পারিনি সম্পূর্ণভাবে। কোনো-এক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আমাদের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের আরো ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কেউ-না-কেউ সৃষ্টি, দেশ, কাল ও আমাদের সমাজ-বাস্তবতা নিয়ে আরো অনেক সত্য উপস্থিত করবেন, এমন আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অজয় মিশ্র, সিনেমা সংকেত সত্যজিৎ, কলকাতা, ১৯৯৪

২. অম্লান দত্ত, প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৯৩

৩. আনিসুজ্জামান, সম্পাদনা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৭

৪. শাহাদুজ্জামান, কথা পরম্পরা, ঢাকা, ১৯৯৭

৫. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, ঢাকা, ১৯৯৭

6. Bernstein, JM. The Fate of Art, Cambridge, UK, 1993

7. Hofstadter A. Kuhns R. Dt. Philosophies of Art and Beauty, Chicago, 1976

8. Parmesani, Lorenda, Art of the Twentieth Century, Milan, 1998

9. Scharf. Aaron. Art and Photography. London, UK 1968

10. Weiss, Paul, Nine Basic Arts, New York, 1963

11. White I. Thomas. Discovering Philosophy, New Jersey, 1991

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?

ঘুমপাড়ানি ছড়াগান

ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

ধান ফুরাল পান ফুরাল
খাজনার উপায় কী?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।

পূর্বকথা

এখন অনেক সময় ঘুম আসতে চায় না। জগৎযন্ত্রণায় বেড়ে-ওঠে জীবন বুঝতে পারে ঘুম-নামক শান্তি প্রচণ্ডভাবে আপেক্ষিক। আজ আনন্দ আর বেদনার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ঘুমপরীরা আসে, ঘুমপরীরা যায়। শিয়রের পাশে এখন আর মা ঘুমপাড়ানি গান গায় না; সুরের তালে পিঠে বুলিয়ে দেয় না স্পর্শের আদর। মা'র স্থানে এখন এসেছে ডায়জিপাম! প্রতিদিন পাঁচ মিলিগ্রাম সেডিল-ডায়াজিপাম ঘুম পাড়ায় জীবনকে। এই ঘুমে কোনো গান নেই, কবিতা নেই, সুর নেই। যান্ত্রিক এই ঘুম নিয়েই গড়িয়ে যাচ্ছে সময়, এগিয়ে যাচ্ছে বেলা-অবেলার 'আমি'।

মাঝেমধ্যে মনে পড়ে সেই পুরনো সুর– 'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গি এল দেশে...'। হঠাৎ মনে হয় এ-সুরের অর্থ আছে, ঐতিহাসিক এই ছড়াগান ইতিহাস বেয়ে-বেয়ে বর্তমান এসেও প্রচণ্ডভাবেই সত্য, আর এ-ছড়ায় যে প্রতীকী ইঙ্গিত আছে তা এক ধরনের ধ্রুবক। সময়হীন সত্তায় লুকিয়ে-থাকা ভাষার এই উপস্থাপনা আলোড়িত করে আমাকে। সেই অনেক-অনেক আগে, ইতিহাসের কোনো-এক অজানা-অচেনা কবি-ছড়াকার রচনা করেছিল যে-ছড়াগান, তা কীভাবে এই এখন একবিংশ শতকে এসে আমাকে আন্দোলিত করছে, তা উদ্ধার করতে চেষ্টা করি। ভাবি; তবে কি এই সত্য যে-কোনো এক মৌলিক সত্তার ভাষাসত্যের উচ্চারণ সর্বকালে সর্বসময়ে সত্যমূল্য নিয়েই উপস্থিত থাকে? দার্শনিক পিয়ার্স, সস্যুর, হাইডেগার, ফ্রয়েড, লাকাঁ, ফুকো, দেরিদা প্রমুখ কি একথাই বলতে চেয়েছেন? এক ঘুমপাড়ানি গানের সত্য-মিথ্যা উদ্ধারের জন্য আমি নিজেকে উপস্থিত করি বিভিন্ন তত্ত্বের সম্মুখে।

তত্ত্বের সন্ধানে

প্রথমেই চিন্তা করি সস্যুরের ভাষাতত্ত্ব নিয়ে। তিনি ভাষার ভেতরের উপাদানকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে আমরা আমাদের অচেতনে ভাষা সম্পর্কে যে মৌলিক উপলব্ধি বা নিয়মসমূহ ধারণ করি তাকে বলা যায় Langue, আর এই নিয়ম মেনে আমরা যখন শব্দ-উচ্চারণে কথা বলি তখন তাকে বলা যায় Parole. ভাষার জৈবিক কাঠামো Langue আর তার প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়া Parole যৌথভাবে আমাদের সমাজের ভাষাব্যবস্থাকে অর্থবোধক করে রেখেছে। ভাষার আদান-প্রদান করে অর্থসৃষ্টির জন্য আমরা ব্যবহার করি ভাষাচিহ্ন কিংবা শব্দ। যদি আমরা ধ্রুপদী ভাষাদর্শনের তত্ত্ব মানি তবে আমাদের বলতে হবে যে, ভাষা হল সময় ও সভ্যতার সাথে বেড়ে-ওঠা এক বিশাল শব্দভাণ্ডার, যেখানে প্রতিটি শব্দের বিপরীতে কোনো-না-কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়, বস্তু কিংবা ধারণা অবস্থান করছে। এ-তত্ত্ব মেনে নিলে ভাষায় যে-ভাষাচিহ্ন বা শব্দ আছে তার সাথে বস্তু ও বিষয়ের সম্পর্ককে একটি সহজ সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়। সমীকরণটি হল–

ভাষাপ্রতীক বা শব্দ = বস্তু বা বিষয়

দার্শনিক সস্যুর ধ্রুপদী ভাষাদর্শনের এই সহজ সমীকরণটি মেনে নেননি। তাঁর মতে কোনো একটি ভাষাচিহ্ন বা শব্দ কখনোই কোনো বস্তু বা বিষয়কে সরাসরি উপস্থাপন করে না। আর এ-কারণেই বাঙলা ভাষায় যা 'বিড়াল' তা ইংরেজিতে হয়ে যায়ঃপধঃ, দেশ ও কালকে কেন্দ্র করে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে: তবে শব্দ-উচ্চারণে অর্থ আসে কোথা থেকে? বিষয়টি সস্যুর ব্যাখ্যা করেছেন Signifier (দ্যোতক) আর Signified (দ্যোতিত) দিয়ে। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের বিপরীতে অবস্থান করে 'দ্যোতক', যা 'দ্যোতিত' হয়ে আমাদের অর্থ জোগায়। সস্যুরের তত্ত্ব মেনে নিলে ধ্রুপদী দর্শনের সহজ সমীকরণটি নতুনভাবে লিখতে হয় এবং সমীকরণটি হবে নিম্নরূপ:

$$\text{ভাষাচিহ্ন বা শব্দ} = \frac{\text{দ্যোতক}}{\text{দ্যোতিত}}$$

ভাষাচিহ্নকে কেন্দ্র করে এই যে দ্যোতক-দ্যোতিতের খেলা, তা আবার দেশ ও কাল-কেন্দ্রিক, আর এ-কারণেই আমরা বলি: 'এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি'। দেশ-কালকেন্দ্রিক ভাষার দ্যোতক/দ্যোতনার এই ভিন্নমাত্রার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ভাষা, উপভাষা আর বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার। তবে একথা সত্য যে, দেশ ও কাল-কেন্দ্রিক ভাষার রূপ ভিন্ন হলেও, ভাষার কারণেই একজন মানুষ মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে অবস্থান করে তার 'নিজস্ব পৃথিবীকে' তৈরি করে নেয়। এখানে 'নিজস্ব পৃথিবী' তৈরি করার বিষয়টা পুরোপুরি ভাষানির্ভর। মানুষের অচেতনে ভাষার একটা নির্দিষ্ট কাঠামো থাকলেও, ভাষার ব্যবহার আর ভাষাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীকে বোঝার মাত্রা সব মানুষের ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। আর তাই প্রতিটি মানুষের পৃথিবী শুধুমাত্র তার নিজস্ব পৃথিবী।

একই ভাষায় কথা বলে বা একই ধরনের পড়াশোনা করার পরও ভাষাকেন্দ্রিক আমাদের 'বিশ্ব' সবার জন্য একই রকম হয় না কেন, এ-প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। এ-প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিলে ভাষাদার্শনিক নোয়াম চমস্কির ভাষাবিষয়ক যোগ্যতা (competence) ও কৃতি (performance)-র তত্ত্বকে বুঝতে হবে। দার্শনিক পিয়ার্স-এর মতে ভাষাচিহ্নের মৌলিক চরিত্রে অবস্থান করে কিছু চিত্র, অনুষঙ্গ আর প্রতীক এবং এ-কারণে একই ভাষাচিহ্নের দ্যোতক/দ্যোতিত রূপ বিভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করতে পারে মানুষের মনে। নোয়াম চমস্কির ভাষাকেন্দ্রিক competence আর percormance-র ওপর ভিত্তি করেই একজন মানুষ ভাষাকেন্দ্রিক চিত্র, অনুষঙ্গ ও প্রতীক দিয়ে তার অচেতনে তৈরি করে নেয় কোনো বস্তু, বিষয় কিংবা পৃথিবী সম্পর্কে তার concept বা ধারণা, আর এ-কারণেই প্রতিটি মানুষের পৃথিবী হয়ে ওঠে একান্তভাবেই তার নিজস্ব। বিষয়টি ভাষাদার্শনিক হ্বিগেনেস্টাইন উপলব্ধি করেছিরেন এবং তাই তিনি বলেন: 'আমার ভাষার সীমাবদ্ধতার অর্থ হল বিশ্বের সীমাবদ্ধতা। বিশ্ব ও জীবন একই বিষয়। আমি হলাম আমার বিশ্ব।'

এখন প্রশ্ন হল: ভাষাকেন্দ্রিক আমাদের পৃথিবী যদি ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় অবস্থান করে তবে আমরা সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে যোগাযোগ করি কীভাবে? ভাষার কি কোনো সার্বজনীন রূপ নেই? প্রশ্ন দুটোর উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে হ্বিটগেনেস্টাইন, হাইডেগার, চমস্কি, লেভি স্ট্রাউস, দেরিদা, রাসেলসহ অন্যান্য যুক্তিবাদী আধুনিক ভাষাদার্শনিকদের চিন্তাচেতনায়; আমরা উত্তর খুঁজে পাব সমাজ-ভাষাতত্ত্বের (socio-linguistics) বিভিন্ন সূত্রে।

ভাষাদার্শনিক হ্বিটগেনেস্টাইন সামাজিক ভাষার সত্য-মিথ্যাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভাষার মৌলিক কাঠামোকে বিশ্লেষণ করেছেন, যা দার্শনিক রাসেল ও মুরের চিন্তাচেতনা এবং ভিয়েনাকেন্দ্রিক যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (Logical positivists) দর্শনের কাছাকাছি ছিল। হ্বিটগেনেস্টাইনের মতে, ভাষা ব্যবহার করার সময় সচরাচর আমরা দু-ধরনের বাক্য ব্যবহার করি। প্রথমটি হল মৌলিক বাক্য (হ্বিটগেনেস্টাইন বলেন, Atomic Sentence), যা কোনো-এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বিধেয় নিয়ে একটি সত্য কিংবা মিথ্যাকে তুলে ধরে। আমরা যখন বলি 'আমি যাই', 'তুমি খাও', 'এটি একটি নদী', 'আমি তোমাকে ভালোবাসি', 'বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ' ইত্যাদি, তখন এই বাক্যগুলো কোনো এক নির্দিষ্ট সত্য কিংবা মিথ্যাকেই উপস্থিত করে। আমাদের পরিচিত ভাষার বিশ্বও আসলে অসংখ্য মৌলিক কিংবা Atomic বাক্য দিয়ে গড়া। আর যেহেতু ভূমিকা বাক্যের সত্য-মিথ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, তাই সামাজিক ভাষার বিশ্বে আমরা সহজেই একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি।

বাক্যের দ্বিতীয় রূপটি হল যৌগিক (হ্বিটগেনেস্টাইন বলেন Complex Sentence), যা একের অধিক মৌলিক বাক্য দিয়ে তৈরি হতে পারে। যৌগিক বাক্যের সত্য-মিথ্যা নির্ভর করে মৌলিক বাক্যের সত্য-মিথ্যার ওপর, কারণ একটি সত্য বাক্যের সাথে একটি মিথ্যে বাক্য যোগ হয়ে কিছু প্রশ্নবোধক অর্থই সৃষ্টি করে। আমরা যখন বলি– 'আমি বাঙাল, আমাদের প্রধান খাদ্য মাছ-ভাত', তখন 'আমি বাঙাল' আর 'আমাদের প্রধান খাদ্য মাছ-ভাত' এই দুটি ভূমিকা বাক্যে সত্যের উপস্থিতি থাকার কারণে যৌগিক বাক্যটিও সত্য হয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। আমরা এ-ধরনের সত্যমূল্যের (Truth functional) যৌগিক বাক্য ব্যবহার করেও সামাজিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। কিন্তু আমরা যদি বলি– 'আমরা বাংলাদেশের লোক এবং আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী', তবে প্রথম মৌলিক বাক্যটির সাথে দ্বিতীয় বাক্যটির সত্যমূল্য (Truth function) প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। আমরা যেহেতু সবাই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা করি না (বা জানার চেষ্টাও করি না), সেহেতু উপরিউক্ত যৌগিক বাক্যটি আমাদের কাছে একটি মনগড়া Metaphysical বা বাচাল বক্তব্য হয়েই আপাতত গ্রাহ্য হবে। অনেক সময় যৌগিক বাক্যের সত্য-মিথ্যা জানার জন্য নোয়াম চমস্কি-কথিত competence আর performance-এর ভূমিকাও থাকে অনেক। যদি বলা হয় যে– 'প্রতিটি বাংলাদেশীর গড়ে ৩.৪টি সন্তান আছে', তবে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে বাক্যটি যৌগিক এবং আমাদের competence ও performance দিয়েই 'গড় ৩.৪টি সন্তান' বাক্যাংশের সত্য-মিথ্যা উদ্ধার করতে হবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিদিন ভাষা ব্যবহারের সময় আমরা যে-যৌগিক বাক্যসমূহ উচ্চারণ করি তার সত্যমূল্য (Truth function) অনেক সময়ই মৌলিক বাক্য দিয়ে সমর্থিত হয় না, আর এর ফলেই

আমাদের মাঝে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের সংবিধান, আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদি খুব সুন্দর ও সাবলীল যৌগিক ভাষায় লিখিত, কিন্তু তবু এর সত্য-মিথ্যা বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এখনও উকিল, ব্যারিস্টার আর বিচারপতিদের হাইকোর্ট আর সুপ্রিমকোর্টে প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় এবং ভবিষ্যতেও এমনভাবেই চলবে।

ভাষার দেশ-কালকেন্দ্রিক দ্যোতনা বিভিন্ন মানুষের মাঝে ভিন্ন মাত্রায় থাকলেও ভাষা শেখা, বলা ও লেখার জৈব-মৌলিককাঠামো পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাঝেই থাকে। মানব-অচেতনে অঙ্কিত বা রক্ষিত ভাষাকাঠামোর রূপ ও স্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোত্রে বা সমাজে প্রায় একইরকম হওয়ার ফলে, রাম-রাবণের 'রামায়ণ' ও কুরু-পাণ্ডবের 'মহাভারত'-এর সাথে 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র কাঠামোগত মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মূল যে-বক্তব্য, তার মাঝেও প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মাইসেলীয় দার্শনিকদের বক্তব্যের সাথে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যে-মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তার মূল কারণ হিসেবেও উপস্থিত মানবিক-অচেতনে অঙ্কিত ভাষাকাঠামোর সর্বজনীন রূপ। নোয়াম চমস্কির ব্যাকরণ আর ক্লোদ লেভি-স্ত্রসের Structural Linguistics ভাষার এই সর্বজনীন রূপকে উদ্ধার করেছে এবং আমরা বুঝতে পারছি ভাষাহীন মানবসত্তা এই বিশ্বে অবস্থান করা অসম্ভব।

মানুষের সত্তা নিয়ে যে-বিজ্ঞান তাকে আমরা বলি Ontology. দার্শনিক হাইডেগার তাঁর সত্তাদর্শনে ঘোষণা দেন– ভাষার মাঝেই সত্তার অবস্থান– Language is the house of Being. Man dwells in this house. এ-প্রসঙ্গে হাইডেগার আরও বলেন– 'Language is the primordial poetry in which a people speaks being. Conversely, the great poetry in which a people enters into history initiates mulding of its language. The Greeks created and experienced this poetry through Homer. Language was made manifest to their being-there (Dasein) as departure into being as a configuration disclosing the essent'.

দার্শনিক হাইডেগার তাঁর দর্শনে মানবিক সত্তাকে প্রকাশ করেছেন Dasein (মৌলসত্তা) ও Dasman (পতিত সত্তা) হিসেবে। মৌলিক সত্তার উচ্চারণকে হাইডেগার বলেন জবফব বা সত্তা-ধ্বনি/সত্তা-কথা, যা সত্যমূল্যসহ বিশ্ববাস্তবতায় উপস্থিত হয়। একজন মৌলিক কবি তাঁর কবিতায় Dasein-এর 'সত্তা-কথা' উপস্থিত করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিশ্বের বস্তু ও ঘটনা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে তারা তাদের Dasein-কে হারিয়ে ফেলে এবং Dasman বা পতিত-সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে অবস্থান নেয়। এমন অবস্থায় তাদের ভাষা-উচ্চারণ হয়ে যায় Grede বা 'বাচাল/বাগাড়ম্বর' প্রকাশ। এই বাচাল উচ্চারণ বা grede থেকে আসল সত্য উদ্ধার করা অনেক সময় মুশকিল হয়ে পড়ে।

জাক লাকাঁ তাঁর দর্শনে মানবিক চেতনার অস্তিত্ববাদী সমস্যাগুলো আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং নির্ধারণ করতে চেয়েছেন অস্তিত্বের রূপ ও স্বরূপকে। মানুষের অস্তিত্ব যেহেতু 'মন' নামক একটি ধারণার সাথে জড়িত, সেহেতু অস্তিত্বের সমস্যা নির্ধারণের জন্য তাকে সবসময় ফ্রয়েডে ফিরে যেতে হয়েছে এবং একসময় জাক লাকাঁ উপলব্ধি করতে পারেন যে মানুষের অচেতন ভাষা দিয়ে সংগঠিত। তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভাষাকেন্দ্রিক রূপক ও

প্রতীকের সৃষ্টি নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা ফ্রয়েডীয় অচেতন, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব আর ক্লোদ লেভি-স্ত্রসের নৃতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। লাকাঁ ভাষাসৃষ্ট রূপক সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে অবদমিত ইচ্ছা ও বাসনার বারবার ফিরে আসার ঘটনা উন্মোচন করেছেন এবং তার এই মতবাদ গ্রহণ করলে আমাদের বলতে হবে হবে যে মানুষ বসবাস করে এক প্রতীকী শৃঙ্খলার জগতে আর এই প্রতীকী শৃঙ্খলা মূলত ভাষাসৃষ্ট।

জেনেটিক কারণেই মানুষের ভাষাকাঠামো তার জন্মের পূর্বেই কোষ-ক্রোমোজমে অবস্থান করে এবং একটি মানুষ জন্ম নেয় এক ভাষা-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে। এমন একটা পূর্বনির্ধারিত অবস্থাকে মেনে নিয়ে দার্শনিক লাকাঁ বলেন: Man speaks therefore, but is is because the symbol has made him man। জন্ম হওয়ার পরই একটি মানুষ বন্দি হয়ে যায় ভাষাসৃষ্ট সামাজিক নিয়মকানুনের সামাজিকতায়, আর এ-কারণেই সে কোনো অবস্থাতেই তার একান্ত নিজস্ব কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দিতে পারে না। ফ্রয়েড-বর্ণিত ইদিপাস-এষণা, ইলেক্ট্রা-এষণা, লিঙ্গ-কর্তন-ভীতি, লিঙ্গহীনতাজনিত হীনম্মন্যতা ইত্যাদি সামাজিক উপাদান হয়ে ভাষার মাধ্যমে একজন মানুষের মনে অবস্থান নেয়। যৌনসম্ভোগের ইচ্ছে/বাসনা মানুষের অচেতনে থাকে প্রচণ্ডভাবে, কিন্তু ভাষাসৃষ্ট সমাজের নিয়মকানুনের জন্য মানুষের সব যৌন-ইচ্ছে/বাসনা কখনোই পূর্ণ হয় না। সমাজ ও সভ্যতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন নিয়মকানুন মানুষের যৌন-ইচ্ছে/বাসনাকে অবদমিত করে রেখে দেয় অচেতন মনে। আত্মীয়-সম্ভোগকে কেন্দ্র করে যে-Incest taboo আমাদের সমাজে মৌখিক ও লিখিত ভাষায় উপস্থিত রয়েছে, তার সাথে আমাদের চেতন সত্তার কোনোরকম বিরোধ না থাকলেও আমাদের অচেতনে যৌনসম্ভোগকেন্দ্রিক ইচ্ছে বা বাসনা অবস্থান করে বিপরীত মেরুতে। লাকাঁ আত্মীয়তার নামকরণ বা Kinship nomination-কে সংগত কারণেই Incest taboo-র ঐতিহাসিক বিবর্তিত রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যে বাবা, মা, বোন, খালা, খালু, ভাই ইত্যাদি নামবাচক শব্দে আত্মীয়তার নাম দিচ্ছি, তার পেছনে থাকছে Incest taboo, অর্থাৎ আমরা আমাদের ভাষায় এ-নামবাচক শব্দগুলো উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি কার কাছে যৌনসম্ভোগ করা যাবে আর কার সাথে যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ। লাকাঁ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন: 'For without Kinship nomination, no power is capable of instituting the order of performances and taboos while bind and weave the yarn of lineage through succeeding generations.'

আমাদের সমাজ মূলত পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষপ্রধান। ভাষাসৃষ্ট প্রতীকী-শৃঙ্খলার মাধ্যমেই আমরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিই পিতা কিংবা পুরুষের প্রভুত্ব। এ-প্রসঙ্গে লাকাঁ বলেন: 'It is the name of the father that we must recognize the support of the symbolic function, which from the down of history, has identified his person with the figure of the law'. পিতা বা পুরুষের উগ্র শ্রেণীমর্যাদা আর সামাজিক নিয়মকানুনকে কেন্দ্র করে ইদিপাস-এষণা, ইলেক্ট্রা-এষণা ইত্যাদি মানুষের মনে কাজ করে তাকে লাকাঁ ভাষাসৃষ্ট লিঙ্গকেন্দ্রিক প্রতীকী-শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবেই গ্রাহ্য করেন। তবে লাকাঁর দর্শনে উপস্থিত লিঙ্গ কিন্তু রক্তমাংসের পুরুষাঙ্গ কিংবা ভগাঙ্কুর নয়; লিঙ্গের অবস্থান এখানে একটা প্রতীক কিংবা concept হিসেবেই বিবেচিত। আমরা লিঙ্গকেন্দ্রিক প্রতীকী ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের ওপর লিঙ্গের তাৎপর্য চাপিয়ে দিই এবং এর ফলেই বস্তু বা বিষয়ের মাঝে আমরা 'একটি পুরুষ' কিংবা 'একটি নারী'কেই খুঁজে পাই। লিঙ্গকে কেন্দ্র করে আমরা তৈরি

করি বিভিন্ন যুগ্ম-বৈপরীত্য যার মাঝে 'পুরুষ' হিসেবে চিহ্নিত বস্তুটির শ্রেণীমর্যাদা আমরা সব সময়ই উপরে রেখে দিই। আমরা সূর্যকে ভাবি পুরুষ, চাঁদকে ভাবি নারী, আলো যদি হয় 'পুরুষ' তবে অন্ধকার অবশ্যই নারী, পুরুষের জন্য যদি হয় 'বাহির' তবে নারীর জন্য হবে 'ঘর'। আর এমন সব পিতৃতান্ত্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্য নিয়েই আমরা অবস্থান করছি আমাদের ভাষার জগতে। এখানে বলা আবশ্যক যে দার্শনিক লাকাঁর লিঙ্গকেন্দ্রিক ভাষাদর্শন অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। লাকাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দার্শনিক জাক দেরিদা লৈঙ্গিক-অর্থকেন্দ্রিকতার (phallogocentrism) অভিযোগ এনেছেন।

দার্শনিক জাক দেরিদার প্রসঙ্গ যখন এলই, তখন তাঁর ভাষাদর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। জাক দেরিদা ছিলেন আমাদের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষাদার্শনিক এবং তাঁর দর্শন মূলত অধিবিদ্যা বা Metaphysics-এর সমালোচনা।

এ-কাজ করতে গিয়ে দেরিদা হুর্সাল, নিৎসে, হাইডেগার, সস্যুর, ফ্রয়েড প্রমুখ দার্শনিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তিনি প্লেটো, হেগেল, রুশো, লেভি-স্ত্রস, সস্যুর, হাইডেগার, ফুকো, হুর্সাল, সার্ত্রে, নিৎসে-সহ অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শনের সমালোচক হিসেবে উপস্থিত করেছেন নিজেকে।

ভাষাদার্শনিক দেরিদার চিন্তাধারার মূল কথা হল, রূপান্তরহীন ধ্রুব অর্থ (meaning) কিংবা ধারণা (concept)-কে ভাষাচিহ্নের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে নেওয়া। আমরা সচরাচর ভাষা-প্রয়োগের সময় কোনো-একটা নির্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র বা centre ধরে শব্দ উচ্চারণ করি কিংবা লিখিতভাবে পেশ করি। কিন্তু বাস্তবে ভাষাচিহ্নের কোনো ধ্রুব অর্থকেন্দ্রিক অবস্থান নেই। দেশকালকে কেন্দ্র করে একই ভাষাচিহ্ন বিভিন্ন সময় বিভিন্নরকম দ্যোতক/দ্যোতনা উপস্থিত করতে পারে। বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। 'বাড়ি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল: ঘর, আবাস কিংবা নিবাস। আমরা যখন বলি– 'আমরা বাড়ি যাব', তখন বাক্যটি একটি মৌলিক উচ্চারণ হয়ে বোঝাবে যে আমাদের গন্তব্য হল আমাদের ঘর কিংবা আবাসস্থল। কিন্তু এই 'বাড়ি' শব্দটি দিয়ে যদি উচ্চারণ করি– 'আমরা চৌধুরী-বাড়ি যাব', তখন 'বাড়ি' শব্দটি একটি নতুন মাত্রায় দ্যোতিত হবে এবং বোঝাবে যে অনেকগুলো 'বাড়ি'র সমন্বয়ে গঠিত চৌধুরীদের আবাসস্থল হল আমাদের গন্তব্য। একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধলোক যদি উচ্চারণ করে– 'আর না, এখন আমার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে', তখন 'বাড়ি' অর্থটি হয়ে যাবে thenatos বা মৃত্যুকামকেন্দ্রিক ইচ্ছে বা বাসনা।

দার্শনিক হাইডেগার যখন বলেন– 'language is the house of being. Man dwells in this house' তখন আবার 'house বা বাড়ি'-র অর্থ চলে যায় অন্যরকম এক মাত্রায়। ভাষার প্রতিটি শব্দেরই এমন দেশকালকেন্দ্রিক বিভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং একটি বাক্যের গঠন, দেশ ও কালকেন্দ্রিক অবস্থান আর পাঠক বা শ্রোতার competence আর performance-কে কেন্দ্র করে একই শব্দ বিভিন্ন মাত্রায় দ্যোতিত হতে পারে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে: ভাষামাধ্যমে চিন্তা প্রকাশ করতে গেলেই অযথাই 'কেন্দ্র বা centre' তৈরি করে আমরা অর্থ উদ্ধার করি কেন? প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঐতিহাসিক অতীতে এবং কোনো-এক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রশ্নটির উত্তর উদ্ধার

করতে হবে। আমাদের গুহামানব পূর্বপুরুষরা তাদের অল্পসল্প শব্দভাণ্ডার নিয়ে পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করত এবং তাদের ঈশ্বর ছিল প্রকৃতি। সূর্য, চন্দ্র, আগুন, বৃক্ষ, সাগর ইত্যাদিকে তারা ভাবত জীবনরক্ষাকারী ঈশ্বরতুল্য উপাদান। বজ্রের শব্দ, ঝড়ের শব্দ, অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাতের শব্দ ইত্যাদি আমাদের পূর্বপুরুষ গুহামানবদের কাছে উপস্থিত হত 'ঈশ্বরের শব্দ' হিসেবে। পরবর্তীকালে, ধর্মদর্শনের যুগেও আমরা 'শব্দ'কে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত রেখেছি। ঈশ্বর বললেন 'হও' আর তাঁর আদেশেই সৃষ্টি হল বিশ্বজগতের– এমন বয়ান আমরা ধর্মগ্রন্থে পাব। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে যে দৈবী 'বাক্' বা 'ধ্বনি' হল একমাত্র আদি স্পন্দন এবং ব্রহ্ম ও বাক্ এক ও অভিন্ন সত্তা। সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্ম, লাটিন শব্দ Verbum Logus ও ইংরেজি শব্দ word-এর মূলে অবস্থান করছে এক অপৌরুষেয় শব্দব্রহ্ম বা Logos, যাকে দেরিদা উপস্থিত করেছেন শব্দব্রহ্মবাদ বা Logocentrism হিসেবে।

আমাদের ভাষা-প্রয়োগে সবসময় শব্দব্রহ্মবাদী বা Logocentrism চিন্তাচেতনা এখনও কাজ করে এবং এর ফলেই আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকছে ভাষাসৃষ্ট কিছু চিন্তনকেন্দ্র (centre) এবং ধ্রুব উপস্থিতি (presence)। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি ভাষাচিহ্নের চরিত্র খুবই তুলতুলে ও অস্থির এবং এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট ভাষাচিহ্ন কিংবা ভাষাচিহ্নসৃষ্ট বাক্য কোনোরকম কেন্দ্র তৈরি করে না, ভাষায় থাকে না কোনো অর্থকেন্দ্রিক ধ্রুবক। ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে দেরিদা ব্যবহার করেছেন Differance নামে একটি 'বাক্সবন্দি' (Portmanteau) শব্দ, যার মাঝে লুকিয়ে আছে La Difference (স্থগন) এবং La Diffarence (পার্থক্য)। আমাদের উচ্চারিত বা লিখিত ভাষায় সবসময় 'বিচ্ছেদ' বা 'Differance' কাজ করছে, আর এর ফলে প্রতিটি ভাষাচিহ্নের দেশকালকেন্দ্রিক দ্যোতনা স্থগিত হয়ে এবং পরস্পরের সাথে পার্থক্য রচনা করে নিত্য-নতুন অর্থ বা দ্যোতনা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। একটি লিখিত কিংবা উচ্চারিত বাক্যের খণ্ডাংশে কোনো শব্দেরই নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, এমনকি সত্যি বলতে গেলে ঐসব শব্দের কোনো ধ্রুব উপস্থিতি বা অস্তিত্বও নেই। ভাষাতে 'বিচ্ছেদ' বা 'differance' প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকার কারণে ভাষার উচ্চারণ কিংবা লিখিত রূপের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র (centre) নেই, নেই কোনো অর্থকেন্দ্রিক ধ্রুব উপস্থিতি। ভাষার এই তুলতুলে গতিশীল চরিত্র ভাষাতে নিয়ে আসে অর্থকেন্দ্রিক Free play বা মুক্তক্রীড়া এবং এর ফলে ভাষা হয়ে ওঠে deconstruction বা বিনির্মাণযোগ্য। দেশকাল মাত্রায় ভাষার প্রকাশ কোনো-একটি অর্থ জোগান দিয়ে, উপস্থিতির ছাপ (Trace) রেখে, স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তী কোনো-এক দেশকাল মাত্রায় আবার তা নতুন এক অর্থ নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। এমন অবস্থায় আমরা যদি আমাদের অন্ধবিশ্বাস নিয়ে, কোনো-এক নির্দিষ্ট চিন্তার কেন্দ্র তৈরি করে, ভাষায় সত্যকে বুঝতে চাই, তবে তা নিঃসন্দেহে অধিবিদ্যা বা metaphysics-এর বিষয় হবে। দার্শনিক জাক দেরিদা ভাষা থেকে এই metaphysics-কেই বাদ দিতে চান এবং ঘোষণা দেন: 'There is nothing outside text'।

ঘুমপাড়ানি ছড়াগানের বিনির্মাণ ও বিশ্লেষণ

ঘুমপাড়ানি এক ছড়াগানের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক তত্ত্বকথা বলা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি হয়ে গেল অনেকটা 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার' মতো? প্রবন্ধের লেখক হিসেবে আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। একটি সাধারণ অসাধারণ ছড়া-গানে আমরা দেখতে পাব সস্যুর-কথিত ভাষাচিহ্নের সময়কেন্দ্রিক দ্যোতক/দ্যোতিতের খেলা, লাকাঁর ভাষামনস্তত্ত্ব, হাইডেগারের ডাজাইন কিংবা মৌলসত্তার সত্যকথন। ছড়াটিতে যে-ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে তার দেরিদীয় Deconstruction বা বিনির্মাণ করলে আমাদের বর্তমান দেশকাল মাত্রায় তা গ্রহণযোগ্য মনে হবে। আমরা যদি ছড়াটিকে কাঠামোবাদী সাহিত্যতত্ত্বের (Structural Literary Theory) আলোকে বিচার করি তা হলেও আমাদের বলতে হবে যে এমন একটা ছড়াগান আমাদের সময়কে গ্রাহ্য করেও লেখা সম্ভব। ভাষাদার্শনিক রোলা বার্থের সেই বিখ্যাত বক্তব্য– always already written-কে মেনে নিয়ে আমাদের আরও বলতে হবে যে, শব্দের কিছু নতুন বিন্যাসে ছড়াটি আমাদের বর্তমানেও রচিত হতে পারত।
ছড়াটিতে সর্বমোট আটটি পঙ্‌ক্তি আছে, যা ক্রমানুসারে সাজালে হবে নিম্নরূপ:

ক. ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল
খ. বর্গি এল দেশে
গ. বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
ঘ. খাজনা দেব কিসে?
ঙ. ধান ফুরাল, পান ফুরাল
চ. খাজনার উপায় কী?
ছ. আর কটা দিন সবুর করো
জ. রসুন বুনেছি।

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোর দিকে একটু নজর দিলেই আমরা বুঝতে পারব যে প্রতিটি বাক্যটি হ্বিটগেনেস্টাইনের ভাষাদর্শনের উল্লেখিত Atomic Sentence বা মৌলিক বাক্য। ছড়াটিতে কোনো Atomic Sentence না থাকলেও, আটটি পঙ্‌ক্তি একসাথে পড়লেই ছড়ার ছন্দগুণ ও বক্তব্য আমাদের চিন্তাচেতনায় এক ধরনের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। আমরা যদি নোয়াম চমস্কির Literary Competence আর Performance সহ ছড়াটির ব্যঞ্জনা নিয়ে চিন্তা করি তবে দেখতে পাব যে ঐতিহাসিক ঐ ছড়াটিতে আমাদের সময়ের সমাজচিত্রও লুকিয়ে আছে। দার্শনিক হাইডেগার কবিতাকে Dasein বা মৌলিক সত্তার সত্যবচন হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এ-কারণেই আমরা বলব এই ছড়াটির কবি/ছড়াকার ছিলেন এক মৌলিক সত্তার মানুষ এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক Rede বা সত্তাকথা তাঁর সমাজের সত্যকে তুলে ধরেছে সত্যমূল্য (truth function) সহ। ছড়াটির বক্তব্য যেহেতু সময়কে অতিক্রম করে বর্তমানে এসেও সত্য, তাই ছড়াটির বিনির্মাণ ও বিশ্লেষণে আমরা কী পাই তা দেখা যাক।

ক. ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল

পঙ্‌ক্তিতে আমরা আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিত্র দেখতে পাই, যা আমাদের সমাজ-মনস্তত্ত্বের অংশ হয়ে এখনও সত্য। ছেলে ঘুমালে পাড়া জুড়ায়, ডানপিটে ছেলেদের হাত থেকে পাড়াপড়শিরা কিছুটা স্বস্তি পায়, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্নটা হল– একটা মেয়ে না ঘুমালে কী হয়? একটি মেয়ে না ঘুমালে কিছুই আসে যায় না, কারণ সে তো সবসময় জেগেও ঘুমিয়ে আছে। আর যদিও-বা জেগে থাকে, তবুও তার পা রান্নাঘর পেরিয়ে বড়জোর উঠোনে যাবে, যদি আরও একটু বেশি দূর যায় তবে তা কোনোভাবেই পুকুরঘাটের শেষ ধাপ পেরিয়ে অন্য কোথাও যাবে না।

ছড়ার পঙ্‌ক্তিটি পড়ে আরও কিছু মৌলিক প্রশ্ন আসতে পারে। মৌলসত্তার অধিকারী এক ছড়াকার ইতিহাসের হারানো কোনো-এক দিনে বসে ছড়াটি কি শুধুমাত্র ছেলেদের ঘুমপাড়ানোর জন্য লিখেছিলেন? মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর জন্য কি মায়েদের ছড়াগান গাইতে হয় না কিংবা নিয়ম নেই? জেগে থেকে শিশুসুলভ দুষ্টুমি করার কিংবা চঞ্চল থাকার অধিকার কি মেয়েদের থাকতে পারে না? সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আমরা দিই তবে বলব– ছড়াটি ছেলেমেয়ে দুজনের জন্যই লেখা: মায়েরা ছেলে কিংবা মেয়ে যা-ই-হোক-না কেন, ছড়াগানটি গাইতে পারে; আর একটি মেয়েরও শিশুসুলভ দুষ্টমি, চঞ্চলতা থাকতে পারে। মানুষ যুক্তিবাদী, তবুও মৌলসত্তা অধিকারী ছড়াকার শুধুমাত্র 'ছেলে' ঘুমানোর কথা বললেন কেন? মানুষের সত্তার উচ্চারণ যেহেতু বাচাল (grede) বক্তব্য রাখে না, তাই আমরা বলতে পারি আমাদের ঐ ঐতিহাসিক ছড়াকারের মনস্তত্ত্ব পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আর আইনকানুন দিয়ে প্রভাবিত ছিল।

বাংলাদেশের জনগণকে ঐতিহাসিকভাবেই বলা হত বঙ্গাল বা বাঙাল, আর এই বাঙালদের সমাজসংগঠন সবসময় ছিল পুরুষতান্ত্রিক। সন্তান গর্ভে আসলেই সবাই একটা 'ছেলে'-সন্তান কামনা করত আর কন্যাসন্তানের জন্ম হলেই বজ্রপাত হত কন্যাসন্তানের পরিবারে। যে-মেয়েসন্তান জন্মের সময়ই অভিনন্দিত হয়নি, তার ভাগ্যে পরবর্তীকালেও জুটত অবহেলা আর গঞ্জনা। সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী কৌলীন্যপ্রথা থাকার কারণে শৈশবকালেই কন্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তেন বাবা আর মা। কন্যাসন্তান একটু চঞ্চল হলে, দুষ্টুমি করলে তা মা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে– 'জন্মের সময় তুই মরলি না কেন?' বলতে দ্বিধা করত না। এ-প্রসঙ্গে ড. অতুল সুর লিখেছেন– 'যে সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল ও মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সমাজে মেয়েকে অপসারণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পিতামাতার মনে জেগেছিল। সেজন্য গঙ্গাসাগরের মেলায় নিয়ে মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা এ দেশে একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। ...অনেক আবার মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট তাদের দান করতেন। ...এদের দেবদাসী বলা হত।' যে-কন্যাসন্তানের মৃত্যুকামনা করেন বাবা-মা, যাকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, যাকে দেবদাসী বানানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তাকে নিয়ে কোনো মা ঘুমপাড়ানি গান গাইবেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। আর তাই একটি মেয়েকে ছড়ার পঙ্‌ক্তিতে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই আনতে পারেননি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বসবাসরত আমাদের এই ঐতিহাসিক সময়ের ছড়াকার।

আমাদের বর্তমান বাস্তবেও উক্ত পঙ্‌ক্তিটি কিছুটা বিনির্মাণসহ এখনও সত্য। এখনও আমরা সন্তান গর্ভে এলে অচেতনভাবে হলেও একটি ছেলেসন্তান কামনা করি। আলট্রাসোনোগ্রামে যদি দেখা যায় যে সন্তানটি কন্যা, তবে বেদনামধুর এক হাসি হেসে আমরা মৌখিকভাবে বলি– 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, যা-ই হোক, তা নিয়ে আমরা চিন্তা করিনি।' আর আমাদের ছেলেরা তো এখন আর ঘুমায় না, পাড়াও জুড়ায় না। আমাদের বর্তমানের ছেলেরা ব্যস্ত মাস্তানিতে, চাঁদাবাজিতে, বড় বড় গডফাদার ছেলেদের আদেশে বড় বড় কুকর্ম করাতে। আর আমাদের কন্যারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সদস্য হয়ে হচ্ছে যৌতুকের বলি, ধর্ষণের বস্তু, সমাজ ও ভাষাসন্ত্রাসের শিকার।

খ. বর্গি এল দেশে

বাংলাদেশে বর্গিদের আক্রমণ হয়েছিল ১৭৪২ থেকে আরম্ভ করে ১৭৫১ পর্যন্ত। বেরারের মারাঠা সন্ত্রাসী রঘুজি ভোঁসলে, ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক লোককে দলপতি করে প্রায় চল্লিশ হাজার দস্যুকে বাংলাদেশ আর উড়িষ্যায় পাঠিয়েছিল দস্যুবৃত্তি করার জন্য। নবাব আলিবর্দি খান তখন বাংলা-বিহার আর উড়িষ্যার মসনদে। মারাঠা দস্যু বা বর্গিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার গ্রামগঞ্জে হামলা করে লুণ্ঠন করা, চাঁদাবাজি করা। বর্গির এই হামলা বাংলাদেশের বঙ্গালদের জন্য এক মহাদুঃস্বপ্নের সময় ছিল। বর্গিদের হামলার সময় রচিত বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পু', কবি গঙ্গারাম দাসের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' আর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' আমরা বর্গি-হামলার ভীতিপ্রদ চিত্র পাই। কবি ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন–

লুঠি বাংলার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপাল হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউরী কছড়ী॥

সমকালীন যে-কোনো ঘটনার প্রতিফলন ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, নাটক, যাত্রা ইত্যাদিতে আবশ্যিকভাবে পাওয়া যায় এবং এ-কারণে আমরা ভাবতে পারি যে আমাদের আলোচ্য ঘুমপাড়ানি ছড়াটি বর্গির হামলার কোনো-এক সময়ে রচিত। পরবর্তীকালে মানুষের মুখে-মুখে চর্চিত হয়ে হয়তো-বা ছড়াটি আধুনিক ভাষাবিন্যাসে এখন উপস্থিত, কিন্তু ছড়াটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি– 'বর্গি এল দেশে'– ঐতিহাসিক এক সময়ের সমাজচিত্রকে তুলে ধরেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মায়েরা ছেলেমেয়েকে ভয় দেখানোর জন্য 'ভূত', 'বাঘ', 'ম্যাও (বিড়াল)', 'পাগল', 'বাবা', 'দাদা', 'মৌলবি', 'মাস্টার' ইত্যাদির ব্যবহার করেন। 'বাঘ আইলো, ভূত আইলো... বাবা আইলো, দাদা আইলো'– এরকম মিথ্যা বাক্যের ব্যবহার করে শিশুর মনে একধরনের 'মিথ্যা-ভয়' ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আমাদের আছে। আর-একটু খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাব যে, 'মিথ্যা-ভয়' দেখানোর চরিত্রগুলো প্রায় সবই 'পুরুষ'। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'মিথ্যা-ভয়' দেখানোর চরিত্রও পুরুষ হবে এটা স্বাভাবিক, কারণ আমাদের সমাজের 'পুরুষ' মানেই 'ভয়'।

১৭৪২ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত যে-বর্গির হামলা বাংলাদেশে হয়েছিল, ঠিক একই রকম হামলা আমাদের দেশে সবসময়ই হয়েছে। তবে 'বর্গি'র নাম বদল হয়ে হয়েছে 'ব্রাহ্মণ', 'মৌলবি', 'জমিদার', 'পাঠান', 'মোগল', 'পাকিস্তানি', 'রাজাকার', 'মাস্তান', 'মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি', 'ঘুষখোর আমলা', 'প্রতারক রাজনীতিবিদ', 'পুলিশ' ইত্যাদি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ছড়াগানের 'বর্গি'রা তাদের নাম deconstruction বা বিনির্মাণ করে নতুন নামে এখনও আমাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করছে।

গ. বুলবুলিতে ধান খেয়েছে

ছড়ার এই পঙ্‌ক্তিতে উল্লিখিত 'বুলবুলি' একটি প্রতীকী শব্দ এবং এর এর দ্যোতনা/ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক। একটি ধানক্ষেত থেকে কিছু ধান বুলবুলি পাখি খেয়ে ফেললে দেশে আকাল হয়, এমন ভাবা ঠিক না। আমাদের ঐতিহাসিক ছড়াকারও এ-সত্য জানতেন এবং তিনি তাই 'বুলবুলি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি প্রতীক হিসেবে, অন্যরকম বুলবুলি বোঝাতে, যারা সত্যি সত্যি বাংলার মানুষকে শোষণ করছে।

বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গভূমি ছিল প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি-অস্ত্রাল বঙ্গাল কৌমসমাজের আবাসস্থল। পরবর্তী সময়ে এখানে দ্রাবিড়রা আসে। একসময় প্রাক-দ্রাবিড় বঙ্গাল ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী একাকার হয়ে বঙ্গাল জাতি হিসেবেই বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙারিত্তী, তাম্রলিপি, সূক্ষ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের আদি রাজ্যসীমানাগুলোতে বসবাস করতে থাকে। বঙ্গালদের মাঝে প্রথম 'বুলবুলি' হিসেবে আসে উত্তরভারতীয় বৈদিক ব্রাহ্মণরা। বর্মণ, সেন ও দেব নরপতিদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্রাহ্মণরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের মুখোশ চাপিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদে 'গাঁই' বা 'গাঞি' স্থাপন করে 'জাত-পাত' ও 'কৌলীন্য'-প্রথার প্রসার ঘটায়। এই ব্রাহ্মণ 'বুলবুলি'দের মুখে একটা কথাই উচ্চারিত হত বেশি– 'আমাদের তুষ্ট করো, সুখ দাও, মুক্তি পাবে।' সমাজশোষণের জন্য ব্রাহ্মণ 'বুলবুলি'রা কী কী বলত তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক–

: ব্রাহ্মণের সেবাই হল ইহলোক ও পরলোক সবকিছু লাভ করার একমাত্র পথ।

: চিত্রা নক্ষত্রে আমাকে একটি বৃষ আর সুগন্ধিদ্রব্য দাও, নন্দনকাননে অপ্সরাবিহার করতে পারবে।

: ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রভাবেই সাগরের জল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে, উহাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনো প্রশমিত হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উহাদের মধ্যে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন– তাহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা বিধেয়।

: ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্যে নিযুক্ত থাকে, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জানিয়া সমাদর করবে।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি নামক এক তুর্কি সৈনিক মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের নবদ্বীপস্থ প্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং বাংলাদেশের নতুন 'বুলবুলি' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জন-গণ-বিচ্ছিন্ন লক্ষ্মণ সেন তার প্রজাদের কথা চিন্তা না করেই পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান আর লক্ষ্মণ সেনের রাজকবি উমাপতি ধর নতুন 'বুলবুলি'কে স্বাগতম জানিয়ে লেখেন: 'ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, সাধু! আপনার মাতা বীরপ্রসবিনী; নীচ হইলেও আপনার মতো লোকের জন্য বসুধা এখনও সুক্ষত্রিয় আছে।' স্বার্থের খাতিরে এক 'বুলবুলি' যে অন্য এক 'বুলবুলি'কে স্বাগতম জানাতে পারে তা বোঝা যায় উমাপতি ধরের লেখা উপরিউক্ত শ্লোকটি পড়লে।

মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হবার পর বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পায় মুসলমান ও বহিরাগত শাসক বুলবুলিরা। তুর্কি, পাঠান ও মোগল বুলবুলিরা বাংলাদেশ শাসন করে পাঁচশত বছরের অধিককাল। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজরা বাংলাদেশের দেওয়ানি লাভ করে এবং বাংলাদেশের বঙ্গাল বা বঙাল জনগণের সাথে পরিচয় হয় ভিনদেশি বেনিয়া ব্রিটিশ বুলবুলিদের। এখানে উল্লেখ্য যে তুর্কি, পাঠান, মোগল কিংবা ব্রিটিশ শাসনামলে প্রজাশোষণকাজে সবসময়ই দেশীয় 'বুলবুলি'রা সাহায্য করত। এই সাহায্যকারী বুলবুলিদের নাম ছিল দবির, খান-ই-জাহান, মজলিস-অলআলা, মজলিস বারবক, সিলাহাদার, দাবির-ই-খাস, জমিদার, নায়েব, পাইক, বরকন্দাজ, খানবাহাদুর, রায়বাহাদুর, চৌধুরী, তালুকদার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর, পুলিশ সুপার ইত্যাদি, ইত্যাদি। বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু ছিল অদৃষ্টবাদী, ধর্মভীরু তাই পুরুত-ঠাকুর, মোল্লা-মৌলবি, পির-ফকির, সাধু-সন্ত-ঋষি ইত্যাদি নামের সাহায্যকারী বুলবুলিও অবস্থান করত।

১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ হয়ে যায় পূর্বপাকিস্তান, আর পাকিস্তান হওয়ার সাথে সাথেই ধর্মের সাম্যবাদী খোলস ফেলে দিয়ে বাংলাদেশকে শোষণ করতে থাকে পাকিস্তানি বুলবুলিরা, তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের সাথে নিয়ে। আদমজি, বাওয়ানি, দাউদদের মতো বেনিয়া গ্রুপ ও তার সাথে যুক্ত আন্তর্জাতিক চক্র শোষণ করতে থাকে বাংলাদেশের বঙ্গাল কিংবা বাঙালদের। ১৯৭১ সালে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বাধীনতা প্রথমবারের মতো ফিরে পায় আর পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গালরা মিশে যায় সর্বভারতীয় হিন্দু-জাতীয়তাবাদে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও 'বুলবুলি'দের উৎপাত কমেনি। আদমজি, বাওয়ানির জায়গায় স্থান নিয়েছে কিছু দেশীয় গ্রুপ। দেশীয় রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলা নিজেরাই 'বুলবুলি' হয়ে সাহায্য করছে সমাজশোষণে, আর 'আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ' হচ্ছে দেশি ও বিদেশি 'বুলবুলি'রা।

ঘ. খাজনা দেব কিসে?

সেই আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষ বারবার মন্বন্তর, মহামন্বন্তরের সম্মুখীন হয়েছে। এইসব মন্বন্তরের কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ছিল না, বেনিয়া মহাজন ও জমিদারদের ভূমিকাও ছিল প্রচুর। বাংলাদেশে টাকায় যখন আট-দশ মণ ধান পাওয়া যেত তখন মানুষ মরেছে না-খেয়ে; আর কিছু সুবিধাবাদী মজুতদার, মহাজন টাকার পাহাড় গড়েছে বাংলার জনগণের মৃতদেহ গুনতে গুনতে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সবসময় দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে জীবনযাপন করলেও, জমিদার কিংবা সরকারের খাজনা কিংবা কর ফাঁকি দিতে চায়নি। মনের

দিক থেকে নিতান্তই সহজ-সরল মানুষ ছিল তারা। জাতপাতকেন্দ্রিক বিভাজন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-শোষণ আর হতদরিদ্র থাকার ফলে অনেক সময় বাংলার মানুষেরা কিছুটা স্বার্থপর কিংবা পরশ্রীকাতর হয়তো-বা ছিল, কিন্তু তারা জমিদার বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মনমানসিকতা রাখত না। আমাদের আলোচিত ছড়াটিতে তাই এক অজানা দুঃসময়ের দিনকে চিন্তা করে উচ্চারিত হয়েছে সত্তার সত্য কথা– 'খাজনা দেব কিসে'?

আমাদের বর্তমানে, 'টাকার কুমির'রা সরকারের কর বা খাজনা ফাঁকি দিতে গিয়েই প্রশ্ন করে উল্টো: 'খাজনা দেব কিসে'? এখন যে যত টাকার মালিক, ঠিক ততটাই কর ফাঁকি দেয় সে। তারাই ব্যাংক থেকে পায় সর্বোচ্চ সুবিধা। যারা নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত, তারা খাজনা আদায়ের তহশিল অফিস, আয়কর কর্মকর্তা আর ব্যাংকের সুনজরে কখনোই আসতে পারে না, ফলে তারাই হয় হয়রানির শিকার।

ঙ. ধান ফুরাল, পান ফুরাল

এই পঙ্‌ক্তিতে ধান ও পান শব্দদ্বয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বুলবুলিতে ধান খেয়ে ফেলেছে, তাতে বাংলার জনগণ কিংবা কৃষকের পেটে ভাত নেই, খাজনা কীভাবে দেবে সে-চিন্তায় অস্থির তারা। কিন্তু হঠাৎ করে ছড়াকার 'পান' শব্দটি প্রয়োগ করলেন কেন? এর কারণ হতে পারে দুটো। প্রথমত, হয়তো-বা ঐ সময় 'পান' ছিল অর্থকরী ফসল।

পানের ফলন ভালো না হওয়াতে কৃষক খাজনা আদায় নিয়ে চিন্তিত আর আমাদের ছড়াকার এ-কারণটি 'পান' শব্দটি 'ধান'-এর সাথে জুড়ে দিয়েছেন। 'পান' শব্দটি যোগ করার দ্বিতীয় কারণটি হতে পারে এক 'আনন্দহীন বিপর্যস্ত' মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করার ইচ্ছে। আমরা জানি পান বা তাম্বুলসেবন ছিল বঙ্গালদের জন্য এক আনন্দকর বিষয়। অবসর সময়ে পান খেতে খেতে আড্ডা মারা, গল্প করা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ধান যখন ঘরে থাকে না তখন পান খাওয়া বা আনন্দ করা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু না। তাই যদি ভাবা যায় যে 'আনন্দ' শব্দটাকেই 'পান' দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন ছড়াকার, তবে তা অযৌক্তিক হবে না।

আমাদের বর্তমান সময়ের দরিদ্র মানুষ জীবনধারণের জন্য প্রাত্যহিক সংগ্রামে লিপ্ত তাদের ঘরে প্রয়োজনীয় ধান নেই; নেই আনন্দও (পান)।

চ. খাজনার উপায় কী?

ঘরে ধান নেই, মনে নেই আনন্দ, কিন্তু একথা তো জমিদার শুনবে না। জমিদারের খাজনা দিতেই হবে। আর আমাদের বঙ্গাল কৃষকজনতা খাজনা দিতেও প্রস্তুত। খাজনা কীভাবে দেবে তা নিয়ে স্বপ্ন বুনছে সে, প্রশ্ন করছে নিজেই নিজেকে। আমাদের ছড়াকারও তাই একটা প্রশ্ন রেখেই উত্তর খুঁজছেন– কীভাবে খাজনা আদায় হবে।

আমাদের এই সময়েও এ ধরনের স্বপ্নকেন্দ্রিক প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকে আর তারা ভাবে একটা-না-একটা উপায় হবেই হবে।

ছ. আর কটা দিন সবুর করো

'সবুরে মেওয়া ফলে' একথা জানত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দিনের বঙ্গালসমাজ, তারা বিশ্বাস করত মনেপ্রাণে যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে শান্তি আসবেই। তাদের ব্রাহ্মণঠাকুর তাদের

বলেছেন– 'তোরা অচ্ছুত হয়েছিস তোদের পূর্বজন্মের কর্মদোষে। এ-জন্যে ব্রাহ্মণসেবা কর, অপেক্ষা কর, পরজন্মে নির্বাণ লাভ না করিস, অন্তত শিয়াল-কুকুর হয়ে হয়ে জন্মাবি না। যদি ব্রাহ্মণসেবা ভালোভাবে করিস তবে হয়তো-বা পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও জন্ম নিতে পারিস।' খানকা শরিফের হুজুর বলেছেন– 'আল্লাহ হাতের পাঁচটা আঙুল সমান করেননি। বড়লোক হওয়া আর গরিব হওয়া সবই আল্লার ইচ্ছে। আল্লাহ তোদের পরীক্ষা নিচ্ছে, এই দুনিয়াতে তোরা কষ্ট করছিস, অপেক্ষা কর, আখেরাতে তোদের শান্তি মিলবে ইনশাল্লাহ'। বাংলার জনগণ 'সবুর' করার 'ফলাফল' নিয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত আর তাদের সমাজমনস্তত্ত্ব গ্রাহ্য করেই আমাদের ছড়াকার 'সবুর' করার বিষয়টা ছড়াতে এনেছেন।

একবিংশ শতাব্দিতে এসেও যাদের কিছু নেই তারা 'সবুর' করা কিংবা 'অপেক্ষা' করাতে বিশ্বাসী। কিন্তু যাদের টাকা আছে, সম্পদ আছে, তারা 'সবুর' করতে কিংবা 'অপেক্ষা' করতে মোটেও রাজি নন। তাঁদের সব চাই– এই এখনই।

জ. রসুন বুনেছি

যার কিছু নেই তার আছে স্বপ্ন। ধান খেয়েছে বুলবুলি, পানও (আনন্দ) ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তবু অপেক্ষা করতেই হবে, খাজনা আদায় না করলে জমিদার ছাড়বে না। অতএব, সেই স্বপ্নের 'রসুন'ই একমাত্র ভরসা। রসুনক্ষেতে অনেক রসুন হবে, তা বিক্রি করে খাজনা আদায় হবে, মনে আনন্দ আসবে, পেট ভরে খেতে পারবে– এমন চিন্তা থেকেই ছড়াকার 'রসুন বুনেছি' শব্দদ্বয় ছড়াটিতে যোগ করেছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করে, সাগরজলে ভাসিয়ে দিতে চায়, দেবদাসী বানাতে চায়, তার কারণ হল মেয়েরা 'রসুন' না। একটি ছেলে অবশ্যই 'রসুন'– তাকে বোনা হলে আগামীতে যে ঘরে সম্পদ আনবে, আবারও 'পান' খাওয়া যাবে, দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না।

এই বর্তমানেও আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী 'রসুন' বোনার স্বপ্ন দেখে। আর যাদের সম্পদ আছে, টাকা আছে, তারা স্বপ্ন দেখে না, বাস্তবে থেকেই সব 'রসুন' গোলায় তুলে নেয়।

উপসংহার

একটি সাধারণ অসাধারণ ছড়া নিয়ে এতবড় একটা প্রবন্ধ লেখা ঠিক হল কি না জানি না। তবে এই যখন ছড়াটিকে একটু বিনির্মাণ করে নতুনভাবে লিখতে ইচ্ছে করছে। লিখে ফেললাম–

ছেলে ঘুমায় না, পাড়া জুড়ায় না
মাস্তান-এর এই দেশে,
উজির নাজির সব কেড়ে নেয়
সন্ত-সাধুর বেশে।

দেশটা গেল, মরছে মানুষ
বাঁচার উপায় কী?
সময়ে সব উলটে যাবে,
জীবন বুনেছি।

তথ্যপঞ্জি

১. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাক লাকাঁ বা পিতৃনামের পরাক্রম, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৮ ।
২. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাক দেরিদা বা দর্শনের আত্মহত্যা, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৫ ।
৩. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৯৪ ।
৪. অভিজিৎ চক্রবর্তী, জাক দেরিদা, রক্তকরবী, কলিকাতা, ১৯৯৭ ।
৫. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৪১ ।
৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬ ।
৭. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭ ।
৮. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৪ ।
9. Lodge, David, Modern Criticism and Theory, Longman, 1988.
10. Pears, D. Wittgenstein, Fontana Press, 1985.
11. Selden, Roman, A Readers Guide to Contemporary Literaty Theory. The Hervester Press, 1986.
12. Steiner, George, Heidgger, Fontana Press, 1987.

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ

পূর্বকথা

আমি একজন খাঁটি বঙ্গাল বা বাঙালি । কিন্তু আমার আদি-অস্ত্রাল রক্তে হঠাৎ কিছু মঙ্গোলিয়ান উপাদান ঢুকে যাওয়াতে, আমার নাকটি হয়ে গেল বোঁচা । নাকের উচ্চতা যাই হোক না কেন, মাঝে মধ্যে তবু আমার ইচ্ছা করে এই বিখ্যাত বোঁচা নাকটা কেটেই অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করি । ইদানিং ইচ্ছেটা আরও বেড়ে গেছে । আমি যখন দেখলাম, বিএনপি-র যাত্রা ভঙ্গ করতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ নিজের নাক কেটে শায়খুল হাদিস-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেলেছে, ফতোয়া দেয়ার পক্ষে চলে গেছে, তখন আমার বোঁচা নাক রক্ষা করার কোনো যৌক্তিক কারণ আছে বলে আর মনে হয় না । অনেক ভাবনা-চিন্তা করেই আমি তাই আমার নাক কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং কার যাত্রা ভঙ্গ করে আমার সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, তা যাচাই করার জন্য ইদানিং গবেষণায় ব্যস্ত আছি । আমি যখন গবেষণায় ব্যস্ত, তখন একটি চুট্‌কি-র সন্ধান পেলাম । চুট্‌কি-টা ছিল নিম্নরূপ:

এক সাধু-সন্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক মরে গিয়ে স্বর্গে গেলেন । স্বর্গের প্রধান কর্মকর্তা শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে তাকে বললেন– 'আপনি তো আপনার পার্থিক জীবনে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন, এখন এই স্বর্গে এসে আপনার কি কোনো সাধ-আহ্লাদ আছে?' ঐ সাধু ভদ্রলোক উত্তর দিলেন– 'না, তেমন কিছু নেই, তবে আপনার নরকে যে লোকজন আছে তাদের জন্য আমার মন খুব কাঁদে, আমি নরকগুলো একবার ঘুরে দেখতে চাই ।' স্বর্গের কর্মকর্তা 'অবশ্যই'

'অবশ্যই' উচ্চারণ করে ভদ্রলোককে নিয়ে নরকভ্রমণে গেলেন। সাধু ভদ্রলোকটি সব নরক ঘুরে ঘুরে দেখলেন, দেখতে পেলেন পাপী মানুষদের জন্য নির্ধারিত বিচিত্র সব শাস্তির নমুনা। তিনি দেখতে পেলেন, প্রতিটি নরকের পাহারায় রয়েছে বিকট ও ভয়ঙ্কর চেহারার সব পাহারাদার, যাতে পাপীজন কোনো অবস্থাতেই নরকের দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু তিনি অবাক হলেন জঘন্যতম একটি নরক দেখে, যেখানে কোনো পাহারাদার নেই। ভদ্রলোক চোখে-মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে নরকের অধিকর্তাকে প্রশ্ন করলেন– 'আচ্ছা, এই নিকৃষ্টতম নরকটা কোন হতভাগাদের জন্য?' নরকের অধিকর্তা মুচকি হেসে বললেন– 'এটা হল বাঙালি সমাজের লোকজনের জন্য নির্ধারিত নরক, বহুত বজ্জাত এই বঙ্গাল বা বাঙালি লোকজন।' ভদ্রলোক নিজেও বঙ্গাল ছিলেন, তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল বঙ্গালদের অবস্থা দেখে, তবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন– 'আচ্ছা, এই নরকে পাহারাদার নেই কেন বলুন তো!' নরকের অধিকর্তা উত্তর দিলেন– 'প্রয়োজন হয় না, এই নরকে কোনো পাহারাদার লাগে না, কারণ কোনো বাঙালি নিজ-চেষ্টায় দেয়াল টপকে পালাতে চাইলেই অন্য বাঙালিরা ঈর্ষাবশত তার পা ধরে টেনে নিতে নামিয়ে আনে। আমরা এ ব্যাপারটা নরক সৃষ্টির প্রথম থেকেই দেখছি। আর তাই এখন আর অযথা পয়সা খরচ করে পাহারাদার রাখার প্রয়োজন বোধ করি না।'

প্রথমত 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ'– বিষয়ক গবেষণা এবং তারপর 'এক বাঙালির পা ধরে অন্য বাঙালিদের টানাটানি' আমার মনে বিভিন্ন দর্শনচিন্তা নিয়ে এল। আমি ভাবলাম, সত্যি কি বাঙালি বা বঙ্গালরা এতটাই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর? যদি তাই হয়, তবে এমন হল কেন? আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের' ইচ্ছা বাদ দিয়ে 'নিজের তত্ত্ব-কথা শুনিয়ে পাঠকের চিত্ত অস্থির করার' সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ভাবতাম, বাঙালি/বঙ্গালদের এই স্বার্থপরতা আর পরশ্রীকাতরতার প্রেক্ষাপটে নিশ্চয়ই কোনো তাত্ত্বিক কারণ আছে এবং এমন চরিত্রকে সঠিক পথে আনার জন্যও সাধারণ 'গরুর রচনা' না লিখে কোনো এক তত্ত্বকেই দাঁড় করাতে হবে।

চিত্ত বিষয়ক কতক তত্ত্ব

দার্শনিক হাইডেগার বলেছেন– মানুষের ভাষাই হল সত্তার নিবাস এবং একজন মানুষ এই ভাষার নিবাসে বসবাস করে (Language is the house of Being. Man dwells in this house)। হাইডেগার-এর দর্শন গ্রাহ্য করে বলা যায় যে জীবনের অর্থই হল কিছু শব্দকে গ্রন্থিত করে মানুষ-সত্তার মর্মার্থ, সম্ভাবনা আর গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। একজন মানুষ যেহেতু তার অস্তিত্ব ও সত্তাকে স্পষ্ট করে বোঝাতে চায়, সেহেতু সে দেশকালকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে শব্দের শৃঙ্খল, যা ভাষার চরিত্র নিয়ে মানুষের জীবন, সমাজ, পরিবেশ ও সভ্যতায় অবস্থান করে। এ বিষয়ে হাইডেগার-এর বক্তব্য হল– 'We live by putting into words the totality of significations of intelligibility. To signification, word accrue'। একটি মৌলিক সত্তা বা 'আমি'-র (বস্তু বিশ্বের বস্তুবাদী আকর্ষণে যার পতন হয়নি এবং যে Da-sein বা তত্র-সত্তা হিসেবে অবস্থান করছে) ভাষা-সৃষ্ট সত্য-বয়ানকে হাইডেগার 'সত্তা-কথা' বা 'Rede' হিসেবে চিহ্নিত করেন। একটি মৌলিক আমি বা মৌলিক-সত্তা পার্থিব বস্তু ও বিষয় নিয়ে অতিব্যস্ত থেকে অবস্থান নেয় 'পতিত-সত্তা'য় বা 'Das-man' স্তরে এবং

এমন অবস্থায় তার কথা-বার্তা হয়ে যায় Grede' বা 'বাচাল-বক্তব্য'। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সত্তা বা চৈতন্য অবস্থান করে Da-sein স্তরে এবং এ কারণে আমরা একজন কবির কবিতায়, দার্শনিকের দর্শনে, শিল্পীর শিল্পে খুঁজে পেতে পারি মানব-সত্তার সত্য ভাষণ বা বক্তব্য।

হাইডেগার আলোচনা করতে গিয়ে মানবিক চৈতন্যের প্রসঙ্গ এল, আর এই চেতনা বা চৈতন্যকে বিশ্লেষণ করতে গেলে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ফ্রয়েড-এর মতে মানুষের মন ভীষণভাবে গতিশীল (Dynamic) এবং বিভিন্ন রকম তাড়না, বিরোধ, এষণা, অবদমন ইত্যাদির মতো কিছু ইচ্ছামূলক (পড়হধঃরাব) ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের বাস্তবতায় সবসময় অবস্থান করে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ (conflict) ও বাধা (Resistance)। আমরা যদি আমাদের মনকে বিশ্লেষণ করি তবে মনের উপাদান হিসেবে অহং (Ego), অদ (Id) এবং অতি-অহং (Super Ego)-কে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের অহং বা ঊমড় আংশিক চেতন থেকে বাস্তবতার সূত্রসমূহ (Reality Principles) মেনে চলে এবং অচেতন অদ (Id)-এর সুখসূত্র (Pleasure Principle) গ্রাহ্য কামনা, বাসনা ও তাড়নাকে তৃপ্ত হতে দেয় না। অহং-এর চেতন ও সমাজ-সচেতন অংশকে ফ্রয়েড অতি-অহং বা Super Ego হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

মানুষের অবদমিত যৌন-আকাঙ্ক্ষা (Libido), কামনা ও বাসনা অদ (Id)-এর উপাদান হয়ে অচেতনে অবস্থান নেয়। অনেক সময় এই অবদমিত লিবিডো, কামনা ও বাসনার বিভিন্ন রূপক ও প্রতীক সৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে ওঠে স্বপ্নের উপাদান। অচেতন সৃষ্ট অবদমিত কামনা-বাসনার প্রতীক ও রূপকের ব্যক্ত-রূপ (Manifest content) আর অব্যক্ত-রূপ (Latent Content) সমূহকে শনাক্ত করে অবদমিত অচেতনের অনেক গোপন তথ্যই জানা সম্ভব। ফয়েড তাঁর মনস্তত্ত্বে অবদমিত অচেতনের কার্য-কলাপজনিত বিভিন্ন প্রতিরোধ পদ্ধতির (Defense Mechanism) বর্ণনা দিয়েছেন, যা প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও ভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করা (Denial), ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়া (Reaction Formation), নিজের ইচ্ছেমতো কোনো কাজ বা বিষয়ের প্রতিস্থাপন করা (Displacement), যন্ত্রণাদায়ক সময়কে দৈহিকভাবে অস্বীকার করা (Repression), মনস্তাত্ত্বিক কল্পনার বিস্তার (Psychological Projection), ইচ্ছেমতো অচেতনের স্বপক্ষে সান্ত্বনামূলক তত্ত্ব দাঁড় করানো (Intellectualization), কামনা-বাসনার বিপরীতে নতুন কোনো ইচ্ছে বা বাসনা তৈরি করা (Compensation), মনগড়া যুক্তি দাঁড় করানো (Rationalization) এবং ইচ্ছা/বাসনা বাস্তবায়নে অযৌক্তিক সাহায্য নেয়া (Sublimation) হল অবদমিত চেতনের সামাজিক বা পার্থিব প্রকাশ।

ফ্রয়েড-এর কামনা-বাসনা ও যৌনতাকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের সাথে সমকালীন ভাষা-দর্শন মিশিয়ে জাক লাকাঁ যে তত্ত্ব-ধারণা উপস্থিত করেছেন, তা আমাদের বর্তমান চেতনাকাঠামো (Paradigm)-গ্রাহ্য এবং যৌক্তিক। লাকাঁর মতে, ফ্রয়েড-কথিত সুস্পষ্ট 'অহং' বা 'আমি' অবস্থান করা প্রায় অসম্ভব, কারণ একটি মানুষ জন্মের পর তার প্রয়োজন (Need), চাহিদা (Demand) এবং বাসনা (Desire)-কে অবলম্বন করে জীবনের অকৃত্রিম (Real) ও কল্পিত

(Imaginary) পর্ব পেরিয়ে এক প্রতীকী (Symbolic) মনোজগৎ গড়ে তোলে এবং এমন অবস্থায় 'অহং' বা 'আমি'-সত্তাও হয়ে যায় বিশ্ব-বাস্তবতায় অবস্থানকারী এক বিচ্ছিন্ন বা Alienated কাল্পনিক সত্তা। লাকাঁর দর্শন অনুযায়ী মানুষের অচেতন হল ভাষা-শৃঙ্খলে তৈরি এবং এ কারণে ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, সস্যুর এবং দেরিদার ভাষা-দর্শনও লাকাঁর চিন্তা-চেতনায় এসে যায়। মানবিক অচেতন যেহেতু ভাষার উপাদান নিয়েই উপস্থিত, সেহেতু একটি মানুষ সবসময় ভাষার রূপক ও প্রতীক সৃষ্টি করে তার অবদমিত অচেতনকে প্রকাশ করতে চায় এবং এমন অবস্থায় ভাষাচিহ্নের বিপরীতে সস্যুর কথিত দ্যোতক/দ্যোতিত সূত্র কাজ না করে দ্যোতকের পর দ্যোতক (Chain of Signifier) সৃষ্টি হতে থাকে। লাকাঁ ভাষা-সৃষ্ট রূপক ও প্রতীক সৃষ্টির পেছনে অবদমিত ইচ্ছার বারবার ফিরে আসার বিষয়টিকেই উন্মোচন করেছেন এবং এমন অবস্থায় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে অবদমিত একজন মানুষ সবসময় অবস্থান করে এক ভাষাসৃষ্ট প্রতীকী-শৃঙ্খলার জগতে। বিষয়টি উপলব্ধি করে লাকাঁ বলেন– 'Man speaks therefore, but it is because the symbol has made him man'। ভাষা-সৃষ্ট বয়ান বা Text তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে হাইডেগার কথিত মৌলিক-সত্তা (উধ-ঝবরহ) এবং পতিত-সত্তা (Das-man)-র ব্যাপারটিও লাকাঁর তার দর্শনে নিয়ে এসেছেন। একজন অবদমিত মানুষ বিশ্বের সমগ্র-সত্তার অংশ হয়ে 'পতিত-সত্তা' হিসেবেই অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় তার ভাষা-প্রকাশও হয়ে যায় 'বাচাল-উচ্চারণ' বা 'Grede'। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ কিংবা কবি অনেক সময় তার মৌলিক-সত্তার (Da-Sein) স্তরে পৌঁছে গিয়ে তার অচেতনের বক্তব্যসমূহকে সত্য বয়ান বা Rede হিসেবে উপস্থাপন করেন।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং তাঁর মনস্তত্ত্বে ব্যক্তি-মানুষের অচেতনকে বিশ্লেষণ করার জন্য সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষের 'মন' শুধুমাত্র কোনো-এক একক মানুষের অবদমিত অচেতনের বিষয় নয়, সমাজে অবস্থানকালে সমাজের সব মানুষের অচেতন নিয়ে যে 'যৌথ-অচেতন' (Collective unconsciousness) গড়ে ওঠে, তা ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের চরিত্র নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ফ্রয়েড-এর অহং (Ego), অদ (Id) ও অতি-অহং (Super-go) ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বে উপস্থিত হয়েছে ব্যক্তিগত অচেতন (Personal Unconscious) হিসেবে। ইয়ুং-এর মতে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে প্রত্ন-স্মৃতিকেন্দ্রিক অবদমিত কামনা-বাসনা জৈবিক উপাদান হয়েই অবস্থান করে সামাজিক মানুষের অচেতনে এবং এই 'যৌথ-অচেতন'-ই ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র, আন্তর্ব্যক্তি ও আন্তঃসামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারণ করে। মানুষের যৌথ-অচেতনের উপাদান নিয়ে সমাজে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রত্ন-শ্রেণী বা Archetype-এর মানুষ। কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং মানুষের প্রত্ন-শ্রেণীকে 'যৌথ-অচেতন'-এর ক্রিয়া-কর্মের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপ-শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল:

ক. মাতৃকেন্দ্রিক প্রত্নশ্রেণী (Mother Archetype)
খ. অতীন্দ্রিয় প্রত্নশ্রেণী (Mana Archetype)
গ. ছায়া প্রত্নশ্রেণী (The Shadow Archetype)
ঘ. সামাজিক প্রত্নশ্রেণী (The Persona Archetype)

ঙ. এনিমা ও এনিমাস প্রত্নশ্রেণী (Anima and Animas Archetype)
চ. বাবা- কেন্দ্রিক প্রত্নশ্রেণী (Father Archetype)
ছ. অহং-কেন্দ্রিক প্রত্নশ্রেণী (Ego Archetype) ইত্যাদি।

ইয়ুং-এর মতে, মানুষের 'যৌথ-অচেতন' কিছু নীতিকে গ্রাহ্য করে বিভিন্ন প্রশ্নশ্রেণীতে ক্রিয়াশীল থাকে এবং এই নীতিগুলো হল বৈপরীত্যের নীতি (Principle of Opposites), সমমাত্রার নীতি (Principle of Equivalence) এবং পতনের নীতি (Principle of entropy)। ব্যক্তিগত অচেতন এবং যৌথ অচেতনের ক্রিয়া-বিক্রিয়া একজন মানুষকে আত্মমুখী (Introvert) কিংবা বহির্মুখী (Extrovert) হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তি ও সমাজের চরিত্র যেহেতু ব্যক্তিগত অচেতন ও যৌথ-অচেতনের সম্মিলিত প্রকাশ, সেহেতু ফ্রয়েড ও লাকাঁর মনস্তত্ত্বের সাথে ইয়ুং-এর তত্ত্ব যোগ করেই 'সমাজ-মনস্তত্ত্বে'র সম্পূর্ণ বিচার ও বিশ্লেষণ আমরা করতে পারি।

কেন এত তত্ত্ব-কথা?

'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' এবং 'এক বাঙালি কর্তৃক অন্য বাঙালির পা টেনে ধরা' নিয়ে আলোচনা শুরু করে, পাঠকের চিত্ত অস্থির করার জন্য কিছু তত্ত্ব-কথার অবতারণা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত কিছু বচন-প্রবচনকে কেন্দ্র করে এত তত্ত্ব-কথা বলা কী প্রয়োজন? আমরা জানি যে, বাংলাদেশের লোকজনের (মন্ত্রী, সচিব থেকে আরম্ভ করে ব্যবসায়ী, পুলিশ, দোকানদার, কৃষক, মওলানা, ঠাকুর, বেকার এবং অন্যান্য সব পেশার লোকজন) বেশির ভাগই কোনো-না কোনোভাবে স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। বাঙালি বা বঙ্গালরা কেন স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত, তা আবিষ্কার করতে হলে কিছু তত্ত্বের সমর্থন প্রয়োজন, কারণ কোনো তত্ত্বহীন ঘটনা পার্থিব বাস্তবতায় অবস্থান করতে পারে না।

আমরা হাইডেগার-এর দর্শন থেকে জেনেছি ভাষাই হল সত্তার নিবাস এবং এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষের মৌলিক-সত্তার সত্য-বাণী বা Rede এবং পতিত-সত্তার বাচাল-কথা বা Grede সমাজ-বাস্তবতায় প্রকাশিত হয়। ফ্রয়েড থেকে আমরা বুঝেছি মানুষের অবদমিত কামনা-বাসনা অচেতনে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন রূপক ও প্রতীক সৃষ্টি করে বারবার ফিরে আসে বাস্তবতায় এবং এই অবদমিত অচেতন-সৃষ্ট Defense Mechanism ব্যক্তি ও সমগ্রের মাঝে তৈরি করে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ। লাকাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের অচেতন হল ভাষার জগৎ এবং এই জগৎ সবসময় দ্যোতকের পর দ্যোতক (Signifier after signifier) সৃষ্টি করে জন্ম দেয় বিভিন্ন রূপক বা প্রতীকী বাস্তবতার। ইয়ুং-এর ভাবনায় আমরা পাই 'যৌথ-অচেতনের' প্রত্নতত্ত্ব, যা সমাজ-বাস্তবতায় সবসময় ক্রিয়াশীল। সব বিবেচনার পর আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের অচেতনের সব বিরোধ (Conflict), কামনা, বাসনা, তাড়না ইত্যাদি লুকিয়ে আছে আমাদের ঐতিহাসিক সাহিত্যে, কবিতায়, গানে, ধর্ম-কথায়, বচন ও প্রবচনে। আমরা যদি কোনো তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে আমাদের 'যৌথ-অচেতনের' অবদমিত বিরোধগুলো চিহ্নিত করতে

পারি, তবেই আমরা সক্ষম হব নতুন কোনো তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে, আমাদের সমাজকে ভেঙে, নতুন করে বিনির্মাণ করে, সুন্দর একটি সমাজ উপহার দিতে।

এ মুহূর্তে আমার হাতে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রচিত 'বচন প্রবচন' শিরোনামের বইটি আছে (প্রকাশক: সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫)। আমি বইটির সবগুলো বচন/প্রবচন পাঠ করেছি এবং আমার মনে হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি বচন/প্রবচনের আছে ব্যক্ত-রূপ (Manifest Content) এর অব্যক্ত রূপ (Latent Content), যা বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনের প্রত্নতাত্ত্বিক রূপ ও স্বরূপ উন্মোচন করে বর্তমানের 'যৌথ-অচেতন'-কেও প্রকাশ করতে পারে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রচিত 'বচন ও প্রবচন' গ্রন্থে গ্রন্থিত বচন ও প্রবচনগুলো পড়লে জাত-পাতকেন্দ্রিক হীনমন্যতা, অন্ধ বিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ, বড়লোক বা ধনী লোকদের প্রশংসা ইত্যাদির মতো নাস্তিবাচক (Negative) উপাদান উদ্ধার করা যায়, যা এখনো আমাদের 'যৌথ-অচেতনের' অংশ। 'বচন ও প্রবচন' গ্রন্থের সবই নাস্তিবাচক তা আমি বলব না; আমি একথাও বলব না যে বাংলা ভাষায় এমন বচন-প্রবচন থাকা উচিত নয়, কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে বচন-প্রবচনগুলো তাত্ত্বিকভাবেই বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনকে উন্মোচন করছে। গ্রন্থটির সব বচন-প্রবচনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব, তবে উদাহরণ হিসেবে নিম্নে উদ্ধৃত কিছু বচন-প্রবচনের বিশ্লেষণ দেয়া হল:

১. হুজ্জতে বাঙ্গাল
২. গোবরের পদ্মফুল
৩. ভাত নাই যার জাত নাই তার
৪. বড়লোকের আস্তাকুড়ও ভালো
৫. শুয়োরের পাল
৬. সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না
৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট
৮. টাকার গরম
৯. ইতর বিশেষ
১০. বামুন-শূদ্র তফাত
১১. দেবতা বুঝে নৈবেদ্য
১২. বিশ্বাসে বিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর
১৩. হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না।

'হুজ্জতে বাঙ্গাল' শব্দগুচ্ছের মাঝে আমরা বাঙালি চরিত্রের অস্থিরতা ও ইচ্ছেমতো অযৌক্তিক ক্রিয়া-কর্মে অংশগ্রহণের বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি। হুজ্জত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল তর্কাতর্কি, কলহ বা গোলমাল। এই বচনটি যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে বাংলাভাষায় আছে, সেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে চেতন-অচেতনে সবসময় বাঙ্গাল বা বাঙালিরা ঝগড়াটে ছিল। 'হুজ্জতে বাঙ্গাল'-এর চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করার জন্য 'হুজুগে বাঙ্গাল' বচনটিও পাশাপাশি অবস্থান করে। ঝগড়া বাঙ্গালিদের যে প্রিয়, তা আমরা বুঝতে পারি শাশুড়ি-বউ, ননদ-ভাবী

কিংবা হাসিনা-খালেদা সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে এবং হাটে, বাজারে, নদী ও পুকুরঘাটে, রাজনীতিতে, সবখানেই আমরা বাঙ্গালদের ঝগড়া আবিষ্কার করতে পারব। বাঙালিরা যে হুজুগে, এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। কোনো যুক্তি ছাড়াই শুধুমাত্র 'যৌথ-অচেতনের' পরামর্শে একজন বাঙালি প্রাণ দিতেও পারে। যে এরশাদ সরকারের পতনের জন্য বাংলাদেশের লোকজন প্রাণ দিল, টিএসসি-র মোড় থেকে পুরানা পল্টন পর্যন্ত নাচানাচি করল, জনতার মঞ্চ থেকে বিষ-বাক্য ছড়িয়ে দিল, সেই একই এরশাদকে কোলে তুলে চুমু খেতে বাঙালিদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করলে বাঙালি 'যৌথ অচেতনে' অবস্থানকারী 'হুজ্জত' ও 'হুজুগ'-কে শনাক্ত করা যাবে।

'গোবরের পদ্মফুল' বচনটিতে আমরা খুঁজে পাব বঙ্গাল বা বাঙালিদের সহজাত ঈর্ষা, যা ফ্রয়েডের প্রতিরোধ পদ্ধতির উপাদান Denial ও Rationalization-কে গ্রাহ্য করে। আমাদের ইতিহাসের কোনো-এক সময়ে কোনো-এক ভট্টাচার্য বা তর্করত্ন হয়তো কোনো-এক শূদ্রের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন– 'পতিত হারু মণ্ডলের ছেলের টাকা হয়েছে তাতে কী? গোবরে পদ্মফুল ফুটলে কিবা আসে যায়'। এবং তার ঐ ঈর্ষার ব্যক্তরূপ (Manifest content) এখনো আমাদের 'যৌথ অচেতনের' উপাদান হয়ে প্রতীক ও রূপক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করছে চরম পরশ্রীকাতরতার উপাদান (Latent content) হিসেবে। 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' প্রবচনটিও তাই 'গোবরের পদ্মফুল'-এর বিনির্মিত প্রতিরূপ।

'ভাত নাই যার জাত নাই তার', 'বড়লোকের আস্তাকুড়ও ভালো' এবং 'শুয়োরের পাল' বচন-প্রবচন-গুচ্ছ সৃষ্টি হয়েছিল শোষক ও শোষিতের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। একজন শোষক ব্রাহ্মণ, জমিদার, আশরাফ শ্রেণীর ব্যক্তি কিংবা অর্থনৈতিক কারণে সচ্ছল মানুষের কাছে পতিত-জন, গরিব মানুষ সবসময় 'শুয়োরের পাল' হিসেবেই অবস্থান করত। আমাদের 'যৌথ অচেতনে' ব্যাপারটি এখনো আছে। যাকাতের শাড়ি নেয়ার জন্য কিংবা কুরবানীর গোস্ত নেয়ার সময় যখন সমাজের শোষিত জনগোষ্ঠীর প্রচণ্ড ভিড় হয়, তখন তাদের 'শুয়োরের পাল' হিসেবেই মাঝে-মধ্যে চিহ্নিত করা হয় (ব্যাপারটি গল্প নয়, লেখক নিজেই এমন মন্তব্য শুনেছে)। কিন্তু, শোষিত জনগণের কাছে 'বড়লোক' এখনো 'স্বপ্নের মানুষ', 'আল্লাহ যারে দেয় ছাপ্পর ফেড়ে দেয়'– তত্ত্বের ওপর বিশ্বাস রেখে পতিত জনগোষ্ঠী এখনো বড়লোক-বন্দনা করে। তারা ফ্রয়েডের Compensation Mechanism-গ্রাহ্য করে বলে– 'ভাত নাই যার জাত নাই তার', 'বড়লোকের আস্তাকুড়ও ভালো' এবং আমাদের মৌলিক সত্তা (Da-Sein) কবিও 'যৌথ অচেতন' গ্রাহ্য করে লিখে ফেলেন– 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। কোনো শোষিত শ্রেণীর মানুষ দুর্নীতি করে হঠাৎ 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে গেলে তথাকথিত বড়লোকদের ঈর্ষা হয়, তারা বলেন– 'দুই দিনের বৈরাগী নয়, ভাতেরে কয় অন্ন'।

'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না' এবং 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' প্রবচন দুটি বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবকেই স্পষ্ট করে তোলে এবং এর প্রেক্ষাপটে কাজ করে ফ্রয়েডের Reaction formation, Intellectualization, Rationalization এবং Sublimation-এর ধারণা। মানুষের অভাব থাকলে চুরি করবে, বাটপারি করবে, ঘুষ খাবে, দুর্নীতি করবে এবং সব ধরনের অন্যায় করবে এমন একটা সুপ্ত-তত্ত্বই অবস্থান করছে 'অভাবে

স্বভাব নষ্ট' প্রবচনে। এই অভাব কোন কারণে হয়, কার কারণে হয়, তার কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই সরাসরি 'অভাবের' সাথে 'স্বভাবের' সম্পর্ক স্থাপন করা যায় এবং 'অভাব' গরিব, বড়লোক, সরকারি কর্মকর্তা, মাস্তান, রাজনীতিবিদ সবারই থাকতে পারে। একজন রাজনীতিবিদ তার দুর্নীতিকে Rationalize করতে পারেন এই ভেবে যে, তার অনেক কর্মী পালতে হয়, মাস্তান পালতে হয় এবং তাই তার 'অভাব' আছে, আর এই 'অভাবের' কারণে 'স্বভাব' নষ্ট করে চাঁদাবাজি করা, দুর্নীতি করা অযৌক্তিক নয়। মানুষের 'স্বভাব' নষ্ট হলেই চলে আসে, 'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠা না ওঠার' প্রসঙ্গ চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেক সময় সহজ পদ্ধতিতে করা সম্ভব হয় না, আর তখনই প্রয়োজন হয় 'সোজা আঙ্গুল বাঁকা করে ঘি ওঠানোর'। আঙ্গুল বাঁকা করে ঘি ওঠানোর পদ্ধতি হিসেবে আমাদের সমাজে এসেছে 'ফাইল আটকানো', 'পিস্তল ও বন্দুকের ব্যবহার' ইত্যাদি। এই প্রবচনটির সফল প্রয়োগ হলেই আমরা বলি– 'জোর যার মুল্লুক তার'। বাংলাদেশ একটি 'মুল্লুক' এবং এই মুল্লুকের সিংহাসন দখল করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে 'আঙ্গুল বাঁকা করে ঘি তোলার' ব্যবস্থা করেন মহামান্য রাজনীতিবিদগণ এবং তাদের সমর্থকরা। 'আঙ্গুল বাঁকা' করার পদ্ধতিতে চলে আসে ইচ্ছেমতো ভোটার লিস্ট প্রণয়ন, নিজস্ব লোকজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করা, জনগণকে কষ্ট দিয়ে হরতাল-ঘেরাও কর্মসূচি নেয়া ইত্যাদির মতো জনগণবিরোধী কার্যক্রম (আমাদের নেতা ও নেত্রীরা 'আঙ্গুল বাঁকা' করার পদ্ধতি হিসেবে কেন যে আমরণ অনশনে যান না, তার যৌক্তিক কারণ আমি খুঁজে পাই না!) 'টাকার গরম', 'ইতর বিশেষ', 'বামুন-শূদ্র তফাত' ও 'দেবতা বুঝে নৈবেদ্য' বচন, প্রবচনগুচ্ছ আমাদের 'যৌথ-অচেতনে' অবস্থান করছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে। টাকা থাকলেই তার গরম থাকবে এবং এই গরম প্রকাশিত হবে দৈনিক সংবাদপত্র, চালু হবে টিভি চ্যানেল, বেঁচে থাকবে মাস্তান ভাইরা এবং স্বার্থ রক্ষা হবে টাকার গরম-ওয়ালাদের। যার টাকা আছে, বিত্ত আছে, সে সমাজে বসবাস করেও উচ্চ-স্তরের মানুষ (আমাদের যৌথ-অচেতনে তাই লেখা আছে)

এবং এই কারণেই অন্য সবাই 'ইতর বিশেষ'। সমাজের নিচু স্তরে (অর্থনৈতিকভাবে নিচু) যারা আছে তারা 'বামুন-শূদ্র তফাত'-গ্রাহ্য করে মেনে নেয় সমাজ মনস্তত্ত্বের উপাদানগুলোকে যদিও বাংলাদেশে জাত-পাতকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িকতা তেমন নেই, তবু অবস্থান করছে হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-বৈপরীত্য-কেন্দ্রিক শোষণ এবং বড়লোক/ছোটলোক কেন্দ্রিক অধিতাত্ত্বিক শোষণযন্ত্র। আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় যারা বড়লোক বা টাকার কুমির হিসেবে পরিচিত, তাদের চাহিদা পূরণ হয় চাঁদাবাজি করে, ঘুষ খেয়ে, ব্যাংক থেকে টাকা মেরে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কিংবা অন্য কোনো দুর্নীতি করে। যে যত বড়লোক, তার দুর্নীতির মাত্রাও তত বড় এবং এ কারণে তাদের চাহিদা পূরণ করতে 'দেবতা বুঝে নৈবেদ্য'-তত্ত্ব মানতে হয়। পুলিশের একজন নিম্নপদের কর্মকর্তা কিংবা সচিবালয়ের নিম্নপদে কর্মরত একজনকে যে টাকা ঘুষ দিয়ে একটি কাজ আদায় করা যায়, ঠিক একই পরিমাণ টাকা দিয়ে পুলিশের কিংবা সচিবালয়ের বড় বড় 'দেবতাদের' মন তুষ্ট করা যাবে না। বড় দেবতা, বড় কর্মকর্তা কিংবা বড় রাজনীতিবিদদের খুশি করতে হলে জনসাধারণকেও হতে হয় বড় ধান্ধাবাজ এবং তাদের বুঝতে হয় 'যৌথ অচেতনে' অবস্থানরত 'দেবতা বুঝে নৈবেদ্য' প্রবচনটির আসল এবং বাস্তব মর্মার্থ। কখন কাকে কী দিতে হবে তা আমরা বুঝি, কখনোই আমরা 'বানরের গলায় মুক্তোর মালা' ঝুলিয়ে দেই না।

বাংলাদেশের বঙ্গাল বা বাঙালিরা সবসময় পুরুত, ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, মৌলানা, মৌলভি, পীর এবং বিভিন্ন ধর্ম-ব্যবসায়ী দ্বারা প্রতারিত/শোষিত হয়েছে। শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে ইচ্ছেমতো এবং ঘোষণা দেয়া হয়েছে– 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। মানুষকে বোঝানো হয়েছে, যত পাপই তারা করুক-না কেন, মসজিদ-মন্দির নির্মাণ করে, দান-খয়রাত করে গঙ্গা-স্নানে কিংবা হজ্বব্রত পালনে সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যায় (এ কারণেই হয়তো-বা আমাদের দেশের বড় বড় দুর্নীতিবাজ ও রাজনীতিবিদরা ঘন ঘন হজ্বে যান)। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'– তত্ত্ব আরোপ করে এখনো চলছে সামাজিক শোষণ। এই শোষণের বিরুদ্ধে যেন জনগণ সোচ্চার না হয়, সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে ভাষার মারপ্যাঁচে, বলা হচ্ছে– 'হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না', তাই তুমি গরিব, আমি বড়লোক; মনে কোনো দুঃখ রেখো না, দুনিয়াতে যা পাও নাই তা আখেরাতে পাবে। বাংলা ভাষার বচন ও প্রবচন যে বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনকে প্রকাশ করছে তা তাত্ত্বিকভাবেই প্রমাণ করা যায়, কিন্তু কোন অবস্থায় আমাদের 'যৌথ অচেতন'-এর অবস্থা এমন হল, যে সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন।

আমরা কেন এমন হলাম?

আমরা কেন যে এমন হলাম, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেতে হলে আমাদের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে আমাদের ঐতিহাসিক সত্তাকে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

বঙ্গদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) একসময় বসবাস করত আদি-অস্ত্রাল বঙ্গাল কৌম-সমাজের জনগণ। বঙ্গদেশে প্রথম এসেছিল দ্রাবিড়রা, কিন্তু এই দ্রাবিড়দের আগমন ও বসতি স্থাপন বঙ্গাল সমাজকে বিভক্ত করে কোনোরকম হীনমন্যতাবোধের জন্ম দেয়নি। প্রাক-দ্রাবিড় বঙ্গাল ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী একাকার হয়ে বঙ্গাল নামেই বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্তি, সুহ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের বঙ্গদেশের আদি রাজ্যগুলোতে বসবাস করতে থাকে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ইউরোপীয় আলপীয় ইউরোপয়েড মহাজাতির জনগোষ্ঠী বঙ্গদেশে জনপদ গড়ে তোলে এবং একসময় প্রাক-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে এক মিশ্র বঙ্গাল-জাতিসত্তার সৃষ্টি করে। এই মিশ্র বঙ্গাল জাতিসত্তা কৌমভিত্তিক লৌকিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের ভাষা-কাঠামোর বিবর্তন হয়েছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয় অর্থভাষার সংমিশ্রণের ফলে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করে এবং স্থানীয় কৌমভিত্তিক বঙ্গ-সমাজের সাথে সহাবস্থান করছিল। কৌমভিত্তিক লোকধর্মের উপাদান বৌদ্ধধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল এবং এ কারণে বঙ্গাল কৌমের দেবী বজ্রযানী ও দেবী জাঙ্গলী বৌদ্ধ দেবী হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। গুপ্ত যুগে বৈদিক, বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্ম বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করেনি। পাল-চন্দ্র-উত্তর যুগ (বর্মণ, সেন ও দেব পর্ব) বঙ্গদেশের জন্য এক 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে পরিচিত হতে পারে, কারণ এ সময় শোষণের অস্ত্র হিসেবে বঙ্গসমাজে জাত-পাত-

কেন্দ্রিক সমাজ-ভাঙ্গনের উপাদানগুলো সুচিন্তিতভাবেই প্রবেশ করানো হয় এবং এর ফলে বঙ্গাল সমাজের 'ব্যক্তিগত ও যৌথ অচেতনে' অবস্থান নেয় হীনমন্যতাজনিত বিভিন্ন অনুষঙ্গ।

বর্মণ, সেন ও দেব পর্বের নরপতিগণের সহযোগিতায় বঙ্গদেশে উচ্চবর্ণের (যাদের দেহের রঙ ছিল ফর্সা) ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন জনপদে 'গাঁই' বা 'গাঞি' স্থাপন করে বসবাস শুরু করে এবং জাত-পাতকেন্দ্রিক তত্ত্ব দিয়ে আবিষ্কার করতে থাকে জনগণের সঙ্করত্ব-দোষ। ব্রাহ্মণগণ তাদের রচিত বিভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র (যেমন বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদি) অনুসরণ করে জাতিকে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজ হিসেবে বিভক্ত করে ফেলে এবং এর ফলে জনগণের মন স্থান নেয় এক ধরনের 'অবদমন', যা 'যৌথ-অচেতনের' উপাদান হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রেণীস্বার্থের বিষবাষ্প। শ্রেণীস্বার্থের ব্রাহ্মণ্যবাদী উপাদান কীভাবে বঙ্গাল জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করেছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোন কারণে বঙ্গাল বা বাঙালির মনে হীনমন্যতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, দুর্নীতি ইত্যাদির মতো অসামাজিক/অমানবিক উপাদান স্থান করে নিল, তার উত্তর পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণীর ভাষাকেন্দ্রিক উচ্চারণ পাঠ করলে। পাঠকের অবগতির জন্য ব্রাহ্মণদের কিছু বাণী নিচে তুলে দেয়া হল:

* আমাদের তুষ্ট কর, সুখ দাও, মুক্তি পাবে।
* ব্রাহ্মণের সেবাই হল ইহলোক ও পরলোক সবকিছু লাভ করার একমাত্র পথ।
* চিত্রা নক্ষত্রে আমাকে একটি বৃষ আর সুগন্ধিদ্রব্য দাও, নন্দনকাননে অপ্সরাবিহার করতে পারবে।
* ব্রাহ্মণদিগের শাপ-প্রভাবেই সাগরের জল নিতান্ত অপেয় হইয়াছে, উহাদের কোপানল দণ্ডকারণ্যে এখনো প্রশমিত হয় নাই। উহারা দেবগণের দেবতা, কারণের কারণ, প্রমাণের প্রমাণ। উহাদের মধ্যে কি বৃদ্ধ কি বালক সকলেই পূজার যোগ্য। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন– তাহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা বিধেয়। ... ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্যে নিযুক্ত থাকে, তথাপি তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ জানিয়া সমাদর করিবে।
* দুষ্ট-মতাবলম্বী বৌদ্ধ জৈনদের তর্কে পরাজিত করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করতঃ ঢেঁকিতে কুটিয়া দুষ্টমত দমন করিবে।

উপরিউক্ত বাণীগুলো পড়লেই তৎকালীন সমাজের 'অবদমন'-এর কারণগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক ভাঙ্গন শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী/নিচুশ্রেণী যুগ্ম-বৈপরীত্যকেন্দ্রিক ছিল না। মূল ব্রাহ্মণ্যধর্মই শৈব, শক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়ে সমাজকে বিভিন্ন মাত্রার চিন্তাধারা উপহার দিয়েছিল এবং আমরা পেয়েছি 'নানা মুনির নানা মত', 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' ইত্যাদির মতো বচন-প্রবচন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায় এবং এক সময় দেখা যায় যে বঙ্গদেশের প্রায় অর্ধেক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। শোষিত হিন্দু জনগোষ্ঠি ও বৌদ্ধরাই মুসলিম সুফিদের জাত-পাত-হীন ধর্ম-বিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। কিছু হিন্দু মুসলিম শাসকদের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য ধর্ম ত্যাগ করেছিল, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকরা জোর করেও ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করেছিল হিন্দুদের। তবে একথা স্বীকার করাই

যুক্তিসঙ্গত হবে যে ধর্ম-ত্যাগ করাই ছিল অবদমিত, অবহেলিত আর শোষিত-শ্রেণীর জন্য এক ধরনের বিদ্রোহ। বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম আসার পরে 'হিন্দু/মুসলমান' যুগ্ম-বৈপরীত্য নিয়ে আবারও সৃষ্টি হয় সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং এর ফলে বঙ্গাল বা বাঙ্গালিদের চেতনা-চৈতন্যে কখনোই ভাষাভিত্তিক/সাংস্কৃতিক চেতনা-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধ জাগেনি। বাঙালির সমাজ সবসময় এগিয়েছে জাত-পাত আর ধর্মভিত্তিক বিভাজন নিয়ে এবং এর ফলে সমাজে সবসময় অবস্থান করেছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উঁচুজাত-নিচুজাত, আশরাফ-আফতাব, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বড়লোক-ছোটলোক, জমিদার-প্রজা ইত্যাদির মতো যুগ্ম-বৈপরীত্য, 'অবদমনের' উৎস হয়ে।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যও এগিয়েছে 'আশরাফ-আফতাব'-শ্রেণীকে কেন্দ্র করে এবং এক সময় এই বিভাজনে যোগ হয়েছে পীর ও মুর্শিদ-কেন্দ্রিক বিভিন্ন তরিকা। কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, নক্শাবন্দিয়া ও চিশতিয়া তরিকার সাধকবৃন্দ বিভিন্ন মাত্রার ধর্ম-দর্শন নিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজকে বিভক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে মাদ্রাসা-কেন্দ্রিক বিভাজনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল। দেওবন্দী, কওমী ও বিভিন্ন পীরের মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন মতবাদ। ধর্মকে কেন্দ্র করে শরিয়ত, মারেফত এবং বিভিন্ন তরিকা ও মাদ্রাসা-কেন্দ্রিক ভিন্নমত থাকার কারণে বাংলাদেশের মুসলমান জনগণের চিন্তা-চেতনায় কখনো একক সামাজিক/সাংস্কৃতিক বিশ্বাস অবস্থান করেনি। হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাত-পাত-কেন্দ্রিক সমাজের মতো মুসলমান সমাজও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আশরাফ-আফতাব শ্রেণীতে। সমাজে অবস্থান করছিল বিভিন্ন তরিকার পীর-মুর্শিদ-কেন্দ্রিক ধর্ম-দর্শন। লেখাপড়া করে জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়াতেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভিন্ন ধর্মীয় নেতারা। নাসারাদের (পাশ্চাত্যের) কিংবা মালাউনদের (হিন্দুদের) জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'গুনাহ'-র কাজ বলেই গণ্য হত, ফলে বঙ্গাল বা বাঙালি মুসলমানরা কখনোই আধুনিক চিন্তা-চেতনার ধারে-কাছে আসতে পারেনি। আরবি আর ফারসি শিখেই তারা তাদের 'আখেরাত' গোছাতে ব্যস্ত ছিল, মূল ইসলাম ধর্ম-দর্শনে যে জ্ঞান-লাভের ওপর অসীম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা বঙ্গাল মুসলমানদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। যেহেতু সময়ের সাথে বঙ্গদেশের মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা এগিয়ে যায়নি, সেহেতু তাদের 'যৌথ অচেতনে' সবসময় অবস্থান করেছে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-চিন্তা, তারা হয়ে গেছে পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর।

বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর চেতনা-চৈতন্যের দীনতার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল ধর্ম-দর্শন। জাত-পাত-কেন্দ্রিক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ পুরুত-ঠাকুররা বলত– পূর্ব-জন্মের কর্মফলের ফলেই শূদ্র হয়ে জন্মেছ, ব্রাহ্মণ-সেবা কর, আগামী জন্মে ব্রাহ্মণ হবে। পাপ ও পুণ্যের ব্যাপারেও ব্রহ্মণশ্রেণীর স্বার্থপর চিন্তা ছিল, পুণ্যের সম্পর্ক ছিল ব্রাহ্মণ-সেবার সাথে আর পাপ ছিল ব্রাহ্মণকে অবহেলা করা। পাপ করলে, তা মুছে ফেলা যেত গয়া, কাশী কিংবা হরিদ্বারে গিয়ে, পুরুত-ঠাকুর-পাণ্ডাদের ভেট দিয়ে গঙ্গাস্নান করলেই। পাপ মুছে ফেলার সহজ ও সরল পদ্ধতি থাকার ফলে, বঙ্গাল বা বাঙালি হিন্দুরা বিস্তর পাপকাজ করার পর গঙ্গাস্নান করে, ঠাকুর-পুরুতদের সেবা করে, পবিত্র হয়ে যেত। পাপ ও পুণ্যের ব্যাপারে প্রচলিত হিন্দু-দর্শন বঙ্গদেশের সব শ্রেণির হিন্দুদের দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলেছিল। 'ছোয়াব' ও 'গুনাহ্'-এর ব্যাখ্যাও বাংলাদেশের মুসলমানদের দুর্নীতিগ্রস্ত হতে সাহায্য করেছিল। 'হাতের পাঁচ আঙ্গুল' সমান নয়, এই কথা বলে মাওলানা-হুজুররা সমাজে অবস্থানরত শোষক ও শোষিতের উপস্থিতিকেও সব রকম প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। গুনাহ্ করে ছোয়াব হাসিলের উপায়ও তারা বিভিন্ন ওয়াজ-

মাহফিলে কিংবা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনায় বলে দিতেন। সব গুনাহ্ মাফ হওয়ার উপায় ছিল– মসজিদ তৈরি করা, মাদ্রাসা বানানো, গরিবদের যাকাত-ফিতরা দেয়া এবং হজ্ব করা। হজ্ব করলে একজন মানুষের সব গুনাহ্ মুছে গিয়ে লোকটি শিশুর মতো পবিত্র হয়ে যায়, এমন একটা ধারণা দিতেন মোল্লা-মৌলভিরা (বান্দার প্রতি কোনো অন্যায় করলে, সেই বান্দাকেই ক্ষমা করতে হবে অন্যায়কারীকে; আল্লাহ রাহমানুর রাহিম হলেও তিনি চান অন্যায়কারীকে ক্ষমা করুক ক্ষতিগ্রস্ত বান্দাই, এই সত্যগুলো কখনোই মোল্লা-মৌলভিরা ব্যাখ্যা করে বলেন না। ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত হল আল্লাহ-এর নির্দেশিত কাজ, এই কাজ না করলে গুনাহ্ হবে। কেউ যদি এই কাজ না করে আল্লাহ-এর কাছে ক্ষমা চায়, তবে রাহমানুর রাহিম হিসেবে তিনি বান্দাকে ক্ষমাও করতে পারেন, কিন্তু একটা ডাকাতি করে, ঘুষ খেয়ে, খুন করে হজ্ব করলে আল্লাহ সব মাফ করে দেবেন এমন মনে করার যুক্তি নেই, কারণ এই কাজগুলো করে যাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, সেই বান্দা যদি ক্ষমা করে শুধুমাত্র তখনই আল্লাহও তা ক্ষমা করবেন)। 'ছোয়াব' ও 'গুনাহ' সম্পর্কীয় ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে এখনো বাংলাদেশের জঘন্যতম ঘুষখোররা, দুর্নীতিবাজরা, খুনিরা বছরে একবার হজ্ব করে ভাবেন যে তারা শিশুর মতো পবিত্র হয়ে গেলেন। বাড়তি ছোয়াব পাওনা হিসেবে তারা ঘুষ কিংবা দুর্নীতির টাকা দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরি করেন, যাকাতের শাড়ি বিলি করেন এবং লোকজনকে বলেন 'শুয়োরের পাল'।

বঙ্গাল বা বাঙালির 'অচেতন' ও 'যৌথ-অচেতনে' যে দুর্নীতির বাসনা, পরশ্রীকাতরতা এবং স্বার্থপরতা আছে, তা হল এক ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা। এই সমস্যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে অবস্থানরত অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবোধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের চিন্তা-চেতনা যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক মুক্তির অনুষঙ্গ হিসেবে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর 'আদমজী', 'বাওয়ানী', 'দাউদ' ইত্যাদি নামের শোষক দূর হলেও বাংলাদেশে কায়েম হয়েছে অসংখ্য দুর্নীতিবাজ 'গ্রুপ অব কোম্পানিজ', যাদের স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আখ্যায়িত করেছিরেন 'চাটার দল' হিসেবে। এখন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলে কেউ আর 'অর্থনৈতিক মুক্তির' কথা বলেন না (কারণ এ কথা বললেই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিগুলোও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে) এবং আমরা সবাই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' এক ধরনের বায়বীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করি। আর তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' থাকলেও, গণশোষণতন্ত্রের নিয়ম-নীতি
মেনে ফতোয়ার স্বপক্ষে যেতে আমরা দ্বিধা করি না।

এখন আমরা করবটা কী?

বাংলাদেশের অবদমিত বঙ্গাল বা বাঙালির 'যৌথ-অচেতনে' যে পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার মতো উপাদান রয়েছে, তা আমরা আমাদের সাহিত্যের বিশ্লেষণে, ইতিহাস চর্চায় এবং মনো-সমীক্ষণে বুঝতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে অবদমিত অসুস্থ চিন্তা-চেতনার ফলেই আমাদের দেশের গণতন্ত্র হয়ে গেছে গণশোষণতন্ত্র, আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হয়ে গেছে দুর্নীতি, আর আমাদের জনগণের মাঝে অবস্থান করছে চরম হতাশা।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখন আর দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই, কারণ রাজনীতি এখন খুবই ভালো ব্যবসা, আর এই ব্যবসার অংশীদার হয়ে সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে আমলা, পুলিশ, মাস্তান এবং অবদমিত দুর্নীতিগ্রস্ত জনগণ। আমরা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারি আমাদের অস্থির সমাজবিরোধী চেতনা-চৈতন্যকে এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করি বিস্তর। যে কোনো অনুষ্ঠানে, চায়ের দোকানে কিংবা আড্ডায় বসলেই আমরা সমালোচনায় মুখর হই, আমাদের সবাই যে একজন বিখ্যাত তর্করত্ন বা নৈয়ায়িক তা বোঝাতে কসুর করি না। কিন্তু আমরা একটা সত্য কিছুতেই বুঝতে চাই না, আমরা বুঝি না যে তত্ত্বহীন তর্ক আসলে 'চা-এর কাপে ঝড় তোলার' জন্যই সর্বকালে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমাদের দেশে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হয়ে যারা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত, তারাও আসলে চরিত্রের দিক দিয়ে পুরুত-ঠাকুর কিংবা মাওলানা/মোল্লার মতোই। তারা 'গরুর রচনা' লেখার মান নিয়ে রচনা করেন 'কলাম সাহিত্য', ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্যের মতো তৈরি করেন 'বিবৃতি'। অনেক সময় ইচ্ছে হলে তারা 'গোল-টেবিলের' চারপাশে বসে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, কিন্তু কেন যে তাদের মহামূল্যবান 'বাণী' সমাজ-বিবর্তনে কোনো কাজ করে না, তার কারণ খোঁজেন না। আমাদের রাজনীতিবিদরা অনেক গরম গরম ভালো কথা বলেন, কিন্তু তাদের সব গরম কথার প্রেক্ষাপটে যে শ্রেণীস্বার্থ লুকিয়ে আছে, তা বাংলাদেশের মানুষ নাবালক থেকে সাবালকই হলেই বোঝে।

আলোচনা-সমালোচনা করে, বিবৃতি দিয়ে, কলাম লিখে কিংবা গোল-টেবিল সভা করে বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজের কোনো বিবর্তন হচ্ছে না শুধুমাত্র একটা কারণেই এবং সে কারণটি হল, আমরা আমাদের অবদমিত 'যৌথ-অচেতন'-কে বিশ্লেষণ করে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে সমাজ-বিবর্তনের কার্যক্রম হাতে নিচ্ছি না। আমরা যদি ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ব, ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের 'যৌথ মনস্তত্ত্ব' বিষয়ক প্রত্নলেখ তাত্ত্বিকভাবে আবিষ্কার করতে পারি এবং ঐ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নতুন করে এক তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে সমাজকে নতুন মাত্রায় নিয়ে আসতে সচেষ্ট হই, শুধুমাত্র তখনই আমরা এক নতুন বাংলাদেশ উপহার দিতে পারব।

সমাজকে নতুন মাত্রায় আনতে হলে তত্ত্ব প্রয়োজন (পৃথিবীতে তত্ত্বহীন কোনো ঘটনা ঘটে না) এবং এ ব্যাপারে আমাদের সহায়ক শক্তি হতে পারে সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও অন্যান্য মাস-মিডিয়ার সংগঠন। একজন ব্যক্তি-মানুষের অবদমন-ঘটিত মনোরোগ যেমন Psychotherapy দিয়ে ভালো করা যায়, ঠিক তেমনভাবেই বিভিন্ন মিডিয়াকে ব্যবহার করে আমরা Social Psychotherapy-র ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা জানি যে একটি সংবাদপত্রে কিংবা টিভি চ্যানেলে বার বার বিজ্ঞাপন প্রচার করলে কোনো একটি বিশেষ পণ্য-সম্পর্কীয় ধারণা মানুষের অচেতনে স্থান নেয় (যেমন– লাক্স, নোকিয়া, কোকাকোলা, প্যারাসুট নারিকেল তেল ইত্যাদি), ঠিক একইভাবে সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র বারবার প্রতিদিন সংবাদপত্রে এবং টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হলে জনগণের অবদমিত অচেতনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য (ইতিমধ্যেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও শিশুদের টিকা দেয়া-সম্পর্কীয় প্রচারণা আমাদের অচেতনকে সচেতন করেছে)। সমাজকে নতুন মাত্রায় আনার জন্য আমরা কোন কোন সূত্র প্রতিদিন প্রচার করব, তা নির্ধারণের জন্যই প্রয়োজন গবেষণার এবং একটি তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি করার।

সব শেষে শেষ কথা

বঙ্গাল বা বাঙালির 'যৌথ-অচেতন' এবং সমাজ-বিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে যা লেখা হল, তা যে সম্পূর্ণ সঠিক, এ কথা আমি বলব না। আমার এই প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে আরো অনেক আলোচনা/সমালোচনার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ এবং ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ ব্যাপারে তাদের সুচিন্তিত মতামত রাখতে পারেন। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলব আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জি

১. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, কলিকাতা, ১৯৯৪।
২. চৌধুরী শামসুর রহমান, সুফি দর্শন, দিব্যপ্রকাশ, ২০০২।
৩. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৪১।
৪. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১।
৫. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৩৫৬।
৬. মঈন চৌধুরী, সৃষ্টির সিঁড়ি, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৭।
৭. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪।
৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বচন ও প্রবচন, সময় প্রকাশন, ১৯৮৫।
9. Kenneth Meleish, Ed. Key Ideas in Human Thoughts, London, 1993.
10. Macdonnel, D. Theories of Discourse, Basil Blackwell, 1987.
11. Scruton, Roger. A Short History of Modern Philosophy, Ark, 1989.

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি...

সকাল: জানুয়ারি ৭, ২০০৭

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে সারাদিন ভালো হয়ে চলার 'অটো-সাজেশন' দিতে হল নিজেকেই। আমাদের কোনো এক কবি, যিনি ছিলেন মৌলিক সত্তার অধিকারী, তিনি এই 'অটো-সাজেশনটি' রেখে গিয়েছিলেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। সময় বদলে গেছে। কিন্তু আমাদের চেতনা-চৈতন্যের কোনো বিবর্তন হয়নি, ভালো থাকতে গেলেই তাই 'যৌথ-অচেতনের' ক্ষতিকর প্রকাশ বন্ধ রাখতে এখনো আমাদের প্রতিদিনই জপতে হয়– 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি।' কিন্তু তারপরও ভালো থাকা যায় না, খবরের কাগজ হাতে নিয়েই আমাকে পড়তে হয়:

– আজ থেকে তিনদিন অবরোধ, সর্বাত্মক আন্দোলনে মহাজোট (প্রথম আলো

রিপোর্ট)

– ভোটার তালিকা, ভোট কেন্দ্র, ব্যালট বাক্স কোনো কিছুরই ঠিক নেই (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– সাম্প্রতিক পরিস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় (ইউরোপীয় ইউনিয়ন)
– দেশ নিয়ে হতাশ পুরস্কারপ্রাপ্তরা (প্রথম আলো বর্ষসেরা বই: ১৪১২ পুরস্কার)

– চট্টগ্রাম বন্দর অচল ও মহাসড়ক বন্ধ করাই হবে অবরোধের লক্ষ্য (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– মহাজোটের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন হবে না (অলি আহমদ, এলডিপি)

– ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান (খালেদা জিয়া, বিএনপি)

– নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন হবে (রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ)

– সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের পুরনো মামলায় আসামী করা হচ্ছে (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– গণগ্রেপ্তারের নিন্দা জানিয়েছেন সুলতানা কামাল (আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক)

– অবরোধের আগে রাতে রাজধানীতে তিনটি বাসে আগুন (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– নির্বাচনকে প্রহসন বলেছে কয়েকটি ছোট দলও

– প্রধান উপদেষ্টা একতরফা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন (ওয়ার্কারস্ পার্টি)

– নির্বাচন বাতিলের দাবীতে সিপিবির কর্মসূচি ঘোষণা

– বিএনপি প্রার্থীকে নির্যাতনকারী বলেছে স্থানীয় নারীসমাজ (বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিরপুরের এসএ খালেক সম্পর্কে)

– প্রধান রাজনৈতিক দল ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না (চট্টগ্রামে বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপ)

– বৌদ্ধ সাধকের জন্মদিন উপলক্ষে রাঙামাটিতে অবরোধ প্রত্যাহার

– চারদলীয় জোট প্রার্থীরা তাদের প্রার্থীদের সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছেন (ইশা আন্দোলন)
– নির্বাচন সামনে রেখে আবারও সক্রিয় সাতক্ষীরার চরমপন্থীরা (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– অর্থহীন নির্বাচন নয় (প্রথম আলো সম্পাদকীয়)

– তিন মাস পরে দ্বিতীয় নির্বাচন হোক (ড. এম জহির)

– অবরোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশের প্রতি আহ্বান (বিএনপি নেতারা)

– ইসলামী দলগুলোর বর্তমান রাজনীতি লুটপাটের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা দেবে (হিযবুত তাহ্‌রীর)

– অবরোধেও চার দলের নির্বাচনী প্রচার চলবে (প্রথম আলো রিপোর্ট)

– প্রধান ব্যবসায়ী নেতারা আলোচনা করে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন (এফবিসিসিআই)

'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি'– বারবার জানার পরও মন আমার ভালো হল না, আমি সারাদিন ভালো হয়ে চলতে পারব, এমন মনে হল না। আমার মন বারবার ফিরে গেল বঙ্গাল বা বাঙালির ইতিহাসে, আমাদের মৌলিক-সত্তা কবির সময়ে, কিংবা তারও অনেক আগে। আমি বুঝতে পারলাম, আমরা কখনোই ভালো ছিলাম না।

অবদমিতের ইতিহাস

বঙ্গাল বা বাঙালিরা সবসময়ই ছিল অবদমিত অস্থির এক জাতীয়তাবোধহীন জাতি। সামাজিক ঐক্য আমাদের ছিল না, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে শোষণ করাই ছিল বঙ্গাল বা বাঙালির জীবন-দর্শন। সমাজকে শোষণ করার প্রথম উপাদান হিসেবে আমরা সমাজে এনেছিলাম জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন, মানুষের কপালে এঁকে দিয়েছিলাম 'উত্তম শঙ্কর', 'মধ্যম শঙ্কর' এবং 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর বায়বীয় চিহ্ন। শোষিতের কপালে শোষণের চিহ্ন আঁকার পরে, সমস্ত দোষ ভগবানের ওপর চাপিয়ে, বঙ্গাল বা বাঙালিদের স্বঘোষিত উত্তম-শঙ্কর বা ব্রাহ্মণগণ শোষণকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। কোনো-এক সময় (১২০৪ সালে), হঠাৎ বখতিয়ার খিলজি নামের এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সৈনিক মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বঙ্গালদের রাজা লক্ষণ সেন-এর নবদ্বীপস্থ প্রাসাদ আক্রমণ করেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে লক্ষণ সেন-এর রাজজ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণ বললেন– 'অসম্ভব! বখতিয়ার খিলজিকে বাধা দেয়া নিরর্থক'। জ্যোতিষীদের কথা শুনে

জনগণবিচ্ছিন্ন রাজা লক্ষণ সেন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পালালেন। রাজা পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজার ব্রাহ্মণ রাজকবি উমাপতি ধর-এর ভণ্ডামিও প্রকাশিত হল, তিনি বখতিয়ারকে বরণ করে লিখলেন– 'ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, সাধু! আপনার মাতা বীরপ্রসবিনী; নীচ হইলেও আপনার মতো লোকের জন্য বসুধা এখনও সুক্ষত্রিয় আছে।' (পাঠক, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ঘাড়ে ভূতের আছর হয়ে ভণ্ড 'উমাপতি ধর' এখনও আছে কিনা, তা আপনারা বিচার-বিশ্লেষণ করে একটু দেখুন)

বঙ্গদেশে ইসলাম আসার পর মুসলমানরা 'ম্লেচ্ছ' হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হল, কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণসহ সুবিধাবাদী শ্রেণী ম্লেচ্ছ বাদশাহ এবং আমীর-ওমরাহদের তোষামোদ করে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিল। মুসলমানরাও কম প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না, মুখে হিন্দুদের 'মালাউন', 'কাফের' বললেও, হিন্দু-নারীদের প্রতি তাদের লোভ ছিল ভালোই। কোনো হিন্দু নারীর 'ম্লেচ্ছদোষ বা যবন-দোষ' হলে সমাজ সেই নারীর পরিবারকেও 'একঘরে' করে রাখত এবং এর ফলে 'একঘরে' হওয়া পতিত হিন্দু জনগোষ্ঠীও মুসলমান হয়ে যেত। বঙ্গদেশে সেই সময় যে সুফি সাধকরা এসেছিলেন, তারা জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভেদকে মানতেন না এবং এ কারণে হিন্দু অন্ত্যজ বা শোষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এক সময় দেখা গেল বঙ্গদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক মুসলমান এবং এই অবস্থায় হিন্দু/মুসলমান কিংবা মালাউন/ম্লেচ্ছ যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো সমাজভাঙনের মূল উপাদান হয়ে বঙ্গাল/বাঙালির 'যৌথ-অচেতনের' অংশ হয়ে গেল।

বঙ্গদেশে যখন মুসলমান শাসকগণ হিন্দু ও মুসলমান সহযোগীদের নিয়ে সামাজিক শোষণে ব্যস্ত, তখন ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এ দেশে আসে। বঙ্গদেশে এসেই ইংরেজরা বুঝতে পারে যে জাত-পাত এবং ধর্ম-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকজন প্রচণ্ডভাবে অবদমিত এবং বিভক্ত, তাদের মাঝে কোনোরকম জাতীয়তাবোধ নেই। বঙ্গাল কিংবা বাঙালিদের স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর চরিত্রকে দুর্নীতির মাধ্যমে যে বশে রাখা সম্ভব, এ সত্যটাও ইংরেজদের বুঝতে খুব দেরি হয়নি। সবকিছু বুঝেশুনেই ইংরেজরা তাদের স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় বাংলার মসনদ দখল করে নেয়। বঙ্গাল বা বাঙালিদের মাঝে যেহেতু কোনোরকম জাতীয়তাবোধ ছিল না, সেহেতু ইংরেজদের মসনদ দখলকে তারা শুধুমাত্র 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ' হিসেবেই খুব সহজে মেনে নিয়েছিল। বঙ্গালির 'যৌথ অচেতনে' যেহেতু 'সাদা-চামড়ার' প্রতি দুর্বলতা ছিল (সেই ব্রাহ্মণবাদ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই), সেহেতু 'ফর্সা-সাদা' ইংরেজি প্রভুকে তারা গ্রহণ করেছিল আন্তরিকভাবেই। সাদা রঙের ইংরেজ চামড়া যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-সমাজকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল, তা বোঝা যায় তৎকালীন কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাবু-সমাজের বিকাশ থেকেই। বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল বাবু-সংস্কৃতির এবং এই বাবুরাই বিলেতি মদ্য পান করে, বাঈজি নাচিয়ে, কবুতর উড়িয়ে ইংরেজদের কছাকাছি যেতে চাইলেন। এক সময় বাবুদের 'মিস্টার' বা 'সাহেব' হতে খুব ইচ্ছে করে, ফলে বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু, চট্টোপাধ্যায় বাবু, রায় বাবু হয়ে গেলেন ব্যানার্জী সাহেব, চ্যাটার্জী সাহেব, রয় সাহেব। শুধুমাত্র বিভিন্ন অফিসের হেড ক্লার্ক কিংবা স্কুল মাস্টার 'বাবু' হিসেবে টিকে রইল। উচ্চ হিন্দুসমাজ যখন ইংরেজবন্দনায় ব্যস্ত, তখন মুসলমান সমাজ নিজেদের 'আশরাফ' আর 'আফতাব' শ্রেণীতে বিভক্ত করে, ইংরেজদের 'নাসারা' নামে চিহ্নিত করে, নিজেদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে খুঁজতে লাগলেন মক্কায়, মদিনায়, তুরস্কে কিংবা

পারস্যে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমানদের অবদমিত কামনা-বাসনাকে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল এবং সব বুঝে-শুনে Divide and Rule-এর উপাদান প্রয়োগ করে বেশ ভালোভাবেই দুইশত বছর রাজত্ব করে গেল।

১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা' এবং ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল সোসাইটি' হিন্দু-জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' সূচনা করে এবং 'বাঙালি/মুসলমান' নামক একটি যুগ্ম-বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বে বঙ্গদেশের বাংলাভাষী হিন্দু জনগোষ্ঠীকে 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত হলেও, বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ শুধুমাত্র 'মুসলমান' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এ ব্যাপারে ন্যাশনাল সোসাইটির নবগোপাল মিত্রের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন– 'হিন্দু নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাতি। কাজেই তাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো সভাকে জাতীয় সভা বলতে কোনো বাধা নেই।' ১৮৮২ সালে দয়ানন্দের আর্যসমাজের গোরক্ষা আন্দোলন এবং ১৯০২ সালের শিবাজী উৎসব হিন্দু ও মুসলমানদের বিভেদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং এই বিভেদই একসময় জন্ম দেয় দ্বিজাতিতত্ত্বের এক অস্বাভাবিক ধারণার। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে জাতির বিভাজন করা যায়, তা একমাত্র বঙ্গদেশের বঙ্গাল জনগণ ও নেতারাই চিন্তা করতে পেরেছিলেন। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল তথাকথিত হিন্দু নবজাগরণের চূড়ান্ত ফসল এবং এ তত্ত্বের মাধ্যমেই বঙ্গাল সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল। হিন্দু নবজাগরণ এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে সবসময় কাজ করেছিল শ্রেণীস্বার্থ, হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতা, যা বঙ্গাল সমাজের 'যৌথ অচেতনের' উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিকভাবেই অবস্থান করছে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হয়। ইংরেজ শাসনের অবসান এবং পাকিস্তান নামের স্বাধীন রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠার লগ্নে বঙ্গাল জনগোষ্ঠীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাসীগণ প্রচণ্ডভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা বঙ্গাল/বাঙালির অবদমিত অচেতনের অংশ হয়ে এখনো অবস্থান করছে। স্বাধীনতার পর পূর্ব-পাকিস্তানের অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল হিন্দুদের বাড়িঘর ও জমি-জমা দখল করাতে এবং একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান ভাইয়েরাও তাদের সহযোগীদের নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বঙ্গাল জনগোষ্ঠীকে শোষণ করতে থাকে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার জনগণ প্রাণ দিয়ে যে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল, সেটাই ছিল বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতি বা জাতীয়তাবাদ-কেন্দ্রিক প্রথম সফল আন্দোলন। এই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনই পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

কিন্তু শুধুমাত্র ভাষা-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ছাড়া, ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের বঙ্গাল বা বাঙালি অবদমিত মনস্তত্ত্বের কোনো ব্যাপক পরিবর্তন আনেনি। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এক ধরনের অরাজকতার চিত্রই আমরা উদ্ধার করতে পারব, আমাদের সমাজ-চিত্রের প্রতীক প্রতিবিম্ব হিসেবে আমরা দেখতে পাব প্রাদেশিক পার্লামেন্টের মেম্বাররা লাঠি হাতে মারামারি করছেন, মাইকের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে স্পিকার সাহেবকে মেরে ফেলেছেন। এমন একটা অরাজক অবস্থার মাঝেই চলতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, আর সময় ও সমাজের দূষণ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত বঙ্গাল বা বাঙালিদের

আরও স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর করে তোলে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের বঙ্গাল বা বাঙালিরা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়, 'জয় বাংলা' শ্লোগান আমাদের মনে সৃষ্টি করে এক একক জাতীয়তাবোধ এবং আমরা পাই আমাদের প্রিয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে (এখানে উল্লেখ্য যে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-কে গ্রহণ করেছিলাম, তাতে কিছু তাত্ত্বিক দুর্বলতা ছিল। ১৮৭০ সাল নাগাদ যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' উন্মেষ ঘটেছিল, তা ছিল সাম্প্রদায়িক এবং এ কারণ আমাদের উচিত ছিল আমাদের ঐতিহাসিক উৎসে/শিকড়ে ফিরে গিয়ে 'বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ'-কে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা জানি যে বঙ্গদেশে বসবাসকারী আমাদের পূর্ব-পুরুষরা ছিল বঙ্গাল সমাজের লোক এবং কৌম-সমাজভিত্তিক 'বঙ্গাল জাতি' ছিল অসাম্প্রদায়িক। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর উৎস/শিকড়ও ছিল 'বঙ্গাল জাতির' সাথে সম্পৃক্ত)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও গণতন্ত্রের বদলে আমরা পেয়েছিলাম এক ধরনের লুটপাটতন্ত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং দুঃখ করে বলেছিলেন– 'চাটার দল সব কিছু খেয়ে ফেলল।' বঙ্গবন্ধু খুব ভালো সংগঠক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অনেকসময় যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেননি, ফলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি রাষ্ট্রকাঠামোর উপাদান হয়েই সমাজে অবস্থান করছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে, বঙ্গবন্ধুর এককালীন সহকর্মী খোন্দকার মোসতাক আহমদ বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করেন। খোন্দকার সাহেব ক্ষমতায় এসেই বঙ্গাল বা বাঙালিদের ওপর 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' তত্ত্ব চাপিয়ে দেন, আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সবচেয়ে প্রাচীন (!) উপাদান হয়ে যায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার ঘটনা। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' যেহেতু সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' শ্লোগানটিকেও বদলে বিদেশি ভাষা যুক্ত করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করা হয়।

খোন্দকার মোসতাক আহমদ খুব বেশিদিন বাংলাদেশের মসনদ-এর দখল রাখতে পারেননি, সোনাবাহিনীর কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফ-এর এক ব্যর্থ ক্যু-এর পরিণতিতে, সিপাহি-জনতার বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা-কর্মকতা জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে নেন (আমি ব্যাপারটিকে দখল বলছি এ কারণে যে ১৯৭১ সালের পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'দখল' করার ইচ্ছাই প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছে। লাল বাহিনী, মুজিব বাহিনী ইত্যাদির জন্ম, বাকশাল গঠন, বঙ্গবন্ধুর শহীদ হওয়া, খন্দকার মোসতাক কর্তৃক ক্ষমতা দখল, জিয়াউর রহমান-এর আগমন ইত্যাদি কোনোটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিল না।) জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তার দল 'বিএনপি'-কে সংগঠিত করেন এবং সহযোগী শক্তি হিসেবে সাম্প্রদায়িক দলগুলোকেও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা দেন। জিয়াউর রহমানের তত্ত্ব 'I will make politics difficult' এবং 'Money is no problem' বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে জিয়াউর রহমান খুবই সৎ থাকলেও তার দলের লোকজনদের দুর্নীতিকে কঠোরভাবে দমন করেননি এবং এ কারণে বাংলাদেশের গণতন্ত্রে দুর্নীতির প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৮১ সালে আবারও এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রামে তার সহকর্মী, সহযোদ্ধা জেনারেল মঞ্জুরের হাতে নিহত হন তিনি

এবং এই হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদ ক্ষমতা লাভ করেই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কিছু নেতাসহ অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে 'জাতীয় পার্টি'-র সৃষ্টি করেন এবং গণতন্ত্রের নামে দুর্নীতির বিস্তার ঘটান খুবই যোগ্যতার সাথে। এরশাদ যে একজন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ছিলেন তা বাংলাদেশের আদালত কর্তৃকও সমর্থিত, দুর্নীতির দায়ে তিনি বহু বছর জেলও খেটেছেন। ১৯৯০ সালে এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং এক নির্বাচনের মাধ্যমে মরহুম জিয়াউর রহমানের বিএনপি তাঁর বিধবা-পত্নী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সরকার গঠন করে। বিএনপি ক্ষমতায় এসেই শহীদ জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আর আওয়ামী লীগ তার বিরোধিতা করতে থাকে (লেখক নিজে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং মেজর জিয়া তার প্রথম দিকের ঘোষণা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকেই উচ্চারণ করেছিলেন।) বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরই সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক কার্যক্রম উপহার দিতে ব্যর্থ হয়। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে, এ কথা বলা যায় যে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত ও অন্যান্য ছোট দল মিলেমিশেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নষ্ট করে ফেলে, যেভাবেই হোক ক্ষমতা দখল করে দুর্নীতি করাই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলোর অপ্রকাশিত কিন্তু আসল ম্যানিফেস্টো। বিএনপির পর আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসূ কার্যক্রম নিতে পারেনি। বর্তমানে আবার বিএনপি পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে নতুন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে, তা জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছে এবং আওয়ামী লীগও অন্যান্য ছোট দলের সাথে মহাজোট গঠন করে যেভাবেই হোক ক্ষমতা দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ কিংবা বঙ্গালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, বিচার-বিশ্লেষণ করলে, আমরা এক অবদমিত ও শোষিত জনগোষ্ঠীর বিবর্তনকে উদ্ধার করতে পারব। আমরা দেখতে পাব, বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠী কখনেই নিজেরা নিজেদের শাসন করেনি; তারা সবসময় স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, আর তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহিরাগত শোষকশ্রেণী বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ করছে। বিদেশি শক্তির সহযোগী হয়ে কিছু সংখ্যক বাঙালি কিংবা বঙ্গাল নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে ঠিকই। কিন্তু দেশপ্রেমভিত্তিক চেতনা ও চৈতন্যের বিকাশ কখনো হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বঙ্গালরা প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। আমরা আমাদের প্রিয় স্বাধীন 'বাংলাদেশকে' পাই। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান শ্রেণীস্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতিপরায়ণ মানসিকতা ইত্যাদি আমাদের 'যৌথ অচেতনে' থাকার ফলে দেশপ্রেমের কোনো প্রকাশই আমরা ঘটাতে পারিনি। যেহেতু আমাদের সমাজের তাত্ত্বিক ভিত্তি 'যত মত তত পথ'-এর ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে গেছে, সেহেতু কোনো-এক একক চিন্তা-চেতনায় আমরা দেশের উন্নতি চাইনি। আমাদের মাঝে সবসময় অবস্থান করছে ভণ্ডামি এবং গ্রাম্য ঝগড়াটে মানসিকতা, যার ফলে

আমাদের 'গণতন্ত্র'-ও হয়ে গেছে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে সমাজকে শোষণ করার জন্য এক ধরনের ঝগড়া (বেগম খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনা যে একে অপরের চেহারাও দেখেন না, তা আমাদের অচেতনে অঙ্কিত গ্রাম্য-ঝগড়াটে-মানসিকতার ফসল, কোনো অবস্থাতেই বিষয়টি গণতন্ত্র-কেন্দ্রিক রাজনীতির নিয়ম-কানুন গ্রাহ্য করে না)। মৌলবাদী শক্তি এবং মাস্তানতন্ত্রের সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার উগ্র বাসনাই বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীকে উপহার দিয়েছে ঘেরাও কর্মসূচি, অযথা ধর্মঘট এবং অসংখ্য মৃতদেহ (মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগের সাথে শায়খুল হাদিসের ফতোয়া-কেন্দ্রিক চুক্তি কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ক্ষমতা দখলের তত্ত্ব কাজ করলেও, গণতন্ত্রের কোনো সূত্রই কাজ করে না)। সব সত্য বিচার-বিবেচনার পর আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, বাংলাদেশে এখনো গণতন্ত্র কায়েম হয়নি, গণতন্ত্রের নামে এখানে চলছে গণশোষণতন্ত্র।

এবং তারপর...

'সকালে উঠিয়া মনে মনে কোনো কিছু বলিয়াই' এখন আর আমাদের মন ভালো হয় না। খারাপ মন নিয়ে অনেক আবোল-তাবোল লেখার পরই আমি পুষ্কর দাশগুপ্ত রচিত 'দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা' নামক একটি প্রবন্ধের বই-এর খোঁজ পাই (প্রকাশক: রক্তকরবী, কোলকাতা, ১৯৯৫) এবং ঐ বই-এ গ্রন্থিত গণশোষণতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা পড়ে বেশ মজা পাই। পুষ্কর দাশগুপ্তের সংজ্ঞাগুলো যেহেতু খুবই যৌক্তিক, গণশোষণতন্ত্র-বিষয়ক ধারণা সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য তাই সংজ্ঞাগুলো তুলে দিলাম:

গণতন্ত্র (বি.) আদিতে ইংরেজি democracy শব্দের অনুবাদ, কিন্তু বর্তমানে বাস্তব প্রয়োগ অনুসারে নতুন করে এই শব্দের ইংরেজি অনুবাদ করা যায় demonocracy। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভয় দেখানো, জালভোট, বুথ দখল ইত্যাদি বলাৎকারের বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত দানবদের দ্বারা ক্ষমতা দখল– তারপর নিজের, নিজের দলের, নিজের ও নিজের দলের তাঁবেদার এবং চর-অনুচরদের স্বার্থ ও সুবিধার্থে দেশশোষণ গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক সরকার হল বদমাইশদের জন্য, বদমাইশদের দ্বারা গঠিত বদমাইশদের সরকার। মাৎস্যন্যায় গণতন্ত্রের সাধারণ ধর্ম। যৌগিক শব্দ হিসেবে গণতন্ত্র শব্দটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। এর ব্যাসবাক্য হল গণ-শোষণ তন্ত্র।

রাজনীতি (বি.)

জনসাধারণকে যেন তেন প্রকারেন প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রণকৌশল।

মন্ত্র (বি.)

গণ-শোষণ তন্ত্রের প্রতিভূ। ফকিরকে রাজা করার, রাজাকে ফকির বানানোর ক্ষমতার অধিকারী। ফেরেববাজ তাঁবেদারদের দ্বারা পূজিত, বুকনির যাদুকর, পুলিশ, ঠগী ও ঠেঙাড়ে বাহিনীর প্রভু।

পুলিশ (বি.)
সরকার পোষিত বর্গীবাহিনী। ক্ষমতাসীনদের দেশশোষণের সহায়ক; মাস্তান, গুণ্ডা, বদমাইশ, কালোবাজারি ইত্যাদির বন্ধু ও রক্ষক; নিরীহ বেকুফদের যম। অন্যায়, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি এই বর্গীবাহিনীর সাধারণ গুণ।

সমাজসেবী (বি.)
১. যাঁরা সাধারণ মানুষকে বাচন ও কর্মের মধ্যে বিভিন্ন কৌশলে ধোঁকা দেন, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করেন ২. বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীর পক্ষাশ্রিত ও অধীন ঠগী এবং ঠেঙাড়েবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মাস্তান, গুণ্ডা ও ক্যাডার।

সমাজবিরোধী (বি.)
রাজনৈতিক বা/এবং ধর্মীয় দলের সম্পর্কহীন, মন্ত্রী, নেতা, পুলিশ, মাস্তান, গুণ্ডা আর ক্যাডারদের অপরিচিত যুক্তিবাদী, স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তির অধিকারী ব্যক্তি।

ব্যবসা (বি.)
চুরি, জোচ্চুরি, প্রতারণা, দালালি, কপটতা, শঠতা ও মিথ্যাচার দ্বারা অর্থোপার্জন।

বুদ্ধিমান (বি./বিণ.)
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙায় বিশেষজ্ঞ আদর্শহীন, স্বার্থপর, সুযোগসন্ধানী, ধান্দাবাজ ও আখের গুছানোয় তৎপর ব্যক্তি।

বুদ্ধিজীবী (বি.)
সাহেবদের উক্তি আউড়ানোয় কৃতবিদ্যা, হয়কে নয় ও নয়কে হয় করায় সিদ্ধহস্ত, দলাদলিতে ক্লান্তিহীন, ভণ্ডামির যাদুকর, বাচনবীর বহুরূপী, স্বার্থপরতার অবতার।

সততা (বি.)
পুরনো বস্তাপচা আদর্শের তাগিদে বোকামি, আখের গুছানোয় অক্ষমতার ফলে দুঃখ-কষ্ট এবং অনটন।

আমি উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর সাথে দুই-চারটা সংজ্ঞা যোগ করব এবং পাঠকদের অনুরোধ করব দেশকাল গ্রাহ্য করে তারা যেন যৌক্তিক সংজ্ঞার সংখ্যা বাড়ান। আমার দেয়া সংজ্ঞাগুলো হল:

বিএনপি (বি.)
বাংলাদেশকে পাঁচ পাঁচবার দুর্নীতিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট করার দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছে এই দল। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সামাজিক শোষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত দল হিসেবে অতি পরিচিত। হুজুগে এবং হুজ্জতে বঙ্গালদের একটি প্রিয় দল।

আওয়ামী লীগ

যাহা আওয়ামী লীগ তাহাই বিএনপি। মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেও আ-লী-র অন্তরের আত্মীয় হল শায়খুল হাদিস। মাঝে মধ্যে এই দলের ধর্মতত্ত্ব মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। যে-কোনোভাবে ক্ষমতা দখল করে শোষণ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে কাজ করে আওয়ামী লীগ, তবে ধর্মঘট আর ঘেরাও করে জনগণকে কষ্ট দেয়ার বদলে 'আমরণ অনশন' যে করা যায়, এ সত্য দলটির নেতা-নেত্রীরা বোঝে না।

অন্যান্য দল

অন্যান্য দলগুলো সিজনাল দল হিসেবে পরিচিত এবং সিজনের সময় জোট বা মহাজোট সংগঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সিজন না থাকলে দলগুলোর নেতারা অনেকসময় সরকারের দালাল হিসেবে শোষণে অংশগ্রহণ কের।

জামাত: যাহা জামাত তাহাই বিএনপি এবং ইহাই একসময় আওয়ামী লীগের সাথেও ছিল। সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে বিবেচিত হলেও অনেক ছোট-খাট ইসলামপন্থী দল জামাতকে প্রকৃত মুসলমানের দল হিসেবে গণ্য করে না।

সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল

সমাজ শোষণ করে টাকার কুমির হওয়ার পর নিজস্ব ক্ষমতা সংরক্ষণ করার জন্য কুমিরগণ সংবাদপত্র প্রকাশ করেন কিংবা টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন।

এখন তবে উপায় কী?

সকালে উঠিয়া মনে মনে ভালো থাকার যতই ইচ্ছে পোষণ করি না কেন, আমাদের সমাজ-বাস্তবতা ভালো থাকতে দেবে না আমাদের। যদি ভালো থাকতে হয় তবে কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের 'যৌথ অচেতনে' অবস্থানরত অবদমনগুলো দূর করতে হবে। এই স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা এবং দুর্নীতির ইচ্ছা দূর করতে হলে আমাদের প্রয়োজন Social Psychotherapy-র। এ কাজটি করতে পারে আমাদের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ও মিডিয়া হাউজগুলো। যদি তা না করা যায়, তবে হয়তো-বা আমাদের প্রয়োজন হবে আত্মশুদ্ধির এক নতুন মুক্তিযুদ্ধের।

মনস্তত্ত্ব, ভাষা ও বঙ্গাল সংস্কৃতি পূর্বকথা

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে, খুব সঠিকভাবে সংস্কৃতির সব উপাদানকে এক সাথে করে একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানো আসলেও মুশকিল। 'সংস্কৃতি' শব্দটা নিয়েই কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের মাঝে ছিল, এখনো আছে। কেউ কেউ মনে করেন, 'কৃষ্টি' শব্দটি দিয়ে একটি জাতি কিংবা সমাজের মূল্যবোধ, ভাষা, সাহিত্য, আচার, আচরণ, রীতি-নীতি, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদিকে যেভাবে বোঝানো যায়, সংস্কৃতি শব্দটি দিয়ে ঠিক একই মাত্রার দ্যোতনা আনা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষপাতিত্ব থাকায় ইংরেজি culture শব্দটির বিপরীতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষাতে মোটামুটিভাবে স্থান

করে নিয়েছে। তবে এ কথাও সত্য, এখনো আমরা অনেকেই 'সংস্কৃতি' বোঝাতে 'কৃষ্টি' শব্দটিও ব্যবহার করি।

কোলকাতা ও শান্তিনিকেতন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি-চর্চা একসময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির মর্মার্থ নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে, সংস্কৃতির বিকাশ বা চর্চার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায় 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানসমূহের আনুষ্ঠানিকতা। এখনো আমাদের সমাজের অনেক শিক্ষিত লোকই 'সংস্কৃতি-চর্চা' বলতে গান-বাজনার আসরকেই বোঝাতে চান। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি যে তাদের জীবন ও চরিত্রের উপাদান হয়ে তাদের মাঝেই অবস্থান করছে, তা উপলব্ধি করাও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' এবং 'কৃষ্টি' নামক দুটি শব্দ আছে, কিন্তু দ্যোতক হিসেবে শব্দ দুটির সঠিক দ্যোতিত রূপ আমাদের চেতনসত্তায় কেন পৌঁছাচ্ছে না, তা বিচার-বিশ্লেষণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন বাঙালি বা বঙ্গাল সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন প্রচুর; বিভিন্ন সত্য, অর্ধসত্য এবং মিথ্যা অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তও তারা উপস্থিত করেছেন যৌক্তিকভাবেই, কিন্তু সংস্কৃতি বা কৃষ্টির আসল দ্যোতিত অর্থকে বাঙালি/বঙ্গাল চেতনা-চৈতন্যে উপস্থিত করতে পারেনি কখনোই। আমরা Cultured/uncultured যুগ্ম-বৈপরীত্যটিকে যে মাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণ করি, ঠিক একই মাত্রায় সংস্কৃতি/অপসংস্কৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিচার-বিশ্লেষণে আনি না। কেন আনি না, এই প্রশ্নের উত্তরে যথাযথ যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে আমাদের জ্ঞানীগুণীজন সব সময় ধর্ম, সামাজিক বিভেদ, জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন ইত্যাদিকে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু সংস্কৃতির উৎসমূলে অবস্থানরত মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণে আনেননি।

সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সাথে যে সমাজ-মনস্তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানীগুণীজন যৌক্তিকভাবে কখনই উপলব্ধি করেননি, এবং এর কারণ হল 'সংস্কৃতি' শব্দটিই ছিল বঙ্গাল বা বাঙালিদের কাছে খুবই নতুন। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্যারিস গিয়ে তার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে জানতে পারেন যে, মারাঠি ভাষায় Culture শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃত' শব্দটির প্রচলন আছে। দেশে ফিরে এসে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ে অবহিত করলে রবীন্দ্রনাথ Culture শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় একটি নতুন শব্দ 'সংস্কৃতি' যোগ হল বটে, কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যায় ঘুরে ফিরে ইংরেজি শব্দ Culture-এর উপাদানসমূহই প্রাধান্য পেল। এ সময় 'সংস্কৃতি' শব্দটির সাথে অল্পসল্প ভারতীয় উপাদান যোগ করার তাগিদে আত্মার অধিতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বও নিয়ে আসা হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্য উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখলেন–

> "শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ।" (ছন্দ : রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা-১৪০৬)।

"...তার [মানুষের] সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"। ('সাহিত্যের পথে': রবীন্দ্র রচনাবলী, ঢাকা ১৪০৬)।

রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃতি চিন্তা'কে বিশ্লেষণ করে কিছু মৌলিক এবং যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। প্রশ্নগুলো হল :

ক. আত্মসংস্কৃতি আর শিল্প কিংবা শিল্পবোধ কি একই উপাদান?
খ. পরিবেশ, প্রকৃতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদিকে বিচার-বিশ্লেষণে না এনে শুধুমাত্র আত্মার সংস্কারে সাংস্কৃতিক বিকাশ কি আদৌ সম্ভব?
গ. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' কি একটি অধিতাত্ত্বিক বাণী নয়? যদি এই বাণীতে যুক্তি থেকে থাকে, তবে কি আমাদের সংস্কৃতির সাথে শুধুমাত্র সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে?

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে যদি যুক্তিকে টেনে আনি তবে আমাদের অবশ্যই বলতেই হবে যে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-চিন্তা আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেনি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তার রচিত 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে আবার 'এগিয়ে চলার' সাথে 'সংস্কৃতি'র সম্পর্ক স্থাপন করে ঐতরেয় মন্ত্র 'চরৈবতি'র প্রসঙ্গ টেনেছেন।
মন্ত্রটি হল :

চরণ বৈ মধু বিপুতি চরণ স্বাদুমুদুম্বরম।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো না তন্দ্রয়তে চরণ॥
চরৈবতি চরৈবতি॥

(চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, দেখো ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।)

সংস্কৃতিকে (Culture) কেন্দ্র করে একসময় সভ্যতার (Civilization) সৃষ্টি হয়। মানুষ এগিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এই একই সংস্কৃতি 'এগিয়ে যাওয়ার' সাথে বিরোধ (Conflict) সৃষ্টি করে মানুষের সভ্যতাকে নষ্টও করে ফেলতে পারে। এ সত্য ঐতরেয় মন্ত্র-জাত ক্ষিতিমোহন সেন-এর বয়ান বা text-এ স্থান পায়নি। সংস্কৃতি-সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বিভিন্ন অধিতাত্ত্বিক (metaphysical) উপাদান নিয়ে আসেন এবং তিনি কিছু যুক্তি আর কিছুটা অযুক্তি মিলিয়ে লিখেন :

"পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই, কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি, প্রভৃতির অতিরিক্ত আর-একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের

সভ্যতার আভ্যন্তরপ্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর- একদিকে তার বাহ্য-সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপী ভাষায় Culture (জরমান kultur 'কুলতুর') শব্দ রূপে।... আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তরপ্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তা হচ্ছে Culture।"

"ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান।"

(সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৬)

সুনীতিকুমার কথিত 'আভ্যন্তরপ্রাণ বা অনুপ্রেরণা' কিংবা 'ভাবপুঞ্জ' ইত্যাদি কোনোভাবেই সংস্কৃতির আসল রূপ ও স্বরূপকে আমাদের কাছে তুলে ধরে না। এ সময় সংস্কৃতির কিছুটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখলেন :

"রবীন্দ্রনাথ Culture বলতে বুঝতেন শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি, ভব্যতা, ভদ্রতা, চিত্তোৎকর্ষ, refinement ইত্যাদি; একান্ত জীবনধারণ ও জীবনযাপনের জন্য যে স্থূল দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম ও তার ফলশ্রুতি, তাকে তিনি Culture বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।"

"সুনীতিবাবুর সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় রচনাদি থেকে মনে হয়, তিনিও এই ধরনের মতই পোষণ করতেন।"

"মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সেই মানবশিশুর সঙ্গে একটি পশুশাবকের কোনও পার্থক্য বড় একটা থাকে না। কিন্তু তার পর থেকেই মা-এর ও পরিবারের কোলে সে যখন বাড়তে থাকে, তখন খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, শোয়া, বসা, চলা থেকে পদে পদে স্তরে স্তরে তার সংস্কারসাধন চলতেই থাকে; বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাদীক্ষাও সেই সংস্কারক্রিয়ারই অন্তর্গত। শরীরচর্চা, জ্ঞানচর্চা, শিল্পসাহিত্যচর্চা, গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আদান-প্রদানক্রিয়া ইত্যাদিও তার নিজকে ক্রমশ উন্নততর, ক্রমশ বেশি সংস্কৃত করবার অবিরাম প্রয়াস। যে-জীবন ছিল প্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মশাসিত-মাত্র তাকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্রকর্মের বিচিত্রতর নিয়ম-সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলা। তাছাড়া, জীবনের পথে চলতে চলতে সংসারের দৈনন্দিন কর্মের রথচক্রে নানা মালিন্য, নানা আবর্জনা জমতেই থাকে। মালিন্য ও আবর্জনা শুধু ধুলোবালি-কালি নয়, শুধু মৃত খড়কুটো নয়, অভ্যাসের মালিন্য আছে, অর্থবোধহীন আবৃত্তিরও আবর্জনা আছে, ব্যবহারে-ব্যবহারেও ক্ষয় আছে। সেজন্য প্রতিনিয়তই সজ্ঞান সচেতন চেষ্টা রাখতে হয়, জীবনকে ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখবার জন্যে, এই সচেতন সজ্ঞান ক্রিয়াও সংস্কার-ক্রিয়া, এবং এই ক্রিয়ার যে ফললাভ ঘটে তাকেই তো আমরা বলি সংস্কৃতি।" (কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৯)।

নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করেন, এবং জীবনের ক্ষয়, মালিন্য ও আবর্জনামুক্ত রাখার সজ্ঞান সংস্কার ক্রিয়াসমূহের ফলকেই 'সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। নীহাররঞ্জন রায় কথিত ক্ষয়, মালিন্য এবং আবর্জনা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিলেও, শ্রী রায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেননি। পবিত্র সরকার তার দেয়া 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যায় বলেন–

> "মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল– এই দু'য়ের তফাতই হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবনপ্রতিবেশে মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই 'সংস্কৃতি', বাকিটা হল 'প্রকৃতি'।" (লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯১)

পবিত্র সরকারের দেয়া সংস্কৃতির সংজ্ঞা আসলে 'সভ্যতার' সংজ্ঞা। পবিত্র সরকারের কাছে Culture এবং Civilization হয়তো-বা একই মাত্রার দ্যোতনা নিয়ে এসেছিল এবং এর ফলে 'সভ্যতার তফাত'কে তিনি 'সংস্কৃতির তফাত' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক গোপাল হালদার সংস্কৃতি-কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

> "মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি;"... "জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনই পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তার পরিবর্তন চলে।"
>
> "সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। ...সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়– চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবই বুঝায়,– তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি–মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।" (সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, ১৯৬৫)

গোপাল হালদার-এর ব্যাখ্যায় সংস্কৃতির বিবর্তন বা metamorphosis-কে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা 'সৃষ্টি' ও মানুষের জীবন-সংগ্রামের সমগ্র প্রচেষ্টা।

সংস্কৃতির সর্বশেষ বিচার, বিশ্লেষণ ও ইতিহাস আমরা পাই গোলাম মুরশিদ রচিত 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' গ্রন্থে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি লিখেন :

> "উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এডওয়ার্ড টেইলর সংস্কৃতির যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা বিবেচিত হয় ধ্রুপদী সংজ্ঞা বলে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানুষের বিশ্বাস, আচার, আচরণ এবং জ্ঞানের একটি সমন্বিত প্যাটার্নকে বলা যায় সংস্কৃতি। ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্ম ও বিশ্বাস; রীতিনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন; উৎসব ও পার্বণ; শিল্পকর্ম; এবং প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন হাতিয়ার ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই সংস্কৃতি। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব শিক্ষা, সামর্থ্য এবং অভ্যাস আয়ত্ত করে– তাও সংস্কৃতির অঙ্গ।"
>
> "জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই। কিন্তু সংস্কৃতিই আমাদের মানুষে পরিণত করে। পরিণত করে সামাজিক জীবে। সংস্কৃতি দিয়েই একটা মূল্যবোধ,

মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণার অধিকারী হই। বিদগ্ধ রুচির সুশীল মানুষে পরিণত হই। আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।" (হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০৬)

গোলাম মুরশিদ কর্তৃক উদ্ধৃত এডওয়ার্ড টেইলর-এর সংস্কৃতি-বিষয়ক সংজ্ঞা ধ্রুপদী হলেও, সংস্কৃতির সাথে সমাজ-মনস্তত্ত্বের সম্পর্ককে উপস্থাপন করে না। লেখকের মতে সমাজ-মনস্তত্ত্ব কিংবা যৌথ-অচেতনের (Collective unconscious) কার্য-কলাপহীন সংস্কৃতি অবস্থান করাই অসম্ভব। গোলাম মুরশিদ-এর বক্তব্য– 'জন্মের সময়ে আমরা একটি জন্তু হয়ে জন্মাই' (নীহাররঞ্জন রায়ও এমন বলেছিলেন) কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। জেনেটিক কারণে একটি মানুষ মানুষ হিসেবে, একটি বাঘ বাঘ হিসেবে কিংবা একটি গরু গরু হিসেবেই জন্মায়। বাঘ আর গরুর যেহেতু সংস্কৃতি নেই, সেহেতু বাঘ আর গরুর পক্ষে 'মানুষ' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু মানুষের সংস্কৃতি থাকার কারণেই 'অমানুষ' হয়ে যেতে পারে। গোলাম মুরশিদ এই সত্যটি স্বীকার করে লিখেছেন– 'আবার, তেমন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হলে সাধারণ মনুষ্য-সন্তানও জন্তুতে অর্থাৎ অমানুষে পরিণত হতে পারে। এককথায়, সংস্কৃতির কারণেই আমরা যা হই, তা হই।' আমরা 'যা হই, তা হই' কেন, এ প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না দিয়েই মুরশিদ রচনা করেছেন তার প্রথাগত হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস। (হাজার বছর আগে বঙ্গদেশে আদি-অস্ত্রাল-দ্রাবিড়-আলপীয়-ইউরোপয়েড মিশ্র জনগোষ্ঠীর বঙ্গালরা বসবাস করতো। তাদের ভাষা হয়তো বাংলা ছিল না। কিন্তু ঐ আদি বঙ্গালদের ভাষার উপাদান এবং যৌথ-অচেতনের প্রত্নলেখ যে এখনো আমাদের মাঝে নেই, তা হলফ করে বলা যাবে না। সবকিছু বিবেচনা করে বঙ্গাল বা বাঙালির সব ধরনের ইতিহাসে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ আনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।) বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাতের কাছে না পেলেও কবি ও প্রাবন্ধিক পুস্কর দাশগুপ্তের একটি লেখা আমাদের সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়কে কিছুটা হলেও তুলে ধরেছে বলে মনে হল। ভারতীয়ত্বের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে পুস্কর লিখেছেন :

"অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, ভাষা, ধর্ম, আচার-বিচার ইত্যাদির ব্যবধান পেরিয়ে সারা ভারতে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সাধারণ চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তাহলে তা হল ভণ্ডামি। ভারতীয় (বাঙালি বলে আলাদা না করে) সমাজের সর্বস্তরে ভণ্ডামির অবাধ রাজত্ব আর ভণ্ডামি এই সনাতন দেশে সর্বধর্মসম্মত, সমস্ত স্মৃতি এবং নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত। ধর্মবাক্য, নীতিবাক্যের আড়ালে চুরি, চামারি, ফেরেব্বাজি করে যাও, ভেজাল দাও, কালো পয়সার পাহাড় বানাও– আড়াল থাকলেই হল। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, ব্যক্তিগত সুবিধা বা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, খুন-জখম, জাল জুয়োচুরি, কালো-বাজারি সব করে যেতে পার, তবে তারপর তুমি যদি ঘটা করে তেত্রিশ দেবতার পুজো দাও, হজ করে আস, মন্দির, মসজিদ কি গির্জা বানাও তাহলে সমাজ, জাতি, ধর্ম তোমাকে

> বাহবা দেবে, মাথায় তুলে নাচবে। ইদানীংকালে আরো নতুন পথ হয়েছে, যে করে হোক নিজের ধান্দা দেখ, অত্যাচার-অনাচার যা পার কর, আখের গুছোও তবে মুখে জনসেবার, গণতন্ত্রের বুকনি কপচাতে হবে, পার তো সমাজতন্ত্র, গরিব হটাও ইত্যাদি হুংকার দিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত জীবনে যত পার দুর্নীতি করে যাও, লাম্পট্য কি হরেক রকমের বদমাইসিও করে যেতে পার, শুধু নীতির মালাজপটা যেন ঠিক থাকে, সৎ সংসারীর ভেকটাও পরিপাটি রাখতে হবে– ডুবে ডুবে জল খেলে ভারতীয় সমাজ নামক শিবঠাকুরের বাপও তা দেখতে পায় না, অতএব কোনো ঝামেলা নেই।" (দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫)

পুষ্কর দাশগুপ্ত যে চারিত্রিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন, তাই হল বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতির মাঝে অবস্থানরত অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, এবং লেখক মনে করে যে, বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত যৌথ-অচেতনের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংস্কৃতি বিষয়ক আসল মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে উপস্থাপন করা সম্ভব। সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে অবস্থান করে ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতি। সংস্কৃতির অংশ হয়ে মানুষের যে আচার, ব্যবহার, ভদ্রতা-নম্রতা, পূজা-পার্বণ, শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্যকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মতো উপাদানসমূহের উপস্থিতি থাকে, তার মূলেও অবস্থান করে মানুষের ভাষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কার্যরত ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষের মনোজগতকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং মনস্তত্ত্বের উপাদান 'যৌথ-অচেতন'-ই সংস্কৃতির সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হয়ে ভাষা, সাহিত্য, ধারণা, ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, নিয়মকানুন, উৎসব ও পার্বণ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি অবস্থান করলেও, সর্বকর্মেই অবস্থান করছে আমাদের 'যৌথ-অচেতনের' ক্রিয়া-বিক্রিয়া, এবং এই মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াই আমাদের সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, ভণ্ডামি এবং বিভিন্ন অস্তিত্বকেন্দ্রিক সঙ্কট। বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের তাই ভাষা, প্রকৃতি, সমাজ-সংগঠন ও অর্থনীতিকেও বিচার-বিশ্লেষণে আনতে হবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি

বাংলা ভাষাই হল বঙ্গাল বা বাঙালি, অস্তিত্বের একক উপাদান, যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আগামীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ক্ষণজন্মা মনীষা এ সত্যটি বুঝে লিখেছিলেন–

> "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিলো না। তবু এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।"

রবীন্দ্রনাথ কথিত 'অন্তরের ভাগ' আসলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং ভাষার উপাদান হয়েই এই 'অন্তরের ভাগ' বা 'মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব' আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করে রেখেছে। ভাষার সাথে মানবিক সত্তার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন দার্শনিক হাইডেগার। হাইডেগার-এর মতে, মানবজীবনের অর্থই হল ভাষার মাধ্যমে সত্তার মর্মার্থ, সম্ভাবনা আর গুরুত্বকে প্রকাশ করা এবং তিনি তার দর্শনে বেশ জোর দিয়েই ঘোষণা করেন Language is the house of Being, man dwells in this house। ভাষার সাথে মানব-সত্তা ও মানব-মনস্তত্ত্বের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটান ভাষা-দার্শনিক জাক লাকাঁ। ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্বের মূল কাঠামোসমূহ গ্রাহ্য করেই জাক লাকাঁ তার দর্শনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং তিনি প্রয়োজনমতো ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, জাক দেরিদা আর মার্টিন হাইডেগার-এর দর্শনকেও মূল্যায়ন করেছেন তার দর্শনচিন্তায়। লাকাঁর দর্শন অনুযায়ী মানুষের অচেতন হল ভাষা-শৃঙ্খলে তৈরি, এবং এ কারণে একটি মানুষ সবসময় ভাষার রূপক ও প্রতীক সৃষ্টি করে তার অবদমিত অচেতনকে প্রকাশ করতে চায়। জন্মের পর একটি মানুষ তার প্রয়োজন (Need) ও চাহিদা (Demand) কেন্দ্রিক অকৃত্রিম (Real) এবং কল্পিত (Imaginary) পর্ব পেরিয়ে যখন ভাষা-সৃষ্ট প্রতীকী (Symbolic) বিশ্বের সদস্য হয়ে যায়, তখন তার অবদমিত কামনা-বাসনা-জাত ভাষা প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপক আর প্রতীক-কেন্দ্রিক দ্যোতক (Signifier) সৃষ্টি করেই এগুতে থাকে। একজন অবদমিত মানুষ কিংবা অবদমিত সমাজ-সংগঠনের ভাষায় সবসময় তাই অবদমনসহ বিভিন্ন মানসিক অবস্থার চিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল ইয়ুং কথিত যৌথ-অচেতন বা Collective unconscious-এর ক্রিয়া-কলাপ। ফ্রয়েড-এর অহং (Ego), অদ (Id) ও অতি-অহং (Super Ego) ঘটিত Displacement, Repression, Intellectualization, Compensation, Rationalization এবং Sublimation-এর বিষয়গুলোও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা ও সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বঙ্গাল বা বাঙালির অবদমিত অচেতনের সৃষ্টিশীল কামনা-বাসনা সবসময় কাজ করেছে এ কথা সত্য এবং আমরা এ সত্যও জানি যে, অবদমিত অচেতনই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তুলতে পারে। কিন্তু, অবদমিত সৃষ্টিশীল বঙ্গাল কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মে ও কথায় আমরা অনেক সময় স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ভণ্ডামি, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদির মতো অসামাজিক উপাদান খুঁজে পাই, যা ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই আমি 'চর্যাগীতি' ও 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর দু'চারটি পদ তুলে দিলাম-

ক.
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী
(ভুসুকু নিজে বাঙালি হয়ে গেল,
নিজের স্ত্রী চণ্ডালে গ্রহণ করলো)

খ.

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ ।
ছোই ছোই জাহসো বামহন নাড়িআ ।।
(ডোম্বী, নগরের বাইরে তোর কুড়েঘর, তুই ব্রাহ্মণ ও নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস ।)

গ.

মেহলি চণ্ডালী গরবি বাম্হণ
জন বিটালন্তি তে দুই লাম্বল ।
হল সহি কা মঞি অচাভুঅ দিট্ঠা
বাম্হণ মণুস চণ্ডালিএঁ তুটঠা ॥
(গৃহিণী চণ্ডালী, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ, এই দুই
মিলে জগৎ নষ্ট করেছে । ওলো সখি;
আমি কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, ব্রাহ্মণ
মানুষ চণ্ডালীতে তুষ্ট)
(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭)

উপরিউক্ত পদগুলোতে যে জাত-পাত-কেন্দ্রিক পরশ্রীকাতরতা দেখা গেল, তা ইতিহাস বেয়ে বেয়ে আমাদের বর্তমানেও উপস্থিত আছে । বাঙলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণীজনের লেখার কিছু অংশ পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য তুলে দেয়া যেতে পারে ।

ক.

"নতুন নতুন জাতি ও শ্রেণীগুলির উদ্ভব নির্দেশ করে যে, হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে একটি বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল । নিচু জাতিগুলিকে হয়তো কলঙ্ককর অবস্থায় থাকতে হত । কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় তাদেরও উপরে ওঠার ও নিজের অবস্থান উন্নয়ন এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ ছিল । অতএব লক্ষ করা যেতে পারে যে উচ্চাভিলাষী দলগুলোর গতিশীলতার আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনগুলো সাধিত হচ্ছিল সেগুলির লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত । উচ্চাভিলাষীদের চাওয়ার মধ্যে ছিল জাতির ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে নীচের তলা থেকে উপরের তলায় উন্নতি ও জাতি-ব্যবস্থার শর্ত অনুযায়ী অধিকতর মর্যাদা । তারা কখনই জাতি-ব্যবস্থার গঠনতন্ত্র নষ্ট করতে চায়নি, বা যে মূল সূত্রগুলোর উপরে ওই গঠনতন্ত্র স্থাপিত তাতে আপত্তি তোলেনি । বস্তুত উঁচু জাতিগুলোর মতোই নিচু জাতিগুলোও জাতিব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় উৎসাহী ছিল । জাতি-সমাজের ভেতরে পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সেই সম্পর্ক নির্দেশকারী নিয়মগুলো অপরিবর্তিতই রয়ে গেল ।"
(হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

খ.

"কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত হইলেন– প্রথম, কুলীন; দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয়; তৃতীয়, বংশজ; চতুর্থ, গৌণ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

কালক্রমে, কুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণিতে নিবেশিত হইলেন, কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গৌণ কুলীনেরা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন। গৌণকুলীন-সংজ্ঞাকালে তাঁহারা যেরূপ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞাকালেও সেইরূপ রহিলেন।"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলীন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

গ.

"যদি কোনো স্থানে আর্যে-অনার্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য-অনার্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙালিরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক আর্য, দ্বিতীয় অনার্য হিন্দু, তৃতীয় আর্যানার্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালি মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙালি অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙালি মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙালিজাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা ২০০৫)

ঘ.

"ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; রমণীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা-চরিত্রেরই আশ্রিত; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শপত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমনকি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শীভূতা, মহনীয়-চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।"

(স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫)

ঙ.

"বৈদিক যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এদেশের লোকের প্রতি একটা অন্যায়-অমূলক-তীব্র ঘৃণা এদেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের একটা বিভেদরেখা টেনে রেখেছিল। এ দেশের লোকদের তারা দস্যু (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ), পক্ষীকল্প (ঐতরেয় আরণ্যক), ম্লেচ্ছ (মহাভারত), পাপাশয় (ভাগবৎ পুরাণ) বলে উপহাস-অপমান করেছে। স্বল্পকালের জন্যও এদের দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিয়েছে (বৌধায়ন ধর্মসূত্র)। এ দেশের লোকেরা যাতে জ্বরে ভুগে মরে তার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছে (অথর্ব বেদ)। এ দেশের লোকের প্রতি তাদের ঘৃণা এতই তীব্র ছিল। সেন-বর্মণ-দেব আমলে সেই ঘৃণাকারীরাই যখন এ দেশের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হল তখন তাদের প্রতি এ দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আর সাধারণ লোকের প্রতি সেই সমাজবিধাতাদের অত্যাচার-অবিচারের মাত্রাও অনুমানযোগ্য।"
(নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির (?) উন্নয়নের আদর্শ ও দর্শন নিয়ে আমাদের জ্ঞানী-গুণীজন যা লিখেছিলেন, তাতে শ্রেণীস্বার্থের বুলি, জাত-পাত-কেন্দ্রিক বিভাজন, পরশ্রীকাতরতা এবং সীতা-রূপ পতিব্রতা রমণী সৃষ্টির উপাদান ছিল যথেষ্ট এবং সেই গ্রন্থিত/মুদ্রিত বাণীসমূহ বিভিন্ন সময় নির্মিত/বিনির্মিত হয়ে আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদমিত অচেতনের প্রত্নলেখ এখনও 'ভাষা' হিসেবেই অবস্থান করছে বঙ্গাল কিংবা বাঙালির 'যৌথ-অচেতনে'। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি, ২০০৬ সালের 'বর্তমানে' বসবাস করেও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান করে অযথাই নিজেদের হীনম্মন্যতার প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'গণমুক্তি'র সপ্তম প্রকাশনা 'নমঃশূদ্রের উৎস সন্ধান সংখ্যা' সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। গণমুক্তিতে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হল, নমস্ ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার গ্রাহ্য করে এখনো বাংলাদেশের নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণত্ব দাবি করেন। (ব্রাহ্মণত্বের মাঝে কী এমন গুণ আছে যা লাভ না করলে জীবন বৃথা হয়ে যায়? ব্রাহ্মণত্বের এই গুণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি গণমুক্তির লেখকবৃন্দ)। ব্রাহ্মণত্বের গুণ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা না হলেও, ব্রাহ্মণত্বের দোষ নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে, এবং প্রতিটি লেখাই যৌক্তিকভাবে 'বাঙালি সংস্কৃতির' বিপক্ষে অবস্থান নেয়। শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মমতে নমঃশূদ্ররা চণ্ডাল (?) হিসেবে পরিচিত এবং এ বিষয়ে 'গণমুক্তি'তে গ্রন্থিত প্রবন্ধের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি–

ক.

"কর্ম-সূত্রে কারা চণ্ডাল এবারে সে কথা বলা যাক। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ৫১-৫৬ শ্লোকে চণ্ডাল জাতির নিম্নরূপ কর্ম বা অনুশাসন বর্ণিত আছে : "চণ্ডাল ও শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামের বহির্ভাগে হইবে এবং ইহাদিগকে জলপাত্র রহিত

করিবে; কুকুর ও গর্দভ মাত্র ইহাদের সম্পত্তি হইবে। (৫১) উহারা পরের বস্ত্র পরিধান করিবে, লৌহের অলংকার ধারণ করিবে এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ করিবে। (৫২) সাধুরা যখন বৈধ কর্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ; ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া স্বজাতির মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং ঋণ-দানাদি ব্যবহারও ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া স্বজাতির সহিত সম্পন্ন হইবে। (৫৩) ইহাদিগকে অন্ন দিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা অন্যের দ্বারা ভগ্নপাত্রে ইহাদিগকে অন্ন দেওয়াইবেন এবং ইহারা রাত্রিকালে গ্রামে বা নগরে বিচরণ করিতে পারিবে না। (৫৪) রাজ-শাসন অনুসারে ধ্বজ কুঠার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্ত ত বিচরণ করিবে এবং অনাথ শব গ্রামের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিবে। (৫৫) রাজদণ্ডে যাহারা বধ্য বলিয়া স্থির হইবে, ইহারা তাহাদিগের বধ সাধন করিবে, এবং ঐ সকল বধ্য ব্যক্তির বস্ত্রালংকার ও শয্যা ইহারা গ্রহণ করিবে। (৫৬)"

"জন্মের বিচার ও কর্মের বিচার, এর কোনো বিচারেই যে নমরা ঐরূপ নয়, তা সকলেই জানেন। চণ্ডালের উৎপত্তি শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, অন্যদিকে নমদের উৎপত্তি ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা মাতার গর্ভে। চণ্ডালের পেশা রাজাদেশে বধ্য ব্যক্তির বধ-সাধন ও শবদাহ করণ, অন্যদিকে নমদের পেশা কৃষিকাজ, যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সর্বোত্তম জীবিকারূপে সর্বজন-স্বীকৃত। অথচ বল্লালের আক্রোশে এই নমদের উপর অহেতুক চণ্ডাল খেতাব আরোপিত হয় দ্বাদশ শতকে। তখন থেকে সামাজিক কাজকর্মে নমদেরকে 'চণ্ডাল' (>চাঁড়াল) বলে গণ্য করা হতো এবং রাষ্ট্রীয় আদমশুমারিতে যে জাতি-ভিত্তিক লোকসংখ্যা দেখানো হতো, তাতে নমদের 'চণ্ডাল' বলে চিহ্নিত করা হতো। শুধু তা-ই নয়, কোনো কোনো গ্রন্থেও 'চণ্ডাল' অর্থে 'নমঃশূদ্র' লেখা হয়েছে।"

(গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা ২০০৬)

খ.

"শূদ্রেরা কি হিন্দু? যদি তারা হিন্দু হয়ে থাকেন, তাহলে কতটা হিন্দু? হিন্দুধর্ম শূদ্রদেরকে অহিন্দু বলেনি, কিন্তু মানুষ হিসেবে কতটা স্বীকৃতি দিয়েছে? শূদ্রদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করলে তাদের সেবাগ্রহণে ধর্মীয় আপত্তি তৈরি হতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্ম অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের 'অস্পৃশ্য' এবং 'অধম' হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পারলে অল্পকিছু শ্রমবিমুখ লোকের জীবনে আরাম অবাধ এবং নিশ্চিত হতে পারে। কালোদের প্রতি সাদাদের মনোভাবে অস্পৃশ্যতা ও দাসত্ব ক্রিয়াশীল থাকলেও তাতে ধর্মীয় অনুমোদন নেই। বরং কালো মানুষেরা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে পশ্চিমা ধনবাদী সমাজে 'মানুষ' হিসেবে ধর্মীয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় বিধিবিধান রচয়িতা–মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর, বাৎসায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি প্রমুখ ব্যক্তি সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বর্ণ-প্রথার যেভাবে ধর্মীয়

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছেন তাতে হিন্দুধর্মে শূদ্রদের কতটা অধিকার স্বীকৃত হয়েছে? শূদ্রদের বেদপাঠ নিষেধ, 'ভগবান' রাম বেদ পাঠের অপরাধে শূদ্রের জিহ্বা কেটে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের মন্দিরে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নেই, তাদের উপস্থিতি অপবিত্র, স্পর্শ অশুচি, তাদের ধনসম্পদ সঞ্চয় অনভিপ্রেত।
হিন্দুধর্ম অনুযায়ী শূদ্রের ধন নেই, মান নেই, শিক্ষা নেই, শিক্ষিত হবার চেষ্টা থাকতে নেই, সমাজে স্থান নেই, রাজনীতিতে অধিকার নেই, জীবনের অধিকার পর্যন্ত নেই। ভালো জামাকাপড় তাদের জন্য অনুমোদিত নয়, শূদ্রহত্যা পাখি হত্যার নামান্তর। শূদ্র স্ত্রীর গর্ভের ব্রাহ্মণ-পিতার সন্তান সম্পত্তির সমান অংশীদার হবে না– হবে এক-দশমাংশের অধিকারী। দাসত্ব শূদ্রের চিরন্তন নিয়তি। শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না, কারণ দাস্য তার স্বভাবজাত। মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্র স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণ স্বর্গে যাবে না। এই যখন শূদ্রের অবস্থা তখন শূদ্র কতটা হিন্দু?"
(গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬)

২০০৬ সালে বাংলা ভাষায় লেখা বঙ্গাল বা বাঙালি হিন্দুর নমঃশূদ্র-বিষয়ক চিন্তা-চেতনা কি 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র পক্ষে যায়? আর নমঃশূদ্র চিন্তার সাথে যদি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের 'মালাউন/মুসলমান' দর্শন যোগ হয় তবে বাঙালি সংস্কৃতির অবস্থা কী দাঁড়ায়? আমি তারপরও বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি আছে, কিন্তু এই সংস্কৃতিতে অবস্থান করছে যৌথ-অচেতন-সৃষ্ট কিছু ভাষা-দোষ। আমাদের ভাষায় আর কী কী সমস্যা আছে, তা আরো গভীরে গিয়ে দেখা যাক।

বাংলা ভাষায় যে প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা জাত-পাত-কেন্দ্রিক হীনম্মন্যতা, অন্ধবিশ্বাসের বাড়াবাড়ি, ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ, বড়লোক বা ধনী লোকদের প্রশংসা, গুরু-পীর-মুর্শিদতন্ত্রের প্রত্নছায়া ইত্যাদির মতো নাস্তিবাচক (negative) উপাদানসমূহকে শনাক্ত করতে পারব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় অবস্থানকারী সব বচন-প্রবচনই নাস্তিবাচক নয়, ভাষায় অবস্থানরত সব ধরনের পজেটিভ/নেগেটিভ উপাদানই ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ভাষার সম্পদ, কিন্তু বচন-প্রবচনসহ সব উপাদানই আমাদের 'যৌথ অচেতন'কে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। বাংলা ভাষায় অবস্থানরত বচন-প্রবচনের বিচার-বিশ্লেষণ আমি আমার প্রবন্ধ 'নিজেকে নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ'তে করেছি এবং যে অল্পসংখ্যক বচন-প্রবচন বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. হুজ্জতে বাঙ্গাল/হুজুগে বাঙ্গাল
২. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ
৩. গোবরের পদ্মফুল
৪. ভাত নাই যার জাত নাই তার
৫. বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভালো
৬. শূয়োরের পাল

৭. সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না
৮. অভাবে স্বভাব নষ্ট
৯. টাকার গরম
১০. ইতর বিশেষ
১১. বামুন-শূদ্র তফাত
১২. দেবতা বুঝে নৈবেদ্য
১৩. বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর
১৪. হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না
১৫. জোর যার মুল্লুক তার/মগের মুল্লুক
১৬. চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা
১৭. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট
১৮. নানা মুনীর নানা মত

এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বচন-প্রবচনগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল হঠাৎ, কোনো-এক অবদমিত সৃষ্টিশীল সত্তার মৌখিক ভাষ্য থেকে। অচেতনের যে সত্য বচন-প্রবচন হিসেবে আমাদের ভাষায় অবস্থান নিয়েছে, আবশ্যিকভাবে সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং আমাদের বর্তমানে এসে এইসব বচন-প্রবচনই আবার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপাদান হয়ে তুলে ধরতে পারে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে।

আমাদের গুরু-পীর, মুর্শিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ আসলে একই সমাজভুক্ত শোষকের দল (সবাই খারাপ, আমি তা বলব না, কিন্তু আধুনিক পরিসংখ্যানতত্ত্ব মানলে 'ভালো'-র সংখ্যা অতি-অল্প বা Insignificant)। পীর, মুর্শিদ, গুরু, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ সমাজভুক্ত শোষকের দল ব্যবহার করেন গণ-সম্মোহন বা Mass Hypnotism-এর ভাষা। এই শোষকদের ভাষা, বিবৃতি, বাণী ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে সম্মোহিত করতে পারে, তাদের কথায় প্রাণ দিতেও পারে সাধারণ মানুষ (পাঠক, আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে পথে-ঘাটে রাম, রহিম, যদু, মধু, মতি, শফি ইত্যাদি নামের লাশ পাওয়া গেছে, কিন্তু মিছিলে-ময়দানে শোষক নেতা/গুরুদের লাশ কখনোই পাওয়া যায় না)। ভাষার এই সম্মোহনী গুণকে ব্যবহার করেছে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ।

বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও উপাদান অনেক সময় 'একক বাঙালি সংস্কৃতি' বিকাশের বিপক্ষেই কাজ করেছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক ড. নজরুল ইসলামের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–

> "দেশের রাজনৈতিক নেতা এবং লেখকরা যদি এই চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন তাহলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গল হত। কিন্তু তা হয়নি। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-মনমোহন-গিরিশচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু লেখকরা যেমন তাঁদের সৃষ্টিতে সাহিত্যরসের সঙ্গে মুসলমান-বিদ্বেষের বিষ মেশালেন, মুসলমান লেখকরাও তেমনি তার প্রতিবাদ করে তীব্র প্রত্যাঘাত হানলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে

সৈয়দ নওসার আলি চৌধুরী 'বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' প্রবন্ধে হিন্দুদের লেখায় মুসলমান-বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি লেখকদের যেসব রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অধিকাংশই বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এগুলি পাঠে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ছাত্রদের মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের মনে নিজেদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মে।

'নবনূর'-এর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলি তাঁর 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' (১৩১০) প্রবন্ধে দাবি করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সমাজের দেহে যেমন অস্ত্রাঘাত করেছেন, তেমনি অনেক কংগ্রেসভক্ত লেখকও করেন। যারা মিটিঙে-মিছিলে মুসলমানকে ভাই বলে সম্বোধন করে তারাও ঘরে ফিরে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করে। এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব হ্রাস পেয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হচ্ছে।"

(বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১)

বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব কখনো বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর কথা বলেছে কি না, এ ব্যাপারেই সন্দেহ পোষণ করেন ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)। আহমদ শরীফ বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটাতে আমরণ চেষ্টা করেছেন এবং এ কারণেই তার বক্তব্য 'বাঙালি সংস্কৃতি'র বিচার-বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেন :

"আমাদের ভাষাও হচ্ছে উত্তর ভারতীয়। আমাদের প্রশাসনও ছিল উত্তর ভারতীয়। কাজেই বাঙালির যে গৌরব এবং গর্ব আমরা করছি, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির গৌরব– তার কোনটাই বাঙালির কীর্তি বা কৃতি নয়। এইটাই হচ্ছে দুঃখের কথা। এই যে শিলালিপির বাহাদুরী আমরা করছি, বলছি যে আমাদের এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত ছিল, আমাদের এখানে মুদ্রা পাওয়া গেছে, আমাদের এখানে সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ইত্যাদি অনেক কথা বলি, কেন? যারা এই দেশের অধিবাসী– সেই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, বাগদি– যারা শূদ্র, অস্পৃশ্য– তাদের কথা তো বাংলাদেশের ইতিহাসে লেখা হয়নি, তাদের কোন অস্তিত্বও তো আজও পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। বাঙালির ইতিহাস পূর্ণ অবাঙালি বহিরাগতের বিবরণ দিয়ে। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী যারা এখানে পরাক্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা এখানে ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাদেরই রাজত্বের কথা– তাদেরই বিদ্যাবুদ্ধির কথা– তাদেরই জ্ঞান-গৌরবের কথা, তাদেরই অভাব-প্রতিপত্তির কথা আমরা আমাদের বলে দাবি করে গর্বে বুক স্ফীত করছি।"

(আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙলাত্ব, কোলকাতা-১৯৯২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে উপরে যা উপস্থাপন করা হল তা যদি যুক্তিসহ পাঠক বিশ্লেষণ করেন তবে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি' প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; শ্রেণীস্বার্থ, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদিই প্রাধান্য পাবে বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান হিসেবে। কিন্তু তারপরও আমি

বলব, বঙ্গাল বা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি বেশ প্রবলভাবেই আমাদের সমাজে অবস্থান করছে, কিন্তু এই সংস্কৃতির বিরোধীপক্ষ হিসেবে অবস্থান করছে অবদমিত যৌথ অচেতন-সৃষ্ট কিছু বিরোধ ও অস্তিত্ব-সংকট। এই অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত অচেতন গ্রাহ্য করেই হয়তো-বা তাই আমাদের এক বস্তুবাদী কবিও লিখে ফেলেন– 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে' কিংবা প্রতিদিন সকালে দুর্নীতিমুক্ত থাকার বাসনা নিয়ে আরেক কবি বলেন, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'

প্রকৃতি ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের মাটি উর্বর ছিল, জলবায়ু ছিল কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত এবং নদী-খাল-বিলে ছিল প্রচুর মাছ। সবকিছু মিলিয়ে অল্পস্বল্প কষ্ট করেই জীবনধারণ করা যেত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে। কিন্তু তারপরও বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু খুব একটা সুখকর ছিল না। বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন-জঙ্গল, মশা-মাছি, সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের বদনামই ছিল বেশি। আমরা যদি বিভিন্ন পুরাণের ব্যাখ্যা পড়ি, তবে দেখতে পাব যে আর্যভাষীরা আমাদের কালো চামড়ার পূর্বপুরুষদের এবং বঙ্গদেশকে ঘৃণার চোখেই দেখেছে।

প্রাচীন বঙ্গদেশের মাটি কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত ছিল সত্য; কিন্তু বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে এই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত প্রায়ই এবং এমন দুর্যোগকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজে সবসময়ই অবস্থান করত এক ধরনের অস্তিত্বের সংকট। অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই বঙ্গাল জনগোষ্ঠীর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ পেয়েছিল, এমন ধারণা করা বোধহয় অযৌক্তিক নয়। বঙ্গাল বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করে ওই সময় আবার আড়তদার, মজুতদার ও মহাজন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। অধিক মুনাফার লোভে আড়তদার, মজুতদার ও মহাজনবৃন্দ স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মানুষদের শোষণ করতে থাকে। একদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক অস্তিত্বের সংকট এবং তার সঙ্গে যোগ হওয়া সামাজিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙ্গালিদের অবদমনকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই অনেক বাড়িয়ে দেয়। একটি জাতির সামাজিক বাস্তবতা যখন 'বাঁচা-মরার লড়াই' পর্যায়ে চলে যায়, তখন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ কোনো অবস্থাতেই মুখ্য হতে পারে না এবং এমন একটা পরিস্থিতিতেই অবদমিত বঙ্গাল/বাঙালি সত্তায় যৌথ-অচেতনের উপাদান হয়ে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেক বেড়ে যায়। জাত-পাত ও ধর্মকেন্দ্রিক শোষণ বঙ্গাল বা বাঙালিদের অবস্থা 'খারাপ থেকে আরও খারাপের' দিকেই নিয়ে গিয়েছিল এবং এমন অবস্থায় 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র বাস্তবতাও হয়ে গিয়েছিল স্বপ্নের উপাদান।

'মাছ-ভাতের বাঙালি সংস্কৃতি', 'ধুতি-শাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' কিংবা 'দোচালা/চারচালা বসতবাড়ির বাঙালি সংস্কৃতি' ছিল প্রকৃতিপ্রদত্ত সাংস্কৃতিক উপাদান। বাংলাদেশের নদী, খাল, বিল, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হত, যা ছিল বঙ্গাল/বাঙালির একমাত্র প্রোটিন-উৎস (পরবর্তীকালে ওলন্দাজরা বঙ্গদেশে ডালের চাষ প্রবর্তন করে) এবং এর ফলে 'মাছে-ভাতে' বাঙালি হওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসেবে

বাংলাদেশে পাওয়া যেত মাটি, বাঁশ, বেত, খড় ও শন। প্রাকৃতিক কারণেই তাই বঙ্গাল/বাঙালির বসতবাটি হয়েছে মাটি, বাঁশ ও শনের তৈরি এবং কালবৈশাখীর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘরের চালকে করা হয়েছে দোচালা কিংবা চারচালা (বাতাসের প্রবাহ যাতে কৌণিক তল বেয়ে সহজেই প্রবাহিত হতে পারে)। প্রকৃতি বাধ্যতামূলকভাবে মানুষকে দিয়ে যা করায় তা সংস্কৃতির বিষয় কি না তা নিয়েই সন্দেহ আছে এবং এ কারণে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' তত্ত্ব বাঙালি সংস্কৃতির জন্য অপরিহার্য– এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশের প্রকৃতি দেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি মাঝেমধ্যে দুর্দশার কারণ হলেও এই দেশের জনগণকে দিয়েছেও প্রচুর। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ আর স্বপ্নভরা আগামীকে দেখিয়ে এই দেশের মানুষের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে প্রকৃতি। অবদমিত জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও বিরহের প্রকাশ হয়েছে লোকসঙ্গীতে, যাত্রায়, উৎসবে ও পার্বণে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি এখনও ইতিহাসের নিয়ম মেনেই ক্রিয়াশীল। এখনও আমাদের দেশের মানুষ ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে; খরা, বন্যা, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলে সুযোগ নিচ্ছে মজুতদার, আড়তদার আর মহাজনবৃন্দ। গ্রামের চাষি আর ভোক্তার মাঝে অবস্থান করছে বিভিন্ন শ্রেণীর দালাল ও মস্তান, আর দালাল-মস্তানদের 'গডফাদার' হিসেবে দেহের চর্বি বাড়াচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত আমলা ও রাজনীতিবিদরা। এদিকে বাংলাদেশের শতকরা ৭০ জন মানুষ এখন আর 'মাছে-ভাতে বাঙালি' নেই, তারা 'ডালে-ভাতে বাঙালি' আছে কি না তাতেও সন্দেহ আছে; তবে দেশের দুর্নীতিবাজদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ভালোই হয়েছে, তারা 'পোলাও-কোর্মায় বাঙালি' কথাটা চালু করা যায় কি না ভাবছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশের (বঙ্গদেশের) প্রাচীন জনগোষ্ঠী 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল এবং তাদের ছিল অস্তিত্বের সংকটহীন এক ধরনের কৌম সমাজ। প্রাচীন এই সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশ হয়েছিল কৌম-ভিত্তিক লোকধর্মের প্রভাবে। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে দেখা দেয় জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজন এবং এই জাত-পাত-কেন্দ্রিক শ্রেণীবিভাজনই সমাজে নিয়ে আসে অস্তিত্বের সংকট। সমাজে বর্ণভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিভিন্ন মাত্রা অবস্থান করার কারণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকাঠামো (Paradigm) বিবর্তিত হতে থাকে শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে। সমাজে যেহেতু অস্তিত্বের-সংকট-কেন্দ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অবস্থান করছিল, সেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদ-পরবর্তী বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ কখনোই আর কোনো-এক একক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো নিয়ে এগুতে পারেনি। মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকট ও বিভাজন নিয়ে, শুধুমাত্র 'মাছে-ভাতে বাঙালি' কিংবা 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতি'র মতো ভাষাভিত্তিক কিছু বুলি নিয়েই এগুতে থাকে আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ পরবর্তী মোগল, পাঠান এবং ইংরেজ যুগ বঙ্গাল বা বাঙালি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়েছিল আশরাফ-আফতাব শ্রেণীতে; চিশ্‌তিয়া-সরোওয়ার্দিয়া-নক্‌শবন্দিয়া ইত্যাদি

নামের তরিকাও বিভক্ত করেছিল মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন পীর-মুর্শিদের বাণী ও চিন্তাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-বৈপরীত্য ও বিনির্মিত (deconstruction) হয়ে যায় 'মুচলমান-বাঙালি', 'হিন্দু-যবন', 'মুসলমান-মালাউন' কিংবা 'মুসলমান-কাফের'। সমাজের এই ভাঙনের মুখে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কোনো একক সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশ বঙাল বা বাঙালি সমাজে হয়নি, বরং এই মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনকে কেন্দ্র করে সমাজের মানুষ হয়ে ওঠে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পরশ্রীকাতর। ইংরেজ শাসন Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত আরও বেড়ে যায় এবং ইংরেজদের রাজনীতি বাংলাদেশে সৃষ্টি করে 'জমিদার-প্রজা', 'আড়তদার-কৃষক', 'বাবু-রায়ত' ইত্যাদির মতো শোষণের যুগ্ম-বৈপরীত্য।

ইংরেজ শাসন-আমলে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন বাঙালি সুবিধাবাদী সমাজ (মুসলমান সমাজ বাঙালি হিসেবে গণ্য হত না এবং এ কারণে রেনেসাঁস আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না)। বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের চেতনা-চৈতন্য কেমন ছিল, তা জানার জন্য প্রবীর ঘোষ রচিত 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' থেকে কিছু অংশ তুলে দেয়া যাক :

> "রেনেসাঁসের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁস যুগের পুরোধা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ, কেশব সেন, ডিরোজিও প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতাদের যে মূল্যায়ন হয়ে আসছে তার মধ্যে যুক্তিবিচার বাস্তবিকই স্থান পায়নি। ব্যক্তিপূজার ফলে এঁরা অনেকেই আজ এমনই এক কিংবদন্তি জগতের মহানায়কের রূপ পেয়েছেন যে এঁদের সীমাবদ্ধতা, নেতিবাচক দিক, ভ্রান্ত-চিন্তা, এমনকি দেশের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মতো দিকগুলোর প্রতিও বর্তমানের মূল্যায়নকারীরা কিছু বলতে ভয় পান। ফলে জনসমর্থন-সচেতন এইসব সমালোচকের কৃপায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এসব নায়ক চরিত্রগুলোর মূল্যায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রেনেসাঁস-যুগের নায়কেরা কেউই তাঁদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে বাস্তবিকই 'মহান' হয়ে উঠতে পারেননি। বাস্তবপক্ষে তাঁদের এই সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁদের অসাধারণ গুণাবলি ব্যাপক নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথে কোনও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাঁদের এই রেনেসাঁস নামক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল স্পষ্টতই সংখ্যালঘু কিছু মানুষের জন্য তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ এক খণ্ডিত ও আধুনিকতার প্রহসনে আবদ্ধ আন্দোলন।"
>
> (সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা)

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে পুস্কর দাশগুপ্তের মূল্যায়নও উল্লেখযোগ্য, তিনি লিখেন :

> "এদেশের এই ভণ্ডামির জাতীয় চরিত্র সনাতন। সন্ন্যাসীবেশী রাবণ, ধনা-মনা কি ভাঁড়ু দত্তের অভাব এদেশে কখনো ছিল না, অভাব ছিল না 'বিড়ালতপস্বী', 'বকধার্মিক' বা 'তুলসী বনের বাঘ'-এর। তারপর জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষা দ্বিধা-বিভক্ত

স্কিজোফ্রেনিক জীবনচর্যার মাধ্যমে এই ভণ্ডামিকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক স্বীকৃতি দিল। উনিশ শতকের মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের মতো দুয়েকজনের বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাঙলার তথাকথিত নবজাগরণের অনেকের জীবনে এই দ্বিচারিতা ভণ্ডামির আখ্যা পেতে পারে। বাঙালির নবজাগরণের, 'আধুনিক' ভারতের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবন এর উদাহরণ। একদিকে কালেক্টর ডিগবির সহকারী হিসেবে উৎকোচ গ্রহণ এবং বিবিধ কূট উপায়ে বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন, অন্যদিকে ধর্ম-সংস্কার ও বিপ্লবের সমর্থন এই দ্বৈত অস্তিত্বের নিদর্শন। ভারতীয় সমাজ এই ভণ্ডামিকে প্রায়শ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের কাছে এই ভণ্ডামি প্রত্যাশা করে। সাহিত্য-স্রষ্টা, যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যাত হন একদিকে 'ঋষি' অন্যদিকে 'সাহিত্য-সম্রাট' বলে। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলা হাস্যকর ভণ্ডামি এবং একজন আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি মোটেই সম্মানজনক নয় একথা কারও মনে হয়নি। তাছাড়া 'সাহিত্য-সম্রাট'– সেক্সপিয়ার, মিল্টন, গ্যাটে, ডিকেন্স, স্তাঁদাল এঁদের কারো নামের আগে কি এ-জাতীয় বিশেষণ কল্পনা করা যায়? এই বিশেষণ যে কতটা হাস্যকর তা প্রমাণ হয় যখন শোনা যায় যে 'সাহিত্য-সম্রাট'-এর অনুকরণে তৈরি পরবর্তীকালের বিশেষণগুলি নাট্য-সম্রাট, নাট্য-সম্রাজ্ঞী, যাত্রা-সম্রাট, জ্যোতিষ-সম্রাট, জাদু-সম্রাট, বাউল-সম্রাট ইত্যাদি।

ধনী জমিদার, ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের আগে বিশেষণ বসে 'মহর্ষি', সাংবাদিক ও খবরের কাগজের মালিক শিশির কুমার ঘোষের নামের আগে 'মহাত্মা'। জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অরবিন্দ ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে মানিকতলার বোমার মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে তিনি বন্দি হন। এই মামলার ধৃত প্রায় সবারই কয়েক বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এক ধরনের মানসিক সংকটে বাস্তব থেকে পলায়নের মানসিকতায় কারাগারে অরবিন্দের মরমিয়া উপলব্ধি হয়। তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে ব্রিটিশ শাসনের বাইরে ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরিতে গিয়ে সাধনাশ্রম খোলেন। লোকজন তাঁর নামের আগেও 'ঋষি' বসিয়ে দেয়।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৬)

বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমরা যদি উল্লিখিত কবি ও সাহিত্যিকদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাই, তবে আমরা এক ধরনের মুখোশপরা অস্তিত্বকেই আবিষ্কার করতে পারব। রামমোহন রায়কে দেখব ঘুষখোর আমলা হিসেবে, যিনি নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজ-বন্দনা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করব এক সাম্প্রদায়িক সত্তা হিসেবে, যিনি মুখোশ চাপিয়ে নিজস্ব আসল ও নকলকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক জনগণ-বিচ্ছিন্ন সত্তার, যার ফলে তার সৃষ্টি ও সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের

কথা খুব একটা নেই। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনায় বেদ, উপনিষদ ও পশ্চিমের দর্শনই প্রাধান্য পেত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে তিনি হয়তো-বা ছিলেন প্রচণ্ডভাবে গুরুতন্ত্রে বিশ্বাসী। লালন ফকিরের সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল শিলাইদহে এবং লালনের মাধ্যমেই লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, এমন চিন্তা আমরা করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন জানতে পারি যে লালন রচিত দুইটি গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ পড়ার জন্য নিয়ে আর কখনো ফেরত দেননি (সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলিকাতা ২০০৭), তখন ব্যাপারটিকে রবীন্দ্র-চরিত্রের সাথে মেলাতে কষ্ট হয়। যাহোক, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রবীর ঘোষ ও পুস্কর দাশগুপ্তের কিছু মূল্যায়ন পাঠকের অবগতির জন্য তুলে দেয়া হল।

ক.

"রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ বার বার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই–

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য কর।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা কর। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এস।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান কর। ইংরেজদের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ কর।

(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত কর।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন কর।"

(সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা ১৯৯৩)

খ.

"বাঙালি/ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর দ্বিধাবিভক্ত জীবনচর্যা, দ্বৈত ব্যক্তিত্বের প্রতীকী নিদর্শন হিসেবে বাঙলা ভাষার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বিশেষ অর্থবহ। কাঁঠালপাড়ার নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঘরে' ধুতি ও ফতুয়া পরতেন, অথচ চোগা-চাপকান পরা শামলা মাথায় প্রথম বাঙালি গ্র্যাজুয়েট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'বাইরের' বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি বাদ দিয়ে তাঁর আর কোনো ছবি আমাদের চোখে পড়ে না।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

গ.

"কবি রবীন্দ্রনাথ ভূষিত হয়েছেন 'বিশ্বকবি' 'কবিগুরু' ও 'গুরুদেব' পদবিতে। বিশ্ব-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় রোমান্টিক কবিদের একজন। এছাড়া উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান– সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে অনন্য সমৃদ্ধি দান করেছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের প্রথা ও প্রত্যাশার নিয়ন্ত্রণে এই শিল্পস্রষ্টা প্রাত্যহিক জীবনে আলখাল্লা পরে আর তাবৎ ব্যাপারে বাণী দিয়ে সারাজীবন গুরুদেব-এর ভূমিকায় অভিনয় করে গেলেন। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে তাঁর স্থান উনিশ শতকের ফরাসি সাহিত্যে ভিক্তর য়ুগোর স্থানের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু ভিক্তর য়ুগো কবি, সাহিত্য-স্রষ্টা– 'গুরু' নন, 'ঋষি' নন, 'সন্ত' নন। ভণ্ডামির পীঠস্থান এই দেশ এই সমাজের নিয়ন্ত্রণে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁর স্বাভাবিক মানবিক দুর্বলতা, স্ববিরোধ, আবেগ-অনুভূতি সব আলখাল্লার আড়ালে গোপন রেখে বাল্মিকী, কালিদাসের মিথিকেল জীবনযাপন করতে বাধ্য হলেন।"

(দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা ১৯৯৫)

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো পাঠ শেষে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে একটি সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সামাজিক লোকজনের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে। শুধুমাত্র ভাষা, খাদ্যাভ্যাস কিংবা নাচ-গান দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে বোঝানো যায় না, কারণ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ লুকানো থাকে মনের গহীন গভীরে। অবদমিত, বিভাজিত এবং অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বঙ্গাল বা বাঙালির সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে ঠিকই এবং ব্রিটিশ শাসন আমলে সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুল পেরিয়ে বঙ্গালরা পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতিতে বন্দি পশ্চিমবঙ্গ।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত হলেও, মূলত এটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা যে খুব একটা সঠিক ছিল না, তা বুঝতে বঙ্গালদের খুব একটা সময় লাগেনি। তবে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বঙ্গাল বা বাঙালিদের মনস্তাত্ত্বিক সংস্কৃতিবোধ ছিল অসম্পূর্ণ ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং এ কারণে তাদের ইতিহাসকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের সংকটও ছিল প্রকট। পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গাল বা বাঙালিরা নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায়ই ভাবত,– 'আমরা কি মুসলমান? নাকি মুসলমান বাঙালি? নাকি শুধুই বাঙালি?'। বঙ্গাল বা বাঙালিদের যে আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল, তাকে মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক সংকট হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। আর এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট বাংলাদেশের বঙ্গালদের মনে জন্ম দিয়েছিল এক ধরনের অপসংস্কৃতির।

সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে অহেতুক টেনে এনে বঙ্গালরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বর্জন করতে চেয়েছিল, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন "নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান"-এর 'মহাশ্মশান' শব্দটির জায়গায় যোগ করা হয়েছিল 'গোরস্তান' এবং সাংস্কৃতিক সংকট আরও প্রকট করার জন্য 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' আমদানি করার চেষ্টা করা হয়েছিল অযৌক্তিকভাবে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংকটাপন্ন সংস্কৃতিতে 'তাহজীব' ও 'তমুদ্দুন' প্রতিষ্ঠা পায়নি, তবে মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক কিছু সাংস্কৃতিক ভুলকে স্বীকার করে নেয়া

হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন পুরুলিয়ার (পশ্চিমবঙ্গের) কাজী নজরুল ইসলাম (শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে), অথচ বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হিসেবে বাংলাদেশের অনেক বেশি আপনজন, কারণ তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল শিলাইদহে, শাহজাদপুরে কিংবা পদ্মা আর গড়াই নদীর বুকে বোটে ভ্রমণরত অবস্থায়। আমরা, বঙ্গালরা, এক অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের আওতায় থেকে আমাদের সংস্কৃতির সত্যকে আবিষ্কার করতে পারিনি, বরং অবদমিত মনস্তত্ত্বের কারণেই আমরা সমাজে অবস্থান করছি দুর্নীতিগ্রস্ত, পরশ্রীকাতর আর স্বার্থপর মন নিয়ে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে সামাজিক অবক্ষয় এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন প্রাদেশিক পরিষদের মাননীয় স্পিকারকেও রাজনীতিবিদ নামধারী কিছু মস্তানের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

১৯৭১ সালে এক মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় লাল-সবুজ পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশকে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করা সম্ভব হয়েছিল আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য নেতৃত্বের কারণে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও আমাদের অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং এর ফলে দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বেশ কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ, মুক্তিযোদ্ধা, মস্তান, আমলা এবং তাদের সহযোগী জনসাধারণ লুটপাটতন্ত্র কায়েম করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসাধারণ নেতা ছিলেন; কিন্তু দেশ পরিচালনায় তিনি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেননি। অবদমিত সাংস্কৃতিক সত্তার অধিকারী হয়ে তিনিও স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে যেতে পারেননি, যদিও তিনি নিজেই ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছিলেন– 'চাটার দল সব খেয়ে ফেলল...। আমার কম্বলটা কই?'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। এবং এ দুষ্কর্মে সহযোগী ছিল আওয়ামী লীগেরই কতক সুবিধাবাদী নেতা আর সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক প্রাক্তন ও কর্মরত সদস্য। বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর তার দলের অন্যতম প্রধান নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু সদস্য নতুন সরকার গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাদের এই অপকর্ম খুব বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেননি। তবে ক্ষমতায় অবস্থান করে খোন্দকার সাহেব বঙ্গাল ও বাঙালিদের উপহার (!) দেন সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামে এক তত্ত্ব, যার ফলে আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের প্রাচীনতম (!) উপাদান হয়ে ওঠে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার ঘটনা, আমরা ভুলে যাই আমাদের বঙ্গাল সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক প্রাচীন ইতিহাসকে। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে' যেহেতু সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' স্লোগানটিকেও বদলে বিদেশি ভাষাযুক্ত করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করা হয়। খোন্দকার মোশতাক আহমদ খুব বেশি দিন বাংলাদেশের মসনদের দখল রাখতে পারেননি, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফের এক ব্যর্থ ক্যুয়ের পরিণতিতে, সিপাহী-জনতার বিদ্রোহের মাধ্যমে, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে নেন (ব্যাপারটিকে 'দখল' বলা যায় এ কারণে যে, ১৯৭১-পরবর্তী সব রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল সুবিধাবাদী চরিত্রের। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লাল বাহিনী, মুজিব বাহিনী ইত্যাদির সংগঠন, খোন্দকার মোশতাকের মসনদ দখল, জিয়াউর রহমানের আগমন ইত্যাদি কোনোটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ ছিল না)। জেনারেল জিয়াউর রহমান 'বাংলাদেশী

জাতীয়তাবাদ'-এর তত্ত্ব গ্রহণ করে, 'money is no problem'-তত্ত্ব যোগ করে সরকার চালাতে সচেষ্ট হন। ব্যক্তিগত জীবনে জিয়াউর রহমান খুবই সৎ থাকলেও, তার দলে লোকজনের দুর্নীতিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন। ১৯৮১ সালে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জিয়াউর রহমান নিহত হন চট্টগ্রামে। তার মৃত্যুর পর জিয়াউর রহমান-সৃষ্ট বিএনপি অল্প কিছুদিন ক্ষমতায় ছিল জাসটিস সাত্তারের নেতৃত্বে। তারপর এক ক্যু'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী নেতাদের সাথে নিয়ে একসময় 'বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি' নামে একটি দলকে সংগঠিত করেন এরশাদ। হু মু এরশাদ ও তার দলের বেশিরভাগ লোকই ছিল সুবিধাবাদী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত এবং এর ফলে ১৯৯০ সালে এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। এরশাদ সরকারের পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে; কিন্তু রাজনীতিবিদ ও তাদের চেলা-চামুণ্ডার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতার কারণে বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগ সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়। 'হজুগে বাঙাল' কিংবা 'হুজ্জতে বাঙাল' জনগণ সব ধরনের যুক্তি ও বাস্তবতা অগ্রাহ্য করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিতে থাকে, দেশের জনগোষ্ঠী অযথাই ভাগ হয়ে যায় 'আওয়ামী পন্থী' ও 'বিএনপি পন্থী' হিসেবে। এ সুযোগে সাম্প্রদায়িক শক্তি জামায়াত তাদের কার্যক্রম বেশ ভালোভাবেই চালাতে সমর্থ হয়।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক বাহিনীর সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এই সরকার ক্ষমতায় এসেই বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও অন্যান্য দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা এবং তাদের সহযোগী আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর বঙ্গাল জনগণ জানতে পারে তাদের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ। জনগণের সম্পদ হাজার হাজার কোটি টাকা কীভাবে যে লোপাট করা হয়েছে, তা জানতে পারে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অধিকারী বঙ্গাল জনগণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায় (কিন্তু এ কথাও সত্য যে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণই বিভিন্ন মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত)। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে নিজেদের বাঁচাতে অনেক চিহ্নিত নেতা বিএনপি আর আওয়ামী লীগ ভেঙে নতুন সংগঠন তৈরি করতে সচেষ্ট হন, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের টক-শোতে 'পবিত্র আত্মা' হিসেবে উপস্থিত হন অনেক চেনা-অচেনা দুর্নীতিগ্রস্ত মহাপুরুষ (!)। সুশীল সমাজের মুখোশ এঁটে অনেক সুবিধাবাদী লোকজনও খুব ঘন ঘন বিবৃতি দিতে থাকে তাদের পাপকে লুকিয়ে রাখতে।

যে ঘটনাসমূহ ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হল, তার মাঝেই লুকিয়ে আছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংস্কৃতির উপাদান। জাতীয় কিংবা ব্যক্তিগত সংস্কৃতি যে শুধুমাত্র নাচ-গান, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, পূজা-পার্বণ, ভাষা ইত্যাদি নয় তা বুঝা যাবে ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলেই। হাজার বছরের অস্তিত্বের সংকট এবং অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের কারণেই বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে দুর্নীতি করার সমস্ত উপাদান। এ প্রসঙ্গটি আরও একটু খোলাসা করার জন্য সংস্কৃতি ও অর্থনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে হবে।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

সুন্দর জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন এমন এক ভারসাম্যের অর্থনীতি, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার বাঁচার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পাবে। যখন মানুষ এমন সুবিধা পায় না, ঠিক তখনই সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'– এই প্রবচনটি গ্রাহ্য করে একজন হতদরিদ্র মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদেই হয়ে উঠবে দুর্নীতিগ্রস্ত। আমাদের দেশের ইতিহাসে যে জাত-পাত কেন্দ্রিক শ্রেণী-বৈষম্য ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই অস্তিত্বের সংকট শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করেই জন্ম নেয় সুবিধাবাদী শ্রেণী এবং এই সুবিধাবাদী শ্রেণীর প্রবহমান বর্তমানই হল আমাদের দেশের নেতা, নেত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, মস্তান, শ্রেণীসংগ্রামরত মানুষ এবং সমগ্র জনসাধারণ। আসলে আমাদের যৌথ মনস্তত্ত্বে অবস্থান করছে এমন এক অপসংস্কৃতির উপাদান, যার ফলে আমরা আর আমাদের সঠিক মানবিক উপাদানসমূহকে উদ্ধার করতে পারছি না।

একজন হতদরিদ্র মানুষ দুর্নীতি করে কোনো-একসময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আরও সুবিধা নিয়ে, দুর্নীতি করে হয়ে ওঠে উচ্চ-বিত্তের মানুষ। একজন মানুষ যখন 'টাকার কুমির' হয়, তখনও তার 'অস্তিত্বের সংকট' কমে না, বরং বেড়ে যায়। দুর্নীতি করে জমানো সম্পদ রক্ষা করাকে কেন্দ্র করেই তার 'অস্তিত্বের সংকট' তৈরি হয় এবং এমন অবস্থায় সম্পদ রক্ষার কারণেই সে মূল ক্ষমতা-কাঠামো বা Power Structure-এর অংশ হতে চায় (Power Structure সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক মিশেল ফুকোর দর্শন পড়ে দেখতে পারেন)। আমাদের দেশেও যারা 'টাকার কুমির' হয়েছেন দুর্নীতি করে, তারা ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য সংসদ সদস্য হয়েছেন নমিনেশন ক্রয় করে, হয়েছেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী কিংবা রাজনৈতিক দলের মহা-মস্তান। সম্পদ রক্ষার জন্য তারা লালন-পালন করেছেন বন্দুক-পিস্তলওয়ালা মস্তান বাহিনী। অনেক সময় ক্ষমতা-কাঠামোর কাছাকাছি থাকার জন্য তারা প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্র কিংবা মালিক হয়েছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের। জানুয়ারি ১১, ২০০৭-পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করলে পাঠক উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাবেন।

অর্থনীতি যে মানুষের মনস্তত্ত্ব সংগঠিত করে এবং 'পাওয়া-না-পাওয়া'-কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় 'অবদমন', এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই অবদমন যখন 'যৌথ মনস্তত্ত্বের' অংশ হয়ে যায় সংস্কৃতির উপাদান, তখনই সমাজ সংগঠন ভেঙে পড়ে। আমাদের বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতির বেলায় অস্তিত্বের সংকট আর অবদমন-ঘটিত পতন ঘটেছে এবং এমন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপাদান হল দীর্ঘকাল ধরে সমাজকে Social Psychotherapy দেয়া। ব্যাপারটি কীভাবে করা যাবে, তা নির্ধারণ করবেন আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তবে লেখকের মতে, আমাদের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, অন্যান্য মাস-মিডিয়া এবং সত্যিকার সুশীল সমাজ এ ব্যাপারে কাজ করতে পারেন এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য যথাযথ পাঠ-কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচিন্তন

সব শেষে, উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে পারি।

১. সংস্কৃতি শুধুমাত্র শিল্প, সাহিত্য, নাচ-গান, জীবনধারণ প্রণালী, ধর্ম, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি নয়, সংস্কৃতির মূলে অবস্থান করে সামাজিক মানুষের যৌথ মনস্তত্ত্ব।

২. বঙ্গাল বা বাঙালি সংস্কৃতিতে অবদমিত যৌথ মনস্তত্ত্বের অনেক উপাদান ঢুকে গেছে জাত-পাত-কেন্দ্রিক শোষণের ফলে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা নষ্ট হওয়ার কারণে এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে।

৩. আমরা যাদের মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য করি, আমরা যাদের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ভাবি, তাদের মনস্তত্ত্ব ও কার্যক্রমও বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র বুঝে নিজেদের শুধরাতে হবে।

৪. আমাদের সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির উপাদানসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজন Social Psychotherapy-র। এ ব্যাপারে দেশের মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাদের কাজ হবে যৌথ মনস্তত্ত্বের অবদমন দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

৫. আমাদের দেশের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও ও অন্যান্য মাস-মিডিয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রচারের মাধ্যমে Social Psychotherapy কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

সংযোজন

'বাঙালি' বা 'বাংলাদেশী' শব্দযুগল দিয়ে আমাদের জাতিসত্তাকে প্রকাশ না-করে কেন 'বঙ্গাল' শব্দটি ব্যবহার করা হল, এ নিয়ে অনেক পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রবন্ধের লেখক হিসেবে ব্যাপারটি যুক্তি এবং ইতিহাসের সত্য-বচনসহ উপস্থাপন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ছিল সুপ্ত 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' প্রত্ন-ছায়া, যা ১৯৭৫ সালের পর ঐতিহাসিক মিথ্যা হিসেবে হঠাৎ উপস্থিত হয়। এ তত্ত্বের মূলে রয়েছে এক সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা, যা কখনোই বাঙালি বা বঙ্গালদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্যকে উপস্থাপন করে না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের ইতিহাসকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত করলেও, আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে।

'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-ও 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের' মতো সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ পায় অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে, যখন বঙ্গদেশে 'হিন্দু-মেলা' কিংবা 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস' নামে কিছু সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিকাশ লাভ করেছিল। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বঙ্গীয় জনসাধারণকে 'বাঙালি' ও 'মুচলমান' নামক দুটি সাম্প্রদায়িক সত্তায় বিভক্ত করে ফেলেছিল, যার ফলে 'শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতির' সাথে যুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসাধারণ।

যে কোনো জাতির সঠিক আত্মপরিচয়, নৃতাত্ত্বিক উৎসমূল এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে আবশ্যিকভাবে শিকড়-সন্ধানী হতে হয়। আমরা যদি জাতি হিসেবে আমাদের উৎস বা মূল বিচারে আনি, তবে ১৯৭৫ সালের সাম্প্রদায়িক চিন্তার ফসল 'বাংলাদেশী জাতি'র অন্তর্ভুক্ত আমরা নই, কিংবা অষ্টাদশ শতকের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' আমাদের সঠিক আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয় না। বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশের হাজার বছরের ইতিহাস বিবেচনায় আনলে আমরা দেখতে পাব যে প্রাচীন বঙ্গদেশের সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, হরিকেল, গঙারিডী, তাম্রলিপ্তি, সূক্ষ্ম, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও পুণ্ড্র নামের আদিম জনপদ সমন্বয়ে সংগঠিত বৃহৎ-বঙ্গের বঙ্গাল সম্প্রদায় বা জাতি-ই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষ এবং এ সত্যকে মেনে নিয়ে এবং নৃতাত্ত্বিক ও জেনেটিক বিশ্লেষণের যৌক্তিক উপাদানসমূহ গ্রাহ্য করে, বঙ্গাল জাতির উত্তরসূরি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে 'বঙ্গাল জাতি' হিসেবেই বিবেচনা করব। কোনো জাতির ইতিহাস তিরিশ, পঁয়ত্রিশ কিংবা দুইশত বছরের পুরনো হয় না, একটি জাতির সঠিক উৎসমূলের ইতিহাস হয় হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে। আমরা যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হই, তবে আমাদের চিন্তা-চেতনাও হবে অসাম্প্রদায়িক আর আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে নিয়ে যেতে পারব হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসে।

আমার এই জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব হয়তো-বা বঙ্গীয়-গৌর, গাঢ়-শ্যাম বা উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণের তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা আর্যদের (!?) পছন্দ হবে না; কিংবা যারা নিজেদের মোগল, পাঠান কিংবা আরব বংশের উত্তরসূরি মনে করেন, তারাও আমার এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু আমি ঐ সব আর্য, পাঠান, মোগল ও আরবদের জেনেটিক ল্যাবরেটরিতে যেতে বলব এবং তারা জিন-বিশ্লেষণেই দেখতে পাবেন যে তারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে এসে 'বঙ্গাল' জিন-এর সংকর বা জাতি-মিশ্রণ-জাত ফসল।

সব শেষে একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধের অনেক স্থানে 'বঙ্গাল' শব্দের পাশাপাশি 'বাঙালি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন লেখক সমকালকে গ্রাহ্য করে। যদি কেউ দু'শত বছরের পুরাতন 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-কে পরিহার করতে রাজি না হন (যদি সঠিক যুক্তি থাকে), তবে তা লেখকের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এমন ক্ষেত্রে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রবক্তাকে হতে হবে নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক এবং তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' প্রেক্ষাপটে শিকড় বা উৎসমূল হিসেবে অবস্থান করছে 'বঙ্গাল জাতীয়তাবাদী' উপাদান ও ঐতিহ্য।

[পাঠক যদি বঙ্গাল জাতীয়তাবাদ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তবে লেখক রচিত এই 'ইহা শব্দ' অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বাঙ্গাল জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ' পড়ে দেখতে পারেন।]

তথ্যপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, বাঙলা ও বাঙালিত্ব, কলিকাতা, ১৯৯২

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৌলিন্যমর্যাদার প্রথম ও বর্তমান অবস্থা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

৩. গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, ১৯৬৫

৪. গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০৬

৫. গোবিন্দ বর, প্রাসঙ্গিক ভাবনা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬

৬. গৌরপ্রিয় সরকার, জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ : নমদের কথা, গণমুক্তি, ঢাকা, ২০০৬

৭. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, কলিকাতা, ১৪০১

৮. নীহাররঞ্জন রায়, কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৭৯

৯. পবিত্র সরকার, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৯১

১০. পুস্কর দাশগুপ্ত, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৯৫

১১. প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, কলিকাতা, ১৯৯৩

১২. বাংলা একাডেমী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৭

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালির উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলকাতা, ২০০৫

১৪. মঈন চৌধুরী, ইহা শব্দ, ঢাকা, ২০০৬

১৫. মঈন চৌধুরী, শব্দের সম্ভাবনা, ঢাকা, ২০০৭

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জয় বুকস, ঢাকা, ১৪০৬

১৭. সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কলকাতা, ২০০৭

১৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ভাষাচার্য), সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৬

১৯. স্বামী বিবেকানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

২০. হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি, বঙ্গদর্পণ, কলিকাতা, ২০০৫

২১. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতের সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৯

.....*.....

সমাপ্ত